ব্রজদার গল্প-সমগ্র

প্রফুল্ল রায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির * কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ, ১৩৭১

প্রতিষ্ঠাতা ঃ
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা ঃ
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল-সাহিত্য-মন্দির
সি-৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রণে ঃ
নির্মলচন্দ্র শীল
ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট
কলিকাতা

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম গল্প

ব্রজরাজ কারফর্মা বাবুকে যিনি চেনেন না, এ কাহিনী তাঁর জন্য নয়। কারণ তিনি এ কাহিনী শুনে ঠিক বিশ্বাস করতে পারবেন না। অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। হয়ত প্রবল মূঢ়তাবশে ব্রজদার সঙ্গে তর্কই জুড়ে দেবেন। আর মুহূর্তে ব্রজদা সে স্থান ত্যাগ করবেন। আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাব : বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। ব্রজদা একটা আফশোষ প্রায়ই করেন : বাঙ্গালীর মানসিক হজমশক্তি আর আগের মত নেই। কোন কিছু প্রাণে ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। আর যেদিন থেকে বাঙ্গালীর এই হজমের গোলমাল হয়েছে, সেদিন থেকেই তার অধঃপতনের শুরু।

আমি অবিশ্বাসী নই। তাই ব্রজদাকে পেয়েছি। আর যে কলকাতায় জীবন অনিত্য, যে কোন মুহূর্তে যেখানে সরকারী বাসের চাকায়, হাসপাতালের চিকিৎসা বিভ্রাটে, পুলিশের গুলিতে অথবা পাবলিকের ইঁটে প্রাণটি যেতে পারে, সেখানে হঠকারী অবিশ্বাসের ফেরেববাজিতে পড়ে কোন মূল্যেই ব্রজদাকে হারাতে পারিনে।

ব্রজদা যে-সে লোক নন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রজদার পরামর্শে। একথা কিন্তু অনেকেই জানে না। আপনি কি জানেন, অন্নদাশংকর রায়কে বাংলা শিখিয়েছে কে? দেশবন্ধুকে কলকাতার মেয়র, শ্রীনেহেরুকে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার, গান্ধীজীকে মহাত্মা করল কে? সত্যেন বোসকে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কে? ব্রজরাজ কারফর্মা। বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালী নিজেই জানে না!

সত্য বাংলাদেশে চিরকালই উপেক্ষিত। বাঙ্গালী ইতিহাসকে কোনদিন মর্যাদা দিতে শেখেনি। তাই ব্রজদাকে বাঙ্গালী চিনতে পারল না। এতে ব্রজদার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। যে ব্রজদা তিনি সেই ব্রজদাই আছেন। মাঝখান থেকে বাঙ্গালীর ইতিহাসটাই পঙ্গু হয়ে গেল।

তাই এতকাল পরে, বাঙ্গলা দেশকে অপূরণীয় এক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, আমি ব্রজদার জীবনচরিত রচনা করতে বসেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন শ্রীম—, ডাঃ জনসনের যেমন বসওয়েল, ব্রজদার তেমন আমি। তাই ব্রজদা যখন যা বলেছেন আমি সযত্নে টুকে রেখেছি।

ব্রজদার মুখের বুলি, তাই নাম দিয়েছি ব্রজবুলি।



রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রজদার পরামর্শে

একদিন কয়েকজন ছোকরা কবি তর্ক করছিল। তাদের একদলের মতে বলাকা থেকেই রবীন্দ্র প্রতিভার ম্যাচুয়েরিটি প্রকাশ পেতে থাকে।

ব্রজদা সে কথা শুনে হাসলেন। পরিতৃপ্তির হাসি। বললেন, ঠিক ধরেছে, বুঝলি। পেটে এলেম আছে, বোঝা যাচ্ছে। ভাগ্যিস সেদিন কবিকে হাঁসের উপর একটা কবিতা লিখতে পীড়াপীড়ি করেছিলুম।

সুদূর অতীতের অন্ধকারে স্মৃতির সার্চ লাইট ফেলে ফেলে ব্রজদা কি যেন খুঁজলেন কিছুক্ষণ। তারপর যা খুঁজছিলেন তা যেন হঠাৎ পেয়েও গেলেন।

ব্রজদা বললেন, বাপ সে কি আজকের কথা! নাইনটিন ফোরটিন। তখন বড়লাট সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে বড়দিনটা কলকাতায় কাটাতেন। বড়লাটের এডিকং তখন খাস বিলেত থেকে আসত। বৃটিশ ফৌজের সেরা সেরা লোক আনা হত বড়লাটের এডিকং করার জন্য। বুঝে নে ব্যাপারখানা। কর্ণেল ক্লিম্যাণ্ট বলে তখন জাঁদরেল এক এডিকং ছিল বড়লাটের। ধরতে গেলে সেই কর্ণেলই কবির বলাকা কবিতা লেখার মূলাধার। এসব হিস্ট্রি তো কেউ জানে না। শুধু ফ্যাট-ফ্যাট করে।

তা থাকগে সে কথা আরেকদিন বলব। আজ কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টের সঙ্গে আমার আলাপের কাহিনীটাই বলি।

ব্রজদা বললেন, কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে একবার লড়তে গিয়েছিলাম। ঐ এক লড়াই-এর পরেই দুজনের মধ্যে হাতে-দস্তানায় ভাব জমে গেল। ব্যাটা বিলাতের চ্যাম্পিয়ান কুস্তিগীর ছিল। সাত ফুট লম্বা। সাড়ে চার মন ওজন। বুকের ছাতিই ছিল ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। ছয় ইঞ্চি ফোলাতে পারত। সে আমলের গোরা তো। তোরা একালের ছোকরা, আইডিয়া করতে পারবিনে। রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসখানা পড়েছিস তো। ক্লিম্যাণ্টের কিছুটা আদল রবীন্দ্রনাথ গোরা চরিত্রে ফোটাতে চেয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, পারেননি। তা কর্ণেল ক্লিম্যাণ্ট যদি হয় ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিন তবে গোরা হচ্ছে হাওড়া-আমতা রেলের ঐ ধুকুস ধুকুস চুনোপুঁটি ইঞ্জিন। এবারে আন্দাজ করে নে।

সেই ঘটোৎকচের সঙ্গেও আমাকে কুস্তি লড়তে হয়েছে। ন্যাশন্যাল স্পিরিটটা তখন আমাদের মধ্যে এমনি তেজী ছিল। বুঝলি! এ কী তোদের স্বাধীনতা আমলের নেতাগিরি করা! হুঁঃ!

গোরাদের সঙ্গে তখন কথায় কথায় টক্কর দেওয়া হত। হলামই বা আমরা পরাধীন। আমাদের দেশটাই তোমরা না হয় দখল করেছ, কিন্তু বাঙ্গালীর তেজটা তো আর দমন করতে পারনি। বৃটিশ তো ছার, শক হূণ দল পাঠান মোগল, কে এঁটে উঠতে পেরেছে বাঙ্গালীর সঙ্গে, দেখা দিকিনি হিস্ট্রিতে। আমাদের আমলে আমরা ছিলাম সেই তেজী হিস্ট্রির বাচ্চা।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ফোর্টে বড়দিনের সময় কুস্তি হত। চ্যাম্পিয়নকে বড়লাট-গিন্নী নিজের হাতে মেডেল পরিয়ে দিতেন, আর আর, তার গালে এই—মানে একটা কিস্ করতেন। ওটা হল ওদের দেশের সিস্টেম, জাতীয় শুল্ক অর্থাৎ কিনা যাকে তোরা ন্যাশন্যাল কাস্টম বলিস, ও পিওর জিনিস, ওতে দোষ নেই, বুঝলি।

যাহোক, আমরা সেসব কুস্তি দেখতে যেতাম। সেবার হল কি, এডিকং কর্নেল সাহেবও নেমে পড়ল রিঙে। শুনলুম, অ্যামেচাররাও এবার কেরদানি দেখাতে পারবে। আমার তো হাত নিশপিশ করতে লাগল। কিন্তু উপায় কি, কে আমাকে চেনে। তাই চুপ করে বসে থাকলুম। কর্ণেল সাহেব লড়লে বটে। বাঘা বাঘা প্রোফেশন্যালরাও পুরো রাউন্ড কেউ ওর সঙ্গে লড়তে পারল না।

কর্ণেল সাহেব শেষ লোকটাকেও চিৎ করে উঠে দাঁড়াল। চটাপট চটাপট হাততালি। সে আর কান পাতা যায় না। বড়লাটের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ছোটলাট তো হুররে হুররে বলে লাফিয়েই উঠলেন। ভাইসরয়-গিন্নী লাট-গিন্নী তালি বাজালেন। তাইতেই কর্ণেল ব্যাটার মরণের পাখনা গজিয়ে উঠল বোধ হয়। সে ব্যাটা চ্যালেঞ্জ করে বসলে, যদি কেউ লড়তে চাও এস। ইন্ডিয়ান কি বৃটিশ, যে ইচ্ছে আসতে পার। আর কেউ যদি চ্যালেঞ্জের জবাব না দাও, কেউ ভয়ে লড়তে না আস, তবে বুঝব, ইন্ডিয়ায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। তখন আমি ইন্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ন বলে নিজেকে ডিক্লেয়ার করব। টাইটেল নেব রুস্তম-ই-হিন্দ।

সেটা নাইনটিন ফোর্টিনের যুগ। পুরো দমে ওয়ার চলছে। আমাদের বাঙালীদের পল্টনে নেয়নি। সেটা একটা ন্যাশন্যাল ইনসাল্ট তো, বুঝলিনে গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ডিসেম্বরের শীতেও গায়ে সেরেফ একটা খদ্দরের বেনিয়ান। মানে ইয়ং ব্লাড্ তো। তার উপর ব্যাটা আবার মুখের উপর চ্যালেঞ্জ করলে। এ কী সহ্য হয়। দাঁড়িয়ে বললাম, আই অ্যাক্সেপ্ট। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেই ভাবলাম, হেরে গেলেই কেলেঙ্কারী। ভারত মাতার মুখে চুনকালি পড়বে। যাহোক গোপনে, মনে মনে, তিন তিনবার বন্দে মাতরম্, ভারত মাতা কি জয় বলে তো উঠে দাঁড়ালাম।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্ণেলের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। দেখলুম বড়লাট-গিন্নীও আমার দিকে চেয়ে নিলেন। আবার হাততালি পড়ল। সবাই ঠেলেঠুলে আমাকে রিঙে তুলে দিলে। সে এক দৃশ্য! আমার মাথার উপর ব্যাটা আরো দেড় দু ফুট লম্বা। অন্য লোক হলে হয়ত নার্ভাস হয়ে পড়ত। অন্য সময় হলে আমিও যে কি করতুম বলতে পারিনে। কিন্তু তখন আমার হাতে ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজ, সব সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি সেটা পাংক্চার্ড্ হয়ে যাবে, বুঝতেই তো পারছিস। কিন্তু তোরা এখনকার জেনারেশান তো, তোদের

সে রকম ফিলিংসই নেই। হয়ত ঠিকমত বুঝতে পারবিনে।

যাক, তেড়ে ফুঁড়ে তো উঠলুম। কিন্তু ড্রেসট্রেস করতে হবে তো। কিছুই তো আনিনি। ড্রেসিং রুমে নিয়ে গেল। দেখি থরে থরে সব বিলিতি জাঙিগয়া টাঙানো রয়েছে। তা সাহেবদের জাঙিগয়া কি আমাদের লাগে? পেল্লায় পেল্লায় সব সাইজ। শ্লিয়েল গোরা তো দেখলিনে জীবনে! তা যাক গে, এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম। এক একটা জাঙিগয়া পরতে যাই আর সেটা আমার বুক অব্দি উঠে আসে। সাইজ মত একটা জাঙিগয়ার অভাবেই সেদিন জাতির মান প্রায় যেতে বসেছিল আর কি? ভাগ্যিস এদিক ওদিক চেয়ে এক ভোজপুরি দারোয়ানকে পেলুম। তার ল্যাঙগটটা চেয়ে নিয়ে ড্রেস করলুম। তারপর জয় মা কালী বলে রিঙে গিয়ে উঠলুম। সমবেত দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে আমাদের ফাইট দেখতে লাগল।

আমি ছ' রাউন্ড ফাইট দিলাম! কর্ণেল ব্যাটা আমার টিকিও ছুঁতে পারল না (তা বলে সত্যিই আমার কিছু টিকি ছিল না)। কর্ণেল ব্যাটা যত প্যাঁচই ঝাড়তে যায়, আমি ততই কাটান প্যাঁচে সরে পড়ি। সত্যি বলতে কি, তখনও পর্যন্ত আমি কুস্তির কোন প্যাঁচই ঝাড়িনি, সেরেফ চু-কিৎ কিৎ খেলার কায়দাতেই আমি ওকে কাটান মারছিলাম। তার উপর আমি ওর চাইতে বেঁটে ছিলাম বলে ইজিলি ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে পারছিলাম। সিক্স্থ্ রাউণ্ডেও আমাকে কাৎ করতে না পেরে ব্যাটা বেশ ঘাবড়ে গেল। সাত রাউণ্ডের মাথায় একটু অসতর্ক হয়েছে কি, ব্যাটাকে মারলাম এক জবর ল্যাং। একেবারে বিশুদ্ধ বাঙগালী মতে। যাই বলিস আর তাই বলিস, ল্যাং মারায় বাঙগালীর কাছে ওয়ার্লডের কেউ দাঁড়াতে পারে না। নেই নেই করেও এই বিদ্যেটি বাঙগালীর এখনও আছে। আর এই ল্যাং মারার ঐতিহ্য বাঙগালী যতদিন বজায় রাখতে পারবে ততদিন হোয়াট বেঙ্গলি থিংক্স্ টুডে ইণ্ডিয়া উইল থিংক টুমরো।

ফল পেলাম হাতে হাতে! ল্যাংখানি খাবার সঙ্গে সঙ্গে বাছাধন কাৎ, অর্থাৎ প্রথমে কাৎ এবং পরে চিৎ। নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু। রেফারি আমাকেই উইনার ডিক্লেয়ার করলে। আবার পটাপট হাততালি, হুররে হুররে চীৎকার। কর্ণেল সাহেব অতিকষ্টে উঠে হ্যাণ্ডসেক করল। বলল, ব্র্যাভো বাবু, ব্র্যাভো!

বড়লাট-গিন্নীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। বড়লাট, ছোটলাট, মেম্বর, মাতব্বর সবাই আমার হাত ঝাঁকালেন। চারিদ্দিক থেকে খালি হুররে ব্রজদা, হুররে ব্রজদা। কানে মাইরি তালা লেগে যাবার উপক্রম।

বড়লাট-গিন্নী আমার গলায় মেডেলটি পরিয়ে দিয়ে কিস্টি করবার জন্য

আমার মুখখানা যেই ওর পাউডার পমেটম মাখা মুখের কাছে টেনে নিলেন, অমনি আমি বেঁকে দাঁড়ালাম।

বলে উঠলাম, সরি ম্যাডাম! আই কাণ্ট টেক ইট। ওটা নিতে পারব না।

মেম-সাহেব বড়লাটের বউ। এমন কথা জন্মে শোনেননি। ওঁর কাছে এটা তো রীতিমত বেয়াদবি। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চটে ফায়ার।

বললেন, কেন?

কিন্তু আমি ব্রজ। ওতে কি আমি ঘাবড়াই। জাতীয় রক্ত টগবগ করে উঠল। বুক ফুলিয়ে বললাম, ম্যাডাম, ওটা ফরেন গুড্‌স্‌। এখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে। বিলাতী মাল আমরা বয়কট করেছি কি না।

দ্বিতীয় গল্প

আপনাদের সাবধান করে দিয়েছিলাম, ব্রজরাজ কারফর্মা যখন মুখ খুলবেন তখন তাঁকে কোন-মতেই ডিস্টার্ব করবেন না। ব্রজদার কথা শোনবার একটাই মাত্র সর্ত আছে, কান পেতে শুধু শুনে যাওয়া। প্রশ্ন নয়, তর্ক নয়, পিছনে সামনে হাসি নয়, এমন কি চোখ টেপাটেপি পর্যন্ত নয়। অবিশ্বাসীর গন্ধ পেলেই ব্রজদার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রজদা বাংলাদেশ ও জাতির উত্থানপতনের ইতিহাসের এমন নেপথ্য সব অধ্যায় জানেন (অনেক ক্ষেত্রে সেসব অধ্যায়ের স্রষ্টা ব্রজদা নিজেই) যেগুলো সাধারণ বাঙ্গালীর জানা নেই বলেই তো বাঙ্গালীর আজ এই দুর্দশা। আত্ম-বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে বাঙ্গালী আজ তলিয়ে আছে। বাঙ্গালীকে ওঠাবার জন্য, জাগাবার জন্যই ব্রজদার কাহিনী বলা দরকার। বাঙ্গালীর উচিত বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ব্রজদাকে চেনা।

রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদে হাত দিয়ে ব্রজদাকে মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন। একদিন কবি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্রজ, কি রকম বুঝছ? ব্রজদা কবিকে অভয় দিলেন, পড়ে যান না, ভয় কি? আমি তো আছি। এই আশ্বাস কবিকে যে কি পরিমাণ উৎসাহিত করেছিল এবং তার ফলে জগৎসভায় বাঙ্গালী যে শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পেরেছিল, বিশ্বের লোক আজ তার সাক্ষী। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার পিছনে ব্রজদার অবদান কতখানি। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য এ ইতিহাস আমরা জানিনে। আমরা এও তো জানিনে, বলাকা কবিতা লিখতে ব্রজদাই কবিকে খুঁচিয়েছিলেন।

সেদিন ব্রজদা সবিস্তারে যখন এই কাহিনী বলতে শুরু করেছিলেন, তখন কোন মূঢ় যেন পিছন থেকে খুক খুক করে হেসে ফেলেছিল। ফলে ব্রজদা তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করেছিলেন। পরে বহু কষ্টে আমাকে সে কাহিনী ব্রজদার মুখ থেকে বের করতে হয়েছে। তাই আপনাদের পই পই করে বারণ করি, ব্রজদার সামনে বেচাল হবেন না। বাংলা ও বাঙ্গালীর আশু সর্বনাশটি ঘটাবেন না।

বলাকা কবিতা লেখাবার হিস্ট্রি এখানে বলতে বসিনি। আসলে এ কাহিনী ব্রজদার এফিসিয়েন্সির। তবু পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার

জন্য অতি সংক্ষেপে সেই হিস্ট্রিই আগে বলছি। ভাইসরয়ের জাঁদরেল এডিকং কর্ণেল ক্লিম্যাণ্টকে কুস্তিতে হারিয়ে দেবার পর ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেবের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কর্ণেল সাহেবের নেমন্তন্ন পেয়ে ব্রজদা সেবার কাশ্মীরে বেড়াতে যান। কার্তিক মাস। পাহাড়ে পাহাড়ে শীত এসে পড়েছে। বরফ জমতে শুরু করেছে। চিনার গাছের পাতা ঝরে ঝরে শ্রীনগর শহরের পথে পথে খালে 'ডালে' ছড়িয়ে পড়েছে। হাউসবোটে আর শিকারায় ঘুরে ঘুরে ব্রজদা কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে হাঁস মেরে বেড়াচ্ছেন। ওঁরা দুজনেই মহারাজার গেস্ট। ব্রজদা শিকারা চালিয়ে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করায় মহারাজা ব্রজদাকে সুন্দর একখানা তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন।

ব্রজদা বললেন, প্র্যাকটিকেলি সেই তলোয়ার থেকেই কবি 'বলাকা'র প্রেরণা পান। তবে শোন, আমি আর কর্ণেল সাহেব একদিন শিকারার বাইচ খেলছিলাম।

সেই শিকারার বাইচ নিয়েই তো হঠাৎ একটা এক্সিডেণ্ট ঘটে গেল। আর ধরতে গেলে বলাকার সূত্রপাত হল সেই এক্সিডেণ্ট থেকে।

কর্ণেল সাহেবের খেয়াল চাপল শিকারার বাইচ খেলবে। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের রিগাটার কথা বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছিল কর্ণেল সাহেবের। সাহেব ছিল চ্যাম্পিয়ন হাল ধরিয়ে। বললে, ব্রজ, তুমি তো বেঙ্গলি, নৌকো বাইচ্ শুনেছি তোমাদের ন্যাশন্যাল স্পোর্টসের মত। হারলে যদি লজ্জা না পাও তো এস এক হাত লড়ে যাই। ন্যাশন্যাল প্রেস্টিজে ঘা পড়লে ব্রজদা আর স্থির থাকতে পারেন না। সে তো আমরা বরাবর দেখেছি। ব্রজদা তৎক্ষণাৎ বললেন, আই অ্যাকসেপ্ট।

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে এক সাইজের দুখানা শিকারা মহারাজা বের করে দিলেন। গোটা শ্রীনগরে সে কি উত্তেজনা! কাতারে কাতারে লোক জুটে গেল ডাল লেকের ধারে ধারে। হাজার হাজার হাউস বোট ভাসল জলে। মহারাজা মহারাণী আর মহারাণীর এক ভাইঝি স্পেশ্যাল বোটে করে এলেন। ব্রজদা মহারাণীর ভাইঝির যা বর্ণনা দিয়েছিলেন তাতে আমার মনে হয়েছিল, ফিল্মের স্টাররাও তার কাছে সীসের সিকির বেশি কিছু নয়। (ব্রজদা বলেছিলেন : খাস কাশ্মীরী বিউটি যে কি জিনিস সে তোরা আইডিয়া করতে পারবিনে। ওসব বর্ণনা করা যায় না। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ভাষায় বলতে হয়, প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম।)

শিকারায় উঠবার আগে রাজকুমারী চম্পাকলি (চাঁপার কলিই বটে!) ব্রজদার হাত ধরে বলেছিলেন, মাই ডিয়ার বিরজু, জাতির প্রেস্টিজ তোমার হাতে। আমি শালিমার গার্ডেন থেকে ফুল তুলিয়ে রেখেছি, বেণ্ট শাল যে পশমের সুতো দিয়ে তৈরী হয়, সেই সুতো আনিয়ে রেখেছি। তোমরা স্টার্ট

দলেই মালা গাঁথতে বসব। মনে রেখো, সে মালা তোমার জন্যে তোলা থাকবে।

ব্রজদা আত্মপ্রত্যয়ের হাসির ছিটে রাজকুমারীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হেসে শিকারায় এসে উঠলেন। ব্রজদা আর কর্ণেল সাহেব রেডি হয়ে বসতেই মহারাজা ব্ল্যাংক ফায়ার করে স্টার্ট দিলেন। ব্রজদা মনে মনে বদর বদর বলে দাঁড়ে টান দিতেই দেখেন রাজকুমারী চম্পাকলি সুতোর সূচে একটি ফুল গেঁথেছেন! ব্রজদা ঘাড় ঝুঁকিয়ে ইশারা করতেই রাজকুমারীর মুখের হাসি শরতের রোদ হয়ে যেন লেকের জলে ছড়িয়ে পড়ল।

ব্রজদা ইজিলি জিতে গেলেন। কিন্তু কর্ণেল ব্যাটা নার্ভাস হয়ে একটা এক্‌সিডেণ্ট বাধিয়ে বসল। শিকারার সেই তীরের মত গতি সামলাতে না পেরে এক হাউসবোটের গায়ে গিয়ে মারল প্রচণ্ড ধাক্কা। বোটটা পোক্ত ছিল বলে ক্ষতি কারও কিছু হল না। কিন্তু একটা অপূর্বসুন্দর বাঁধানো খাতা ছিটকে বেরিয়ে এল বোটের ভিতর থেকে। আকাশে একটা প্যারাবোলা এঁকে ব্রজদার মাথার উপর দিয়ে তীর বেগে বেরিয়ে গেল। খাতার মলাটে সোনার জলে যে নামটা লেখা ছিল সেটা রোদের আলোয় ব্রজদার চোখে এসে বিঁধল। "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" হ্যাঁ, ও হাতের লেখা তো ভুলবার নয়। ব্রজদা মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফুল স্পীডে শিকারা চালিয়ে দিলেন। ঝপাঝপ দুখানা দাঁড়ে গোটা আষ্টেক হিঁচকে টান মারতেই তীরের বেগে শিকারাখানা এগিয়ে গেল। আর খাতাটা জলে পড়তে না পড়তেই ব্রজদা বাঁ হাতে খপ করে সেখানা ধরে ফেললেন। শিকারার স্পীডে সেদিন যে রেকর্ড সৃষ্টি করলেন ব্রজদা, আজও তা কেউ ভাঙতে পারেনি।

কবিকে খাতাটা নিয়ে দিতেই কবি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, ব্রজ তুমি! খাতাখানা খুব বাঁচিয়েছ। নতুন ধরনের কাব্য রচনা করব বলে ওখানা যত্ন করে বাঁধিয়ে এনেছি, আজকেই ট্রাঙ্ক থেকে বের করলেম। আর তার পরেই এই বিপত্তি, ওঃ খুব বাঁচিয়েছ।

ব্রজদা কথা না বলে কবির পায়ের ধুলো নিলেন। তারপর থেকে কবি যতদিন শ্রীনগরে ছিলেন ব্রজদা রোজ সন্ধ্যেয় কবির সঙ্গে গল্প-গুজব করতে তাঁর হাউস বোটে যেতেন। কর্ণেল সাহেব যতবড় বন্ধুই হোন, আর রাজকুমারী চম্পাকলি যতবড় সুন্দরীই হোন (রাজকুমারী ব্রজদার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। এদিকে অফিসে এন্তার কামাই হচ্ছে। নতুন চাকরী। প্রিভিলেজ লীভ্, ক্যাজুয়েল লীভ্ শেষ হয়ে গেল, মেডিকেল লীভ্ গেল, শেষ পরে যখন লীভ্ উইদাউট পে হবার উপক্রম, তখন ব্রজদা মরীয়া হয়ে পালিয়ে আসেন। সে আরেক হিস্ট্রি। পরে বলা যাবে।) বাংলায় কথা বলতে না পারলে বাঙ্গালী হাঁপিয়ে মরে। নানান



এটা তো বেশ জিনিস হে ব্রজ

দেশের নানান ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা। এ বিষয়ে বাঙগালী আবার বড্ড গোঁড়া। এতদিন ইংরেজী বলে বলে ও ভাষাটার উপর ব্রজদার অরুচি ধরে গিয়েছিল। তাই কবিকে পেয়ে ব্রজদা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সন্ধ্যে বেলায় বোটের ছাতে বসে বসে ব্রজদা কবিকে লেখার বিষয়ে আইডিয়া দিতেন। সেই সময় একদিন এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যেতে ব্রজদা বললেন, আচ্ছা আপনি এই হাঁস নিয়েই তো একটা পোয়েট্রি লিখতে পারেন। সাজেশানটা সেদিন কবির খুব মনঃপূত হল। বললেন, চেষ্টা করে দেখব।

তারপর অনেকদিন ব্রজদা কবির ওখানে গিয়েছেন। ব্রজদার কোমরে রাজকুমারী চম্পাকলি নিজের হাতে তলোয়ারটা বেঁধে দিয়েছেন। আবার তারও একটা হিস্ট্রি আছে। কিংখাবের খাপখানার সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রাজকুমারী নিজের হাতে ব্রজদার জন্য কাশ্মীরী শালের একটা সবুজ পান্না রঙের কোমরবন্ধ বুনে দিয়েছিলেন। সেই কোমরবন্ধে তলোয়াব ঢুকিয়ে ব্রজদার কোমরে বেঁধে দিয়েছিলেন রাজকুমারী। নিজ হাতে।

কবি তলোয়ারখানা দেখে খুব খুশী। বার বার নেড়ে-চেড়ে দেখেন আর বলেন, এটা তো বেশ জিনিস হে ব্রজ। কি চমৎকার, কেমন সুন্দরভাবে বাঁকানো।

ব্রজদারও সেদিন কেমন যেন ভাব লেগে গেল। কোমরবন্ধে রাজকুমারীর ছোঁয়া। তার উপর কবির প্রশংসা। যেমন বাল্মীকির মুখ দিয়ে মা নিষাদ শ্লোকটা ফস করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি ব্রজদার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আজ্ঞে ঠিক যেন ঝিলমের বাঁকা স্রোতেরই মত।

কবি চমকে উঠলেন। দি আইডিয়া। থ্যাঙ্ক ইউ ব্রজ। পেয়ে গেছি। ইউরেকা। তারপর ধ্যানমগ্ন হয়ে বোটের ছাতে তক্ষুনি তক্ষুনি বসে গেলেন। বসে বসে সেই বাঁধান খাতার প্রথম পাতায় মুক্তোর মত হস্তাক্ষরে ফস্-ফস্ করে লিখে গেলেন :

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার.........

এই হল বলাকা কবিতা লেখার সংক্ষিপ্ত হিস্ট্রি। এর মধ্যে, এই তিনটে ছত্রের মধ্যে বাঙগালীর যে গৌরবময় ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, ক'জন বাঙগালী তার খবর রাখে! নিজেরা তো খবর রাখেই না, ব্রজদা যদি উপযাচক হয়ে বলতেও যান, অমনি তারা হেসে উড়িয়ে দিতে চায়।

ব্রজদা বললেন, এই একটা দোষেই বাঙগালী গেল।

বলাকার কথা থাক, এফিসিয়েন্সির কথা বলি।

সেদিন কথা হচ্ছিল জীবনবীমা নিয়ে। এফিসিয়েন্সির কথা উঠল।

যদুদা বলছিলেন, ন্যাশনালাইজ করবার পর জীবনবীমা অফিসের এফিসিয়েন্সি জাহান্নামে গিয়েছে। প্রিমিয়াম জমা দিলে এক বছর লাগে রসিদ আসতে।

সুনীল বোস টাইপ মেসিনের খটখটি থামিয়ে বলল, ন্যাশানালাইজ করবার পর কোন জিনিসেরই বা এফিসিয়েন্সি থাকে। স্টেট বাস বল, রেল বল, গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়েছে কি তার বারটা বেজে গেল।

সুনীত ঘোষ বলল, এ আমাদের ন্যাশন্যাল ক্যারেক্টারের দোষ মশাই। সাহেব কোম্পানীর মত এফিসিয়েন্সি দেশী কোম্পানী দেখাতে পারে না।

ব্রজদা চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। বললেন, তোদের জেনারেশানটাই দেখছি বড্ড ইন-ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সে ভোগে। আমাদের আমলে এটা ছিল না।

এখন তোরা স্বাধীন হয়ে যেসব কথা বলিস, সেই পরাধীনতার আমলে সাহেবরা ওসব কথা বলত। আর আমরা তাদের থোঁতামুখ ভোঁতা করে দিতাম।

সেই স্বদেশী আমলে একটা স্বদেশী বীমা কোম্পানী খোলা হয়েছিল। তখন রুল ব্রিটানিয়া এসিওরেন্স কোম্পানীর খুব প্রতাপ। ওদের স্যার ফোরটোয়েণ্টি বলে ঝানু এক স্কচ সাহেব ছিল ফিল্ড এজেণ্টদের কর্তা। সেই সাহেব কোম্পানীর দাপটে স্বদেশী বীমা কোম্পানী যখন লাটে ওঠার উপক্রম হল, তখন স্যার রাজেন আমাকে রিকোয়েষ্ট করলেন, ফিল্ড এজেণ্টদের পরিচালনার ভার নিতে। বলেছিলেন, এটাকে কেউ যদি দাঁড় করাতে পারে, তবে তুমিই পারবে, ব্রজদা। আমি ওটাকে প্রফেশন নয়, মিশন হিসাবে টেক আপ করলাম।

একদিন স্যার ফোরটোয়েণ্টিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেব, তোমাদের কোম্পানীর এত পসার কেন বলতে পার? অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।

স্যার ফোরটোয়েণ্টি বললেন, আপত্তি কিসের। এ তো ওপেন সিক্রেট। এফিসিয়েন্সি ম্যান, সেরেফ্ এফিসিয়েন্সি। আমাদের ক্লায়েণ্ট মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হিসাব-পত্র পরিষ্কার করে রাখি। শ্মশান থেকে ফেরবার পথেই তার ওয়ারিশকে চেক দিয়ে দিই। ইউ ইণ্ডিয়ানস্, এম্পারার অব্ আইড্‌ল্‌নেস, মানে কুঁড়ের বাদশা, পানের পিক ফেলতে তোমাদের ছয়মাস লাগে, তোমরা জীবনেও আমাদের কোম্পানীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। নেভার, নেভার, নেভার।

তোরা তো জানিস ব্রজরাজ কারফর্মার ন্যাশন্যাল স্পিরিটে যদি কেউ ঘা দেয় তাহলে সে ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে। সাহেব ব্যাটার কথা শুনে আমি তাই

রীয়া হয়ে উঠলাম। নতুন সিস্টেম ইনট্রোডিউস্ করে এফিসিয়েন্সি আমরা একশগুণ বাড়িয়ে ফেললাম। ফল মিলল হাতে হাতে।

উইদিন সিক্স মান্থ সাড়ে সাত লাখ টাকার বিজিনেস দিলাম।

খবর পেয়ে সেই স্কচ্ সাহেবের চোখ কপালে উঠল। একদিন আমাকে ডেকে বললে, বাবু তুমি যে মিরাকল্ করলে। তোমার সিক্রেটটা কি বলবে. অফকোর্স যদি আপত্তি না থাকে।

হেসে বললুম, সাহেব, আপত্তির আর কি আছে। তোমার কোম্পানীর মূলমন্ত্র যা, আমার কোম্পানীরও তাই। এফিসিয়েন্সি। তবে এফিসিয়েন্সি তোমাদের থেকে আমাদের হাজারগুণ বেশি। এ তো স্কচ ফার্ম নয়, বাঙালী ফার্ম।

সাহেব বলল, হোয়াট! কি বললে?

আমি বললুম, ঠিকই বলেছি। একদিন এসে দেখেই যাও না।

সাহেবের বাচ্চা তো, এল একদিন। কাজকর্ম দেখে সত্যিই খুশি হল খুব। আমার ঘরে জানালার ধারে বসে দুজনে কফি খেতে খেতে গল্প করছি, এমন সময় পাঁচতলার ছাত থেকে আমাদের এক পলিসি-হোল্ডার পা ফস্কে পড়ে গেল। প্রিমিয়াম জমা দিতে এসেছিল। রাস্তা থেকে গেল গেল রব উঠল। লোকটা পাঁচ হাজার টাকার বীমা করেছিল। আমার ঘর তেতলায়। আমার জানালার পাশ দিয়ে পড়বার সময় তার হাতের মুঠোয় পুরো পাওনার বেয়ারার চেক্খানা গুঁজে দিলাম। পুরো টাকা হাতে নিয়েই সে আছাড় খেয়ে মরল।

সাহেবের চোখ ছানাবড়া। অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর উঠে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললে, চোখে না দেখলে ভাবতাম গুল ঝাড়ছ। তোমাদের সঙ্গে আমরা পারব না। আমাদের ব্যবসাটা গুটোতেই হবে দেখছি।

তৃতীয় গল্প

সুনীত ঘোষ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, মশাই আমি নিজের কানে শুনেছি। যা শুনেছি তা মিথ্যে বলি কি করে?

সুনীল বোস বললে, যা তা একটা বললেই তো হল না মশাই। মিনিষ্টার যতই ইয়ে হন না কেন, এরকম কথা কি বলতে পারেন?

যদুদা দেখলেন বড্ড গরম চড়ছে। ঠাণ্ডা করবার জন্য বললেন, এক্জাক্ট কি কথাটা বলেছিলেন তিনি, বলতে পারেন?

সুনীত ঘোষ বললে, কেন পারব না মশাই। প্যারেড ট্যারেড হয়ে গেলে পুলিশমন্ত্রী পুলিশ-কুকুর দুটোর গলায় রাষ্ট্রপতির দেওয়া বকলস বেঁধে দিলেন। তারপর বুক ফুলিয়ে ভাষণ দিলেন, এই যে পুলিশ কুকুর দুটি, এদের নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং শৃঙ্খলাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে। এরা সমগ্র পুলিশ বাহিনীরই গৌরব। একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আশা করি এদের সহকর্মীরা এদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বাহিনীর সুনাম, গৌরব ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

সুনীত গড়গড় করে এক নিশ্বাসে ভাষণটি আউড়ে টেবিলে চাপড় মেরে বললে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট।

কিছু অন্যায় বলেননি। বৃটিশ আমলে ক্যালকাটা পুলিশে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে বাছা বাছা লোক আনা হত টেররিষ্টদের ধরবার জন্য। তারা তো ছদ্মবেশী টেরিয়ার কুকুরই।

কথাটা শুনে চমকে আমরা পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, ব্রজদা। সুনীল বোসকে একটু সরিয়ে দিয়ে এসে বসলেন।

তারপর নিজের কথারই জের টেনে বলতে শুরু করলেন, জানিস তো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ হচ্ছে ওয়ার্লড্ চ্যাম্পিয়ান পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরতে দারুণ ওস্তাদ। ওদের ধারে-কাছে এ বিষয়ে দাঁড়াতে পারে, এমন কাউকে তো আজ পর্যন্ত দেখিনি। এমনিতে বিলিতি সাহেব, কিন্তু মুটে মজুর, বাঙালী, বিহারী, এমন কি কুকুর বিড়াল পর্যন্ত অনায়াসে সাজতে পারত তারা। আসল কি নকল ধরাই দুষ্কর হত। মানে ওসব ছিল বিলিতি মেকার কিনা। ওদের কেরদানিই ছিল আলাদা বুঝলি। তাই তো বলছি দেশী পুলিশকে সরকার যদি সত্যিই কুকুরের দোসর করে তুলতে পারেন, তবে তো কাজের মত

কাজ হয় একটা।

সুনীত ব্রজদার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। এতক্ষণ তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল। এবার মিন মিন করে বললে, মানুষ কি কুকুর হতে পারে?

ব্রজদা বললেন, উপযুক্ত ট্রেণিং পেলেই পারে। কিন্তু কথাটা উঠল কেন।

বিনীতভাবে বললুম, পুলিশ প্যারেড্ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—

ব্রজদা বাধা দিয়ে বললেন, প্যারেড! আজকাল কি আর প্যারেড হয়। হ্যাঃ। দেখলে মনে হয় যেন মর্ণিং ওয়াক হচ্ছে। হ্যাঁ, প্যারেড হত বৃটিশ আমলে। সেবার সেই প্যারেড নিয়েই তো লর্ড কিচেনারের সঙ্গে আমার বেধে গিয়েছিল একচোট। লর্ডের পোর থোঁতামুখ ভোঁতা করে দিয়েছিলুম। তা জানিস?

সবাই হাঁ করে ব্রজদার মুখপানে চেয়ে রইলুম!

তবে শোন, ব্রজদা শুরু করলেন :

ফার্ষ্ট ওয়ার্লড্ ওয়ার তখন খুব জমে উঠেছে। জার্মাণদের হাতে প্যাঁদানি খেয়ে খেয়ে বৃটিশদের চোখে এন্তার সরষের ফুল ফুটছে। সেই সময় লর্ড কিচেনার ইন্ডিয়াতে এলেন। লর্ড কিচেনার তখন মেসোপটেমিয়ায় মিত্র-শক্তির কম্যান্ডার-ইন-চিফ। দারুণ পোজিশান। তার উপর ভাইস্‌রয়ের বৌয়ের ক্লোজ ফ্রেণ্ডের বর। বুঝে দ্যাখ কিচেনারের রিসেপশনটা দিল্লিতে কেমন হল। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এলেও অত ঘটা হয়েছিল কিনা তা আমি বলতে পারব না। তবে আমার লাইফেও আমি ওরকম কম দেখেছি।

ইন্ডিয়ার ক্যাপিট্যাল তখন নিউ দিল্লিতে উঠে গেছে। খুব বেশি দিন তো হয়নি তাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কথায় কথায় জলুস ছোটাচ্ছে। সে যে কি রোয়াব তোরা আইডিয়া করতে পারবিনে।

যা হোক, নিউ ইয়ারে লর্ড কিচেনারের অনারে বিরাট এক প্যারেডের ব্যবস্থা হল। কিচেনার নিজেই স্যালুট নেবেন। ভাইসরয়ের এডিকং-এর আমি আবার ছিলুম পার্সন্যাল ফ্রেণ্ড। নেমন্তন্ন পেয়ে না গিয়ে আর পারলুম না। ইম্পিরিয়াল মেলের টিকিট অব্দি পাঠিয়ে দিয়েছিল কিনা। ইম্পিরিয়াল মেল জানিস তো? বড়লাটের নিজের গাড়ি। সেই মেলে ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া আর কোন কেলাসই থাকত না।

প্যারেডের দিন আমরা সব ইম্পিরিয়াল গ্যালারীতে বসলুম। প্রথমে ভাইসরয়, পাশে তার বউ, তার পাশে এডিকং, তার পাশে আমি, তারপর পর পর নানা হোমরাচোমরা বসল। রাজা মহারাজারা সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা আমাদের পিছনে বসেছে। আর সব ব্যাটা আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। কেন, বুঝেছিস তো? আমার প্রেস্টিজ মাপছে।

বিউটিফুল প্যারেড। ইণ্ডিয়ানদের হাতে রাখবার জন্য আরম্ভ করলে জয়সলমীর রিশালা দিয়ে। ওটা হল উট বাহিনী। ডেজার্ট ফাইটে খুব নাম কিনেছিল। তারপর রাজপুত ল্যান্সার। অশ্বারোহী বাহিনী। তারপর ফিফ্‌থ ক্যাভাল্‌রি। পুরো একটার পর একটা কোম্পানী পাস করছে আর হাততালির চোটে দিল্লির আকাশ ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে। শিখ রেজিমেণ্ট, মারাঠা ইন্‌ফ্যান্‌ট্রি চলে গেল। কী তেজ! তারপর গেল বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান। নামেই বেঙ্গল। বাঙ্গালী একটাও নেই। অপমানে আমার মুখ কালো হয়ে গেল। ন্যাশান্যাল ইন্‌সাল্ট তো। ওদের ধারণা বাঙ্গালী যুদ্ধ করতে জানে না। মানে কন্‌স্‌পিরেসি করে কথাটা রটিয়েছে আর কি। ঠিক মত ব্যাকিং পেলে বাঙ্গালীরা যে কী করতে পারত, সে আইডিয়া তো আর বৃটিশদের ছিল না। আখেরে তাই ম'ল। যেদিন থেকে ইংরেজরা ব্যাকিং দেওয়া বন্ধ করল, তার পরদিন থেকেই বাঙ্গালী স্বদেশিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে চালাকি!

প্রায় দুঘণ্টা প্যারেড চলল। আমি বলেই অপমানটা স্পোর্টসম্যানের মত গিলে প্যারেড দেখতে লাগলুম। এবার আসছে স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বেষ্ট রেজিমেণ্ট নাকি এইটেই। চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে। কারণ এটা হল কিচেনারের সব থেকে পেয়ারের রেজিমেণ্ট। লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌ করতে করতে এগিয়ে আসছে ওরা। হঠাৎ আমার কানে বেসুরো বাজল। কি ব্যাপার? উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম। নাঃ, ঠিক তেমন করে পা মিলছে না। খুব সূক্ষ্মভাবে ছন্দপতন ঘটছে কোথাও? ব্রজরাজ কারফর্মার কানকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। জাতীয় বাহিনীর হাজার হাজার ছেলেকে এক সঙ্গে প্যারেড করিয়েছি। আমার কাছে তো পেঁয়াজি চলবে না!

এডিকং-এর কানে কানে বললুম, কি কর্ণেল সাহেব, এই তোমাদের বেষ্ট রেজিমেণ্ট! প্যারেডে যাদের পা মেলে না তারা হল বেষ্ট! ছোঃ। কর্ণেল সাহেব আমার আচমকা বিদ্রুপে এমন ঘাবড়ে গেল যে স্থানকাল ভুলে প্রায় উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠল, পা মিলছে না—হোয়াট ডু ইউ মিন?

ভাইসরয়ের বউয়ের কানে সে কথা উঠল। তিনি বললেন, কি, কার পা মিলছে না। কর্ণেল সাহেব থতমত খেয়ে বললে, ও কিছু নয় ইওর অনার। ব্রজদা বলছিল—

ভাইসরয়-গিন্নি লর্ডের মেয়ে। অত সহজে ভোলবার ভবী নয়। আমাকে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, ব্রজ, কাম হিয়ার। আমার পাশে এসে বস। কিসের থেকে ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়ে গেল। বড়লাটের বউ লাটস্য লাট, তাঁর আদেশ তো অমান্য করা যায় না। বসলুম পাশে গিয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, হোয়াট ব্রজ, কি বলছিলে। আমি ভয় খাব কেন, আমি কি সরকারের সারভেণ্ট? বললুম,



হোয়াট ব্রজ, কি বলছিলে:

ম্যাডাম, প্যারেডে এদের ঠিক মত পা মিলছে না। বেসুরো স্টেপ পড়ছে। কোথাও গড়বড় কিছু হচ্ছে।

ভাইসরয়-গিন্নি বললেন, ইজ দ্যাট সো?

বললুম, ইয়েস ম্যাডাম। ভুল যদি বলি তবে এখেনেই আমাকে ফাঁসিতে লটকে দিও। দিস্ ইজ মাই চ্যালেঞ্জ।

ভাইসরয়-গিন্নির চোখমুখ লাল হয়ে উঠল প্রথমে। পরক্ষণেই বিব্রত হয়ে উঠলেন। আমার হাত দুটো চেপে ধরে রিকোয়েস্ট করলেন, ব্রজ প্লিজ, একথা আউট কর না কখনও। কিচেনার আমার গেস্ট। বড় লজ্জায় পড়বে বেচারা।

কি আর করি, কথা দিলুম। এদিকে আরেক কান্ড হয়ে গেল। স্কটিশ হাইল্যান্ডার রেজিমেন্ট মার্চ পাস্ট করে বেরিয়ে গেল কিন্তু কোন হাততালি পড়ল না। কারণ এতক্ষণ ধরে প্রথম হাততালিটা শুরু হচ্ছিল ভাইসরয়ের গিন্নির কাছ থেকে। তারপর আর সবাই তাঁকে ফলো করছিল। কিন্তু এবারে আমার হাত দুটো ভাইসরয়-গিন্নি বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন বলে তাঁর হাত দুটো এনগেজড্ হয়ে পড়ল কিনা, তালি বাজাবার ফুরসৎ পেলেন না। তাই কেউই আর তালি বাজাতে পারল না। সত্যি, বৃটিশ এটিকেট একটা দেখবার মত জিনিস। এর আর জুড়ি নেই।

এদিকে আসল জায়গায় হাততালি পড়ল না দেখে ভাইসরয় বোমকে গেলেন, রেজিমেন্টের মুখ কালো আর লর্ড কিচেনার খচে লাল হয়ে উঠলেন। ভাইসরয়-গিন্নি যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন তখন মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। ভাইসরয়েতে আর তাঁতে কিছুক্ষণ ধরে কি যেন ফিস্ফিস্ হল, ভাইসরয় আমার দিকে একবার চাইলেন। এর মধ্যেই প্যারেড শেষ হল।

আমরা উঠব উঠব করছি এমন সময় দেখলুম ভাইসরয়েতে আর লর্ড কিচেনারেতে আবার কি যেন ফিস্ফিস হচ্ছে। ভাইসরয় আর কিচেনার দুজনেই কিছুক্ষণ আমার দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। কিচেনার তাঁর সরু গোঁফের ডগা ঠোঁটের কোণ দিয়ে চাটতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ইশারা করে কর্ণেল সাহেবকে ডাকলেন। কর্ণেল সাহেবের মুখ দেখে মনে হল তাঁর বারটা বেজে গেছে। দুজনে আবার কিছুক্ষণ ফিস্ফিস্ হল। তারপর আমার ডাক পড়ল।

লর্ড কিচেনারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আমাকে জেরা করতে শুরু করলেন। ব্যাটার জেরার চোটে প্রাণ আমার যায় আর কি।

লর্ড কিচেনার : ইয়ংম্যান, তুমি বলেছ প্যারেডে পা মেলেনি।

আমি : ইয়েস স্যার।

লর্ড কিচেনার : প্যারেডের তুমি কি বোঝ?

এইবার আমার বড় রাগ হয়ে গেল বুঝলি, বললুম, দেখ সাহেব, আমি হচ্ছি বেঙ্গল টর্কোটিভ ফোর্সের অনারারি জি-ও-সি। আমার হেডকোয়ার্টার বাগবাজারের রোয়াক। দুনিয়ায় এমন বিদ্যে নেই যা আমার অজানা। এখানে চালাকি মারতে এস না। তোমার ঐ রেজিমেন্টের মত পাঁচটা রেজিমেন্টকে ডেলি দশবার প্যারেড শেখাতে পারি। শিখিয়েও থাকি। ভুল বলেছি কি ঠিক বলেছি আগে যাচাই করে দ্যাখ, তারপর আমাকে চ্যালেঞ্জ করো। গডেস্ দুর্গার প্রোসেসনও আমাকে লীড করতে হয়। স্টেপিং-এর কারচুপি ধরতে আমার বেশি সময় লাগে না।

লর্ড কিচেনার বললেন, হুঁ, লেট মি সি। তারপর ভাইসরয়, ভাইসরয়-গিন্নি, আমাকে আর কর্ণেলকে নিয়ে লর্ড কিচেনার একখানা গাড়িতে উঠলেন। আমরা সটান চললাম স্কটিশ হাইল্যান্ডারদের ছাউনিতে।

গোটা রেজিমেন্ট তখন মনমরা হয়ে বিশ্রাম নেবার উপক্রম করছিল। আমাদের দেখে ওদের তো প্রাণ উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব খটাস খটাস অ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়াল। কিচেনার হুকুম দিলেন প্যারেড করতে। ওরা মার্চ করে ওদিক থেকে ফিরে এসে আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। সবাই একে একে মার্চ করে বেরিয়ে গেল।

কিচেনার আমার উপর খুব চটে উঠলেন। বললেন, ইট ইজ অলরাইট।

আমি মুচকি হেসে বললুম, লর্ড সাহেব, নো অলরাইট। স্টেপিং-এর গোলমাল আছে।

লর্ড কিচেনার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, ইউ ডার্টি বিস্ট, দেখাও, বের কর কোথায় ডিফেক্ট।

আমি তখন সিঙ্গল ফাইল প্যারেডের পরামর্শ দিলুম। তারপর চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলুম ভাইসরয়-গিন্নির পাশে। একজনের পর একজন আমাদের সামনে দিয়ে লেফট রাইট করতে করতে বেরিয়ে যেতে লাগল। তারপর যেই আমার কানে বেসুরো লাগা অমনি বললুম, হল্ট। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওরা থেমে পড়ল।

সামনের লোকটাকে ফাইল থেকে বের করে আনলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বাঁ পায়ে কি হয়েছে? সে তো হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অর্ডার দিলুম, জুতো খোল। সে ভয়ে ভয়ে জুতো খুলল। বললুম, মোজা খোল। সে ব্যাটা লেডির সামনে কিছুতেই মোজা খুলবে না। তখন ধমক মারলুম, বল, তোমার গোড়ালিতে কি লেগে আছে। সবাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। বুঝতে পারছি কারোর মাথাতেই কিছু ঢুকছে না। কিন্তু আমি ব্রজ। আমি কি অত সহজে ছাড়ি।

আবার ধমক মারলুম। গোড়ালিতে কি আটকে আছে।

ব্যাটা এতক্ষণে পথে এল। বললে, স্যার চুইং গাম। কি করে যেন মোজার ভিতর ঢুকে গেছে। স্বস্তির সঙ্গে পা ফেলতে পারছিনে।

জাস্ট সি, বলে লর্ড কিচেনারের দিকে চাইতেই তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, অকল্পনীয়—ব্রজ, ব্রজদা ইউ আর গ্রেট। তারপর কানের কাছে মুখ আনতেই আমি বললুম, বুঝেছি স্যার, কাউকে বলব না। এর কথা তাকে বলা, আমাদের বাঙ্গালীদের তেমন স্বভাব নয়।

ভাইসরয় আর তাঁর গিন্নি বললেন, থ্যাংক ইউ ব্রজ।

চতুর্থ গল্প

সুনীত ঘোষ বললে, থামুন মশাই, আপনি তো কনফার্মড্ ব্যাচেলর, আপনার মুখ থেকে মেয়েদের সম্পর্কে কোনো মন্তব্য শুনতে চাইনে। বিয়ে-থা আগে করুন—

বাধা দিয়ে সুনীল বোস বললে, দুদিনের বৈরেগী হয়ে ভাই ভাতকে মহাপ্রসাদ বলতে শুরু করেছ। তোমাকে আর বলব কি। বিয়ে করলেই যদি মেয়ে-চেনার সাবজেক্টে অনার্স পাওয়া যেত, তাহলে তো দুনিয়াটা বেহেস্ত হয়ে উঠত। মেয়েদের চেনা কি অতই সহজ।

চিনবেন কি করে? যদুদা অমায়িক হেসে মন্তব্য করলেন, ওরা স্বরূপে কি কখনও ধরা দেন? সব সময় ছদ্মরূপে বিরাজ করছেন। ঐজন্যই তো মহাজন ব্যক্তিরা ওঁদের নাম দিয়েছেন বিচিত্ররূপিণী। মেয়েদের ছদ্মবেশ উন্মোচন করা—

শিবেরও অসাধ্য, মানুষ তো কোন ছার। ব্রজদা গম্ভীরভাবে রায় দিলেন।

বললেন, শুনলে হয়ত বিশ্বাস করবিনে, তিন সপ্তাহ এক তাঁবুতে দিনরাত কাটিয়েও তিন তিনটে জাঁদরেল লোক আমরা টেরই পাইনি যে, আমাদের সঙ্গে রয়েছে ওয়ার্লড্ ফেমাস এক মহিলাও। বৃটিশ সরকার যাকে মৃত কিংবা জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার গিনি বকশিশ করবে বলে ডিক্লেয়ার করেছিল।

হাঁ হয়ে যাবার মতই অভিজ্ঞতা বটে। ব্রজদা থামলেন। একটু পরে বললেন, গল্প-কথা নয়, একেবারে ট্রু ফ্যাক্ট। স্বয়ং আমি তার সাক্ষী। মাতাহারির নাম শুনেছিস তো? ফেমাস জার্মান স্পাই? আমরা সেই মাতাহারির সঙ্গে তিন সপ্তাহ এক নাগাড়ে এক মিলিটারি ক্যাম্পে বাস করেছি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে সেও আমাদের সঙ্গেই ঘুরছে ফিরছে আসছে যাচ্ছে, এমন কি কখনো কখনো একই বিছানায় আমাদের সঙ্গে শুচ্ছেও। আর হোল্ মিলিটারি সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, মেয়ের মত মেয়ে বটে মাতাহারি। ঐ যে তোরা যা বললি, বিচিত্ররূপিণী, এ একেবারে তাদেরই মহারানী। আমি তো আমার লাইফে আর সেকেন্ড মাতাহারি দেখলুম না। যেমন চোখ-কানা-করা রূপ আর তেমনি ক্ষুরধার তার বুদ্ধি। অমন দুঁদে যে এলায়েড্ ফোর্স তাকে একেবারে নাকানি-

চোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। একদিকে মাতাহারি একা আর অন্যধারে গোটা এলায়েড্ ইনটেলিজেন্স। তাও ওকে এঁটে উঠতে পারেনি। বার বার এদের টপ সিক্রেট আউট করে দিয়েছে। এলায়েড্ ফোর্স যতবার জার্মানদের মোক্ষম মার দেবার প্ল্যান এঁটেছে ততবারই দেখা গেছে সে-সব প্ল্যান আগেভাগে জার্মানদের হাতে গিয়ে পড়েছে। আর জার্মানরা রাম-প্যাঁদান পেঁদিয়েছে এদের।

বৃটিশরা বুঝতে পেরেছিল তাদের স্ট্যাটেজিক কোনো জায়গায় জার্মান স্পাই এসে থানা গেড়েছে। কিন্তু কে যে সে স্পাই, কোথায় তার আস্তানা, কি কৌশলে সিক্রেট আউট করছে, সেটা আর কিছুতেই ধরতে পারেনি। পারতও না, যদি এই শর্মা সে কাজটা না করে দিত।

বলেই ব্রজদা নিজের বুকে আঙ্গুল দেখালেন।

ব্রজদা খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ফোঁস করে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, সে কি আজকের কথা। বোধ হয় নাইনটিন সেভেনটিন-টেভেনটিন হবে। ফার্স্ট গ্রেট্ওয়ার তখন পুরোদমে চলেছে। খুঁটিনাটি সব মনেও নেই ভাল করে। বৃটিশ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সের পুরনো রেকর্ড হাতড়ালে দেখতে পারি 'অপারেশান ব্রজদা' বলে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তাতে আছে। আর যদি লর্ড কিচেনারের অরিজিন্যাল ডায়েরীখানা পাস, তাহলে তো কথাই নেই। পুরো হিস্ট্রিটাই তাতে পাবি। তবে এখন তার মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারি।

শোন তাহলে :

আই, এফ, এ, শীল্ডের কোয়াটার ফাইন্যালে মোহনবাগানের হয়ে খেলে বাড়ি ফিরছিলুম। আমার তেমন খেলবার ইচ্ছে ছিল না এবার। বাঁ-হাঁটুর মালাটা ভেঙ্গে একদম চুরমার হয়ে গিয়েছিল কি না। হাঁটতেও কষ্ট হত। কিন্তু গোরাদের সঙ্গে খেলা তো, রিস্ক্ নেওয়া যায় না, গোষ্ঠ একা সাহস পায় না। বার বার করে বললে, ব্রজদা, তুমি না খেললে এবারে গেলুম। তাই রাজী হয়েছিলাম। হেরে গেলে তো ন্যাশনাল প্রেস্টিজটি একেবারে ডকে উঠবে, বুঝলিনে। তাছাড়া সন্তোষের মহারাজার পার্সন্যাল রিকোয়েস্ট, কিছুতেই না করতে পারলুম না। গোটা চারেক নিক্যাপ পরে মাঠে নামলুম। গোষ্ঠ ব্যাক। আমি রাইট ইন। গোষ্ঠ লাইন থেকে সট্ ঝেড়ে বল কর্ণারে পাঠায় আর আমি সেই ডান দিকের বল বাঁ পা দিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কোনাকুনি নিচু সটে নেট্ করি। হাফ টাইমের আগেই পর পর চার বার। ওদের গোলি আমার এই নতুন কৌশল ধরে ফেলার আগেই দেখা গেল, ফোর টু নিল।



কোনাকুনি নিচু সটে নেট্ করি

যাহোক, বাড়ি ফিরতেই এক চিঠি পেলুম। ছোটলাটের চিঠি। পত্রপাঠ এসে দেখা করুন। জরুরি। বড্ড বিরক্ত হলাম। ম্যাচ্ খেলে টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, এখন কোথায় একটু রেস্ট নেব, না এই ঝামেলা। কিন্তু লাট মানুষ, দেখা করতে চেয়েছে, কি আর করা, সেইভাবেই বেরিয়ে গেলুম।

রাস্তায় নামতেই কে যেন পিছন থেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, রাস্তার মোড়ে কালো গাড়ি আপনার জন্যে ওয়েট্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চাইলাম, কিন্তু কাউকে আর দেখলুম না। ব্যাপারটাতে একটা রহস্যের গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়ল। ভাবলুম, ব্যাপারটা কি? এর মধ্যে কারো কারসাজি আছে না কি? না কি আমাকে নিয়ে কেউ মজা মারছে?

তোরা আজকালকার জেনারেশান তো, কি করতিস কে জানে? কিন্তু আমি ব্রজরাজ কারফর্মা, কোনো জিনিসে হাত দিলে তার শেষ না দেখে ছাড়িনে। ভারত মাতার তৈরী ছেলে, পিছু হটতে জানিনে! গটগট করে গাড়িতে গিয়ে চাপলুম।

শেষ পর্যন্ত লাট সাহেবের বাড়িতেই গেলুম। লাট সাহেব নিজে এসে আমাকে আদর আপ্যায়ন করলেন। অসময়ে ডিস্টার্ব করার জন্য অ্যাপলজিও চাইলেন। তারপর খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, মিঃ কারফর্মা, ব্যাপারটা টপ্ সিক্রেট। শুধু আমি জানি আর আপনি জানবেন। তাই এরকম গোপনীয়তা অবলম্বন করেছি। তবে ব্যাপারটা শুনুন। আপনাকে আজই ফ্রান্সে রওনা দিতে হবে। এখুনি। লর্ড কিচেনারের হেড কোয়ার্টার্সে তিনিই আপনাকে তলব করেছেন। এই দেখুন তাঁর চিঠি। লাট সাহেব ড্রয়ার থেকে সীল করা একখানা খাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। দেখলুম ডিপ্লোমেটিক কভারের চিঠি। চিঠিখানা খুলে পড়লুম। মিলিটারী আদমি তো। বেশি ধানাই-পানাই নেই। লর্ড কিচেনার সোজাসুজিই লিখেছেন: মাই ডিয়ার ব্রজদা, আমি তোমার সাহায্য চাই। ভেরি আর্জেন্ট। অবশ্য সাধারণ বাঙ্গালীর মতো গুলিগোলা খেয়ে মরতে যদি ভয় না পাও, তাহলেই এস। প্রয়োজনের কথা সাক্ষাতে বলব। ইওরস্ লাভিলি—কিচু।

ঐ যে খোঁচাটা দিলে কিচেনার, মরতে যদি ভয় না পাও, ওতেই কাজ হল। আমি রাজী হয়ে গেলুম। না হলে এমনি প্লেনলি যদি বলত তাহলে যেতুম কিনা সন্দেহ। কারণ আমাদের সেকশনের বড়বাবু আমার পিছনে খুব লেগেছিল তখন। উইদাউট নোটিশে কামাই করলে শালা চাকরিই হয়ত খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু জাতের গায়ে খোঁচা মেরেছে, এ চ্যালেঞ্জ তোদের ব্রজদা অ্যাক্‌সেপ্ট না করে পারে! ভাবলুম যায় চাকরি যাবে, তা'বলে জাতের মুখে চুনকালি লেপতে কাউকে দেব না। দেশের জন্য যদি দরকার হয়, চাকরি খুইয়ে না হয় শহীদই হব।

লাট সাহেবকে বললুম, অলরাইট, যাব আমি। তবে দুটো কোয়েশ্চেন আছে।

লাট সাহেব বললেন, বলুন, আপনার কি জানবার আছে?

বললুম, এক নম্বর কথা, আপিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করতে চাই। নইলে মাইনে কাটবে, বড়বাবুটি বেশ টেটিয়া আছে। চাই কি চাকরিও গন্ হতে পারে। আর দু নম্বর কথা, কবে যেতে হবে, কি করে যাব?

লাট সাহেব আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবই আগে দিলেন, এখনই যেতে হবে, জাস্ট নাও। কি করে যাবেন, সেজন্য আপনি ভাববেন না। বৃটিশ ইম্পিরিয়াল গভর্নমেণ্ট সে ব্যবস্থা করবেন। এবার প্রথম প্রশ্নে আসি। আপনি একখানা ছুটির দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দিয়ে যান। আমি সেটা ম্যানেজ করব।

ব্যস, হয়ে গেল ফয়সালা। এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ শরীরে লর্ড কিচেনারের হেড কোয়াটারে পেঁছে গেলুম। কি পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেণ্ট। একেবারে তাক লেগে যায়। সাবমেরিনে করে আমাকে পেঁছে দিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে উঠলুম আর নামলুম ক্যালেতে। কোথায় গঙ্গা আর কোথায় ইংলিশ চ্যানেল। বিজ্ঞানে কি না করতে পারে!

লর্ড কিচেনারের তাঁবুতে পেঁছতেই তিনি বেরিয়ে এসে আমার দুহাত জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, ব্রজদা, তুমি আমায় বাঁচালে। জানতুম তুমি খবর পেলে আসবেই। তবু তোমায় না দেখা পর্যন্ত অশান্তিতে ছিলুম।

সেই রাত্রেই ডিনারের টেবিলে তিনি ফরাসী স্থলবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ফুসফুসিয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন, হিয়ার ইজ মাই ফ্রেণ্ড ব্রজদা। কামিং ফ্রম ক্যালকাটা।

জেনারেল ফুসফুসিয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ফরাসী ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানালেন।

বললেন, মসিয় ব্রজদা, আমরা ফরাসীরা ইউরোপের বাঙ্গালী বলে গর্ব অনুভব করি। একটা হিস্ট্রিতে পড়েছি নাপলিয়ঁর (তোরা যাকে গাড়লের মতো নেপোলিয়ান বলিস) রক্তেও বাঙ্গালীত্ব ছিল।

জেনারেলের ভুলটা শুধরে বললাম, বাঙ্গালীত্ব নয়, বাঙ্গালত্ব ছিল। বাঙ্গালী আর বাঙ্গাল দুটো সেপারেট স্পিসিস্ কি না। আমার মধ্যেও বাঙ্গালত্বই বেশি। আসলে আমরা বিক্রমপুরের অরিজিন। ক্যালকাটাতে ডোমিসাইল্ড।

এমন সময় কোত্থেকে অপূর্বসুন্দরী এক মাদি কুকুর এসে কুঁই-কুঁই করে আমার বাঁ হাতটা চেটে দিলে। কুকুরটার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলুম না।

তাই চমকে উঠলাম। জেনারেল ফ্রুসফ্রুসিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে বার বার তার কুকুরটার বেয়াদবির জন্য মার্জনা চাইতে লাগলেন।

ধমকে বললেন, জেন জেন, ও-ঘরে যাও।

কুকুরটা চলে গেল। বাঁ হাতটা তুলে দেখি একটা লাল ছোপ লেগে গেছে। অনেকটা আলতার ছোপের মতো।

জেনারেল বললেন, ও কিছু নয়। জেনের লিপ্‌স্টিক খাবার অভ্যাস আছে। সোসাইটি বিচ্‌ কিনা। এটা ওর অদ্ভুত অভ্যাস। আমার জামা-কাপড় প্রায়ই নষ্ট হয় ওর জন্য। আই অ্যাম সরি।

জেনারেলের কৈফিয়ৎ শুনে হাসি পেল। ফরাসী কুকুরও লিপস্টিক মাখে! শালার জাতই আলাদা।

ডিনারের পর আসল কথা শুরু হল। ওরা দুজনে যা বিবরণ দিলেন তার অনেক কথাই টপ্‌ সিক্রেট। এমন কি এখনও তোদের তা বলতে পারব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ যে, জার্মান স্পাইরা এই কম্যাণ্ডের সব সিক্রেট আউট করে দিচ্ছে। ফলে গভর্ণমেণ্টের কাছে লর্ড কিচেনার এবং জেনারেল ফ্রুসফ্রুসিয়ে খুবই বেইজ্জত হচ্ছেন। আর কিছুদিন এমনিভাবে চললে ওদের দুজনের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে 'নো বডি ক্যান সে'। লর্ড কিচেনার জানালেন, ওদের তরফের স্পাইরা যে যে খবর এনেছে তাতে জানা গেছে ক্যাপটেন থ্রি এক্‌স্‌ বলে একজন স্পাই এদের সব খবর ফাঁস করে দিচ্ছে। তার পরিচয়ও জানা গেছে। ক্যাপটেন থ্রি এক্‌স্‌ যার নাম, তারই আর-এক নাম মাতাহারি। পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। ছদ্মবেশে সর্বদা থাকে বলে কেউ তাকে স্বরূপে এ পর্যন্ত দেখেনি। (ঐ যে তোরা যাকে বিচিত্ররূপিণী বলিস্‌, তাই আর কি!) সব রকম ছদ্মবেশ ধরতে সে নিদারুণ ওস্তাদ। আরও জানা গেছে সে-ই এই ক্যাম্পে আছে। কিন্তু কোথায় আছে, কেমন করে এ সব খবর বাইরে পাঠাচ্ছে কেউ তা ধরতে পারেনি।

তোমার কথাই ধর না, লর্ড কিচেনার বললেন, তুমি যে আসবে, সে কথা শুধু আমি জানি আর জেনারেল ফ্রুসফ্রুসিয়ে জানেন। আর তো কেউ জানে না, জানার কথাও নয় কারো। তবুও এ খবর ফাঁস হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ওরা যে কি সাংঘাতিক রকমের অ্যাক্‌টিভ্‌ বুঝে দ্যাখ। এখন, ব্রজদা, মাতাহারির হাত থেকে তোমাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ওকে খুঁজে বের কর। জীবিত অথবা মৃত ধরে দিতে পারলে বৃটিশ ক্রাউন পঞ্চাশ হাজার গিনি পুরস্কার দেবেন।

ভাবনায় পড়লুম। ছোটলাট কন্‌ফিডেন্সিয়াল চিঠিতে লিখেছেন তিন হপ্তার বেশি কোম্পানী আমাকে এক দিনও ছুটি দেবে না।

তিন সপ্তাহ প্রায় কেটে যায়-যায়। আফিসের ছুটিও প্রায় ফুরিয়ে এল।

কিন্তু মাতাহারির কোনো ট্রেসই করতে পারলুম না। শালা ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবার জো হল। লর্ড কিচেনার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফরাসীরা ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। আমার রাতের ঘুম নষ্ট হল।

সেদিন গভীর রাত্রে আকাশ-পাতাল ভাবছি শুয়ে শুয়ে। হঠাৎ দেখি জেন নতুন একটা লিপস্টিক ঠোঁটে করে জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জেনের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। আমি ডাকলেই ও ছুটে আমার কোলে এসে বসে। গাল চেটে দেয়। রাত্রে কখনও কখনও আমার কোলের মধ্যে শুয়েও থাকে। জেনের সঙ্গ পেলে আমার মধ্যে কেমন একটা ফুর্তি চাগিয়ে উঠত। কেন, তা পরে বুঝেছিলাম। জেন সেদিন আর আমার কাছে এল না। কেমন হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। এর আগেও যে দু-একবার এ রকম ঘটনা না দেখেছি তা নয়। কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনো প্রশ্নই জাগেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, জেন যাচ্ছে কোথায় দেখি তো। তড়াক করে উঠে রবার সোলের জুতো পরে ওর পিছু পিছু চললাম। দেখি ওয়ারলেসের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ওয়ারলেস্ অপারেটরের কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতেই সে তের মিটার ব্যান্ডের একটা সেট খুলে দিলে। সেটা থেকে সুঁই সুঁই আওয়াজ বেরুতেই জেন কড়কড় কড়কড় করে নানান ছন্দে লিপস্টিকটা চিবোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে সব রহস্য দিনের আলোর মতো ফুটে উঠল। ওঃ আমি কী গাড়ল! কালবিলম্ব না করে জেনারেলের ঘরে গিয়ে ওকে টেনে তুললুম। লর্ড কিচেনারকে ডাকলুম। বললুম, জেনের জন্য যে লিপস্টিক এনেছ দেখি, কুইক। জেনারেল প্রথমে অবাক হল। তারপর দুটো লিপস্টিক বের করে দিল। এক্সরের আলো ফেলে দেখলুম প্রতিটি লিপস্টিকের ভিতরে খুব সুক্ষ্ম এক ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। আর তার গায়ে লেখা মেড ইন জার্মানী। এখন সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। এইসব যন্ত্র দিয়েই মাতাহারি তাহলে এতদিন বাইরে খবর পাঠিয়েছে।

আমরা তিনজন যখন সব ব্যবস্থা পাকা করে আবার ওয়ারলেসের ঘরে গেলাম তখনও জেন পুরো লিপস্টিক চিবিয়ে শেষ করতে পারেনি। এদিকে প্রায় ভোর হয়ে আসছে।

রিভলবারটি বার করে হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললুম, গুটেনমর্গেন মাতাহারি। ওটা জার্মান ভাষা, বুঝলি। মানে মাতাহারি সুপ্রভাত। জেন সুট্ করে পাশের বাথরুমে ঢুকে পড়ল। জেনারেল গুলি করতে গেল। বাধা দিলুম। একটু পরে বাথরুমকে উদ্দেশ করে বললুম, ও পথে পালাবার সুবিধে নেই মাতা-হারি। বাইরে পাহারা মোতায়েন আছে। ধরা এবার দিতেই হবে।

এই প্রথম বাথরুমের ভিতর থেকে অপূর্ব সুরেলা নারী-কণ্ঠ বেজে

উঠল, ব্রজ, তুমি একটা আস্ত ঘুঘু। তোমার চোখে বেশিদিন ধুলো দিতে পারব না, জানতুম। বাঙগালীদের সঙ্গে কি এঁটে ওঠা যায়! তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এখন দয়া করে পরার কিছু দাও, নইলে বের হই কি করে?

লর্ড কিচেনার বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। তারপর তিনি আর্দালীকে ডাকতেই আমি হুকুম করলুম, যাও, আমার ড্রেসিং-গাউনটা নিয়ে এস।

ব্রজদা চুপ করলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মনে টানতে লাগলেন।

হঠাৎ সুনীল বোস বলে উঠল, ও, তাই বলুন, সেই জন্যই বুঝি জেনের সঙ্গ পেলে আপনার ফুর্তি অত—

বাধা দিয়ে ব্রজদা মুচকি হেসে বললেন, স্টুপিড্!

পঞ্চম গল্প

সুনীল বোস টাইপ-রাইটারের চাবিতে খট-খট চাপ দিতে দিতে চোখ না তুলেই বললে, ইম্পসিবল্।

সুনীত ঘোষ বললে, তার মানে বড় বড় আর্কিওলজিস্টরা যা বলছেন, আপনি বলছেন তা ভুল।

শুধু ভুল নয়, সেরেফ গুল। মাটির নিচে একটা কঙ্কাল পাওয়া গেল, আর আপনি বলে দিলেন, ওটা দশ লক্ষ বছরের পুরনো। ওটা যে আট লক্ষ বছরের নয়, বুঝলেন কি করে।

সুনীল খট-খট করে চাবিতে ঘা মারতে লাগল।

সুনীত বললে, সায়েন্সটা জানা থাকলেই বলা যায়। এই যে মৌর্য যুগের পিকদানি, কণিষ্ক-টনিষ্ক আমলের দাঁত-খড়কে, মাটিতে কোপ মারতে না মারতেই এত সব পাওয়া যাচ্ছে আজকাল, তা সেগুলো বলা যাচ্ছে কি করে। আর্কিওলজি একটা সায়েন্স তো বটে।

যদুদা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মশাই, এই আর্কিওলজির জুৎসই বাংলা কথাটা কি, বলুন তো? পুরাতত্ত্ব না প্রত্নতত্ত্ব?

বললুম, দুটোই তো ব্যবহার হচ্ছে। পুরাতত্ত্ব—

ব্রজদা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বলে উঠলেন, আরে পুরাতত্ত্বই হল আসল তত্ত্ব। কারণ ওটার আগাপাছতলাটাই তত্ত্ব কি না। পুরাতত্ত্ব মানে পুরোটাই তত্ত্ব। কথার মধ্যেই তো মানেটা হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছে।

ব্রজদা ধপ্ করে সুনীত ঘোষের চেয়ারটি দখল করে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তা এতক্ষণ কী বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলি তোরা?

সুনীল বোস মেসিন থামিয়ে কপালের টাকে মোলায়েম করে হাত বুলিয়ে বললে, কেন, কালকের পেপারটা পড়েননি। মাটি খুঁড়ে রুশ বৈজ্ঞানিকরা নযুত-বছুরে এক হাতির কঙ্কাল পেয়েছে। তাই যদুবাবু জিজ্ঞাসা করছিলেন আর্কিওলজির ভাল বাংলা কি?

আমি বললুম ঐ তো ব্রজদা বলে দিলেন, পুরাতত্ত্ব।

সুনীত ঘোষ বললে, আমার ধারণা ছিল, প্রত্নতত্ত্ব। রাখালদাস ব্যানার্জীও বোধ হয়—

ব্রজদা মৃদু হাসিতে অবজ্ঞা ছড়িয়ে বলে উঠলেন, কে? রাখালদা। ও—

সুনীতের চোখ কপালে উঠল। চিনতেন নাকি আপনি রাখালদাস বাবুকে?

ব্রজদা চারদিকে একবার চেয়ে জোর-গলায় বললেন, এই ব্রজরাজ কারফর্মা ভূভারতে না চেনে কাকে?

বুঝতে পারছি আপনারা অনেকেই ব্রজদার পটভূমি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। উঠবারই কথা, কারণ আমরা বাঙ্গালীরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি। না হলে আজ যেখানে ব্রজদাকে মাথায় নিয়ে বাঙ্গালী মাত্রেরই নাচবার কথা, সেখানে এমনই দুর্ভাগ্য আমাদের যে, ব্রজদার নামটাই আমরা ভাল করে শুনিনি।

ব্রজদাকে না জানা মানে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কেই কানা হয়ে থাকা। কারণ ইতিহাসের বইয়ে আর কতটুকু লেখা থাকে? ইতিহাস, ব্রজদার মতে. ঠিক যেন মহাসমুদ্রে ভাসমান বরফ-স্তূপ, যার ন ভাগের একভাগ মাত্র উপরে ভেসে থাকে আর আট ভাগই থাকে জলের তলায়। ব্রজদা বলেন, তিনি হলেন বাংলা দেশের ইতিহাসের ঐ তলানি।

ব্রজদাকে যদি আপনারা জানতেন, তাহলে বুঝতেন বাঙ্গালী কি! আপনারা আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন, সত্যেন বোসের নামও শুনেছেন। হয়ত বোস-আইনস্টাইন থিওরীর নামও শুনে থাকবেন। কিন্তু সত্যেন বোসের সঙ্গে আইনস্টাইনের আলাপটা কে করিয়ে দিয়েছিল জানেন? আমাদের ব্রজদা। কোথায় জানেন? এই কলকাতায়, বসন্ত কেবিনে। নাইনটিন ফোর্টিনে। অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন বাজে কথা। তবে শুনে রাখুন। যা বলছি ঠিকই বলছি, কারণ ব্রজদা নিজমুখে এসব কথা বলেছেন।

শুধু কি এই? ব্রজদাই রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে কপালকুণ্ডলা লেখবার ফ্যাক্ট যোগাড় করে দিয়েছেন, মাইকেলকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করেছেন, রামমোহনকে বিলাত যাবার টিকিট কিনে দিয়েছেন, পাদ্রী কেরী সাহেবকে বাংলা টাইপের নক্সা এঁকে দিয়েছেন, জব চার্নককে—আচ্ছা জব চার্নকের কথা আজ থাক, একদিনে এত হজম করতে পারবেন কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে। ক্রমশ সবই জানতে পারবেন। আমিই জানাব।

এ-হেন ব্রজদার জীবন-চরিত যে বাংলা দেশ ও দশের জন্য প্রচারের প্রয়োজন, আশা করি সে কথা আপনারা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছেন। আমি তাই ব্রজদার মুখের সমগ্র বুলি সংগ্রহ করে রাখছি। কথারম্ভেই তো সে কথা জানিয়ে দিয়েছি। এবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ব্রজদা বললেন, মাটির উপরে সত্যিকারের আছেটা কি? কচু।

সুনীত বললে, কেন, শুধু কচু কেন, লাউ কুমড়ো কফি কড়াইশুঁটি—



আইনস্টাইনের আলাপটা কে করিয়ে দিয়েছিল?

বিরক্ত হয়ে ব্রজদা বললেন, কেন, আর তোর মুণ্ডুটা। ফ্যাচ্-ফ্যাচ করিসনে, দে তো যদো একটা সিগ্রেট।

যদুদা মাথা গুঁজে ফিলিম্ রিভিউ লিখছিলেন। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে ব্রজদা সিগারেট ধরিয়ে জম্পেশ করে গোটা-কতক টান মারলেন।

তারপর বললেন, রিয়েল মাল আছে মাটির নিচে। সভ্যতা কোথায় উঠেছিল দেখতে চাস তো মাটির নিচে চলে যা। কি সব জিনিস যে আছে সেখানে দেখলে ট্যারা হয়ে যাবি! আইডিয়া করতে পারবিনে। হরপ্পা, মহেঞ্জোদড়ো, ব্যাবিলন, নালন্দা—যা সব বেরিয়েছে না, তার কাছে নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো, এমন কি দিল্লি বোম্বাইও কানা। হ্যাঁ, কলকাতা তবু পদে আছে। দেখলেই মনে হয়, সদ্য মাটি খুঁড়ে বের করা টু থাউজেণ্ড বি-সি'র কোন মডার্ন সিটি। ড্রেন, পানীয় জল সরবরাহ, নাগরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যবস্থা, কর্পোরেশন পরিচালনা করবার কায়দা, কাউন্সিলারবাবুদের আচার ব্যবহার একেবারে হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতার কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

একটু থেমে ব্রজদা বললেন, তোরা তো শুধু হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো নিয়েই লাফালাফি করিস। ঐ যে সাহেবরা বই লিখে পাবলিসিটি দিয়েছে! নামেই তো সব স্বাধীন হয়েছিস কিনা, আসলে শ্লেভ মেণ্টালিটি তো এখনও যায়নি। না হলে দেখতিস, তোদের এই ব্রজদা মাটি খুঁড়ে যে সব প্রাচীন জিনিস আবিষ্কার করেছে, হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো তার কাছে গিল্টির গহনা।

জানিস তোরা যে হর্ষবর্ধনের আমলে শান্তিপুরী কাপড়ের চল ছিল? মহারাজ শশাঙ্কের আমলে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্যানিটারি পায়খানা ছিল? আমার মামাবাড়ির পুকুর খুঁড়তে গিয়ে আমি এসব নিদর্শন পেয়েছি। সে সব যত্ন করে আমার বাড়ির মিউজিয়ামে রেখেও দিয়েছিলাম। রয়েল সোসাইটির এক সায়েব একদিন এসে দেখেও গেল। সায়েব তো, সহজে কি বিশ্বাস করতে চায়। প্রথমেই বললে, এখানা যে শান্তিপুরী কাপড় কি করে বুঝলে? বললুম, আমি কেমিকেল এনালিসিস করে দেখেছি। বিশ্বাস না হয় একখানা শান্তিপুরী কাপড় বাজার থেকে কিনে নিয়ে এস। আনলে একখানা, মিলিয়ে দেখে তবে সন্দেহ মিটল। স্যানিটারি পায়খানার ভাঙ্গা চিনেমাটির বেসিনটাও বেশ করে নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপরে জিজ্ঞেস করলে, এটা যে শশাঙ্কের আমলের সেটা নিশ্চয় করে বুঝলে কি করে? বললুম, সাহেব, পুরাতাত্ত্বিকদের যে নিশ্চয় করে কিছু বলার নিয়ম নেই। গুরুর নিষেধ আছে জান না। সাহেব নিজেও তো এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেলেছে। ঝানু লোক। বুঝতে পারলে। থতমত খেয়ে বললে, ঠিক ঠিক, ইউ আর রাইট ব্রজদা। তখন আমি বললুম, সাহেব, পুকুর খুঁড়তে খুঁড়তে

শশাঙ্কের যুগে যেই পড়েছি, অমনি এই ভাঙ্গা টুকরোটা কোদালে ঠং করে লাগল। তখনই আমি লোকজনদের সাবধান করে দিলুম। তাঁরা অতি সাবধানে তুলে আনল। আস্ত থাকলেও না হয় সন্দেহ হত, কিন্তু ওটা যখন ভাঙ্গা তখন ওটা যে প্রাচীন সে সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকে কি করে। তার একটু পরেই আবার খটাং, এবার একটা কলসীর কানা, তার সঙ্গে এক টুকরো জীর্ণ কাপড়। কাপড়টা পরীক্ষা করে দেখলাম, আশি নম্বর কাউণ্টের সুতো, শান্তিপুরী বুনোট। আর কলসীর কানাটা মিউজিয়মে নিয়ে মিলিয়ে দেখলাম, হর্ষবর্ধনের আমলের নিদর্শনের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এখন তুমিই বল সাহেব, তোমার কি মনে হয়। সাহেব এতক্ষণ নোট নিচ্ছিল। আমার কথা শুনে বললে, ব্রজদা, আই থিংক এটা একটা গ্রেট ডিস্কভারি। বলে তো সাহেব চলে গেল। তার অনেকদিন পরে বিলাতী কাগজের এক কাটিং দেখি বাই পোস্টে এসে হাজির। সেই সাহেবের এক বড় প্রবন্ধ।

ব্রজদার মুখের দিকে আমরা সবাই হাঁ করে চেয়ে ছিলাম। ব্রজদা আবার একটা সিগারেট ধরালেন। মৌজ করে গোটাকতক টান দিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন।

তারপর বললেন, সে ব্যাটা এক পেল্লায় থিসিস লিখে ফেলেছে। অবিশ্যি তাই হচ্ছে দস্তুর। দুটো কথাকে দু'শ কথা করা, পাণ্ডিত্য তো তাকেই বলে কিনা। যা হোক তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : বেঙ্গলের এক ভেটারান আর্কিওলজিস্ট তাঁর মামাবাড়ির গ্রামের এক পুকুর খোঁড়বার সময় মহারাজ শশাঙ্কের রেজিমে স্যানিটারি ল্যাট্রিনের এক ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছে। আমি স্বচক্ষে সেই নিদর্শন দেখেছি। পোর্সিলেনের তৈরী জিনিস, আজকাল আমরা যে-সব জিনিস ব্যবহার করি অনেকটা সেই রকম। এ'র দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে বাঙ্গালীরা প্রাচীনকাল থেকেই স্যানিটেশন সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল। এই একই লোক, একই জায়গায় আরো খানিকটা খুঁড়ে হর্ষবর্ধনের সময়কার এক কলসীর কানা এবং তার সঙ্গে জড়ানো আশি সুতোর শান্তিপুরী শাড়ির একটা টুকরোও পান। এর দ্বারা দুটো জিনিস প্রমাণিত হচ্ছে, (১) হর্ষবর্ধনের সময়ে শান্তিপুরী কাপড়ের চল ছিল আর (২) শান্তিপুরী কাপড় আর কলসী (দড়ি কলসীর বদলে) গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করা তখনকার দিনের পপুলার রেওয়াজ ছিল। আর সব মিলিয়ে এই আবিষ্কার প্রমাণ করছে মহারাজ শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের রাজ্যের কিছুটা অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কারণ হর্ষবর্ধনের উপরের লেয়ারেই শশাঙ্ককে পাওয়া গেছে।

ব্রজদা বললেন, দ্যাখ, আবিষ্কারের কথা আগে থেকে বলে দিলে কি ফল

হয়। তাই তো আর কোন কথা বিশ্বাস করে কাউকে বলিনে। নইলে এ শর্মার কাছে এখনও মোক্ষম মোক্ষম সব জিনিস আছে।

বলেই ব্রজদা মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে হুঙ্কার দিলেন, এই, তুই তো খুব রেডিওতে লেকচার মারিস। বল তো বেতার আবিষ্কার করেছে কে?

বললাম, মার্কনিসাহেব।

ব্রজদা বললেন, সাহেব সাহেব করেই তোরা গেলি। ভূভারতে সাহেব ছাড়া আর কিছুতে কি তোদের নজর পড়ে না?

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আচার্য জগদীশ বোসও—

ব্রজদা খুশি হয়ে বললেন, তবু ভাল এ-দেশি একজনের নাম মনে পড়ল। কিন্তু আচার্য বোসকে পরামর্শটা দিলে কে শুনি? এই শর্মা। আসলে আমি কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলুম, গুপ্তযুগেও ভারতে টেলি-গ্রাফ সিস্টেম ছিল, কিন্তু তারও আগে থেকে এদেশে বেতার ছিল। কথায় কথায় জগদীশদাকে একদিন ব্যাপারটা বলতেই চট্ করে বুঝে ফেললেন। সায়েণ্টিস্ট লোক তো। তারপর লেগে পড়লেন লুপ্ত রত্নোদ্ধারে।

সুনীল বোস বললে, বলেন কি ব্রজদা!

একেবারে সেণ্টপারসেণ্ট খাঁটি কথা বলছি। ওরে এবার নিজেদের চিনতে শেখ।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, তবে হিস্ট্রিটা বলি, শোন। সেবার মামা-বাড়িতে কুয়ো খোঁড়াচ্ছি। খুঁড়তে খুঁড়তে টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ছাড়িয়ে গেলাম। ক্রমে ক্রমে নাইণ্টিন্থ্ সেঞ্চুরী, এইট্টিন্থ্ সেঞ্চুরীও পার হলাম। একটু একটু করে ছাড়িয়ে যাচ্ছি সেঞ্চুরীগুলো। ক্রমে ক্রমে 'বি-সি'তে গিয়ে পৌঁছলাম। থার্ড সেঞ্চুরী 'বি-সি' যায়-যায়, এমন সময় ঠং। কোদালে জবর শব্দ হলো। টেনে তুললাম এক হাত-পাঁচেক লম্বা তামার তার। দেখেই বুঝলাম পিওর টেলিগ্রাফের তার। রেল লাইনের ওভারহেড তার দেখেছিস তো? অবিকল যেন তাই। বুঝে দেখ কি না ছিল প্রাচীন ভারতে! প্রাচীন ভারত কি যে-সে জিনিস রে। যেন কালোয়ার পট্টি কিংবা মল্লিক বাজারের পুরনো লোহার দোকান। নেই হেন জিনিস নেই।

ব্রজদা ফোঁস করে এক নিশ্বাস ছাড়লেন।

বললেন, দুঃখু এই, তোরা মাকে চিনলিনে। আমেরিকা একটা মেডিসিন আবিষ্কার করলে তোদের হৈ-হৈ-এর চোটে দেশে তিষ্ঠনো যায় না। রাশিয়া চাঁদে রকেট পাঠালে তোরা উদ্বাহু হয়ে এইসা নৃত্য করিস যে ইজের খুলে আণ্ডারওয়্যার বেরিয়ে পড়ে। কী, না পেনিসিলিন। কী, না স্পুটনিক! বলি লক্ষ্মণের বুকে যখন শক্তিশেল বিঁধল রামের পার্সোনাল সার্জেন সুষেণ যে

অতবড় একটা জটিল অপারেশন করলে, তা তখন কোন কোম্পানীর পেনিসিলিন তাঁকে দিতে হয়েছিল শুনি? নাকি পেনিসিলিন আবিষ্কার হয়নি বলে সেপ্টিক হয়ে লক্ষ্মণ অক্কা পেয়েছিল? বিশল্যকরণীর মত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্ষতহর তো এই ভারতেরই আবিষ্কার।

ব্রজদা বললেন, আর আমাদের বেদ-পুরাণে রকেটের যে সব বর্ণনা আছে তার কাছে তোদের স্পুটনিক লুনিক তো গোরুর গাড়ি! একবার সাঁওতাল পরগনায় টিউবওয়েল বসাতে গিয়ে আমাকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত পাইপ বসাতে হয়েছিল (রুক্ষ দেশ তো, সহজে জল ওঠে না) সেই সময় প্রাচীন-ভারতীয় রকেটের একটা পার্ট্‌স পেয়েছিলাম। মেঘুকে দেখিয়েছিলামও। খুব ইন্টারেস্ট নিয়েছিল। বলেছিল, ব্রজদা ঠিক আছে, ভাল জিনিস এনেছ। ক'জন ছাত্রকে রিসার্চ করতে লাগিয়ে দেব। তা বিধি আমাদের বাম। অকালে চলে গেল। নইলে দেখতিস এযুগেও আমরা বাঙ্গালীরাই রাশিয়ানদের আগে চন্দ্র সূর্যে পৌঁছে যেতুম।

ব্রজদার স্বরে ভর করে ঘরের ভিতর শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। পরিবেশটা থমথম করতে লাগল।

সুনীত ঘোষ গলাটা কোনক্রমে সাফ করে নিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, মেঘু কে?

ব্রজদা বললেন, তোদের ডাঃ সাহা।

সুনীল বোস বললে, তাই বলুন। তা সে রকেটের পার্টসটা কি ছিল?

ঢেঁকির খেটে।

ঢেঁকির খেটে!!

ব্রজদা বললেন, তা এতে অবাক হবার কি আছে। বিশ্বের আদি স্পেস ট্রাভেলার মহর্ষি নারদের বাহনই তো ঢেঁকি। তোদের মর্ডান সব রকেটের মডেলগুলোর শেপও তো তাই।

একথা শুনে সুনীল বোসের টাক ফুঁড়ে ঘামের স্রোত বইতে লাগল।

তার গলা দিয়ে কোনমতে একটা আওয়াজ বেরুল, গুড গড্।

ব্রজদা ধমক দিয়ে বললেন, জয় হিন্দ বলতে বুঝি জিভটা আটকে গেল।

যদুদা সামাল দিলেন। বললেন, ব্রজদা, বেতারের কথা কি যেন বলতে শুরু করেছিলেন!

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, থার্ড সেঞ্চুরী 'বি-সি'তে পৌঁছে টেলিগ্রাফের তার পেলুম, সে তো তোদের বলেছি। অতখানি খুঁড়ে পরিশ্রমও খুব হয়েছিল। সেদিনের মত তাই লোকজনদের রেস্ট দিলাম।

পরদিন খুব ভোর থেকে আবার কুয়ো খোঁড়া শুরু হল। খুঁড়তে খুঁড়তে বি সি টি সি ছাড়িয়ে গেলাম। উপনিষদের যুগ প্রায় ছাড়াব ছাড়াব এমন

সময় জোরে জোরে কোদাল চালিয়ে ঝপাঝপ গোটা দুই কোপ মারতেই—

ব্রজদা চুপ করলেন।

সুনীত সরল ভাবে বললে, রেডিও সেট পেলেন বুঝি।

ব্রজদা নিশ্চিন্তভাবে সিগারেটে দুটো সুখটান মেরে ধীরে ধীরে ধোঁয়ায় একটা ঘূর্ণি তুললেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, না, জল।

বলেই ধীরে সুস্থে উঠে পড়লেন।

সুনীল বললে, তবে যে বললেন বেতার পেয়েছিলেন।

তাচ্ছিল্যের সুরে ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, তা পেলাম বৈ কি।

সুনীত ঘোষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, কি রকম হল ব্যাপারটা। সেই টেলিগ্রাফের তারের পর আর কিছুই তো পেলেন না—

ব্রজদা ততক্ষণে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তার না থাকাই তো বেতার থাকা। মুখ্যু কোথাকার।

ঢক করে দরজার পাল্লা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ব্রজদা অদৃশ্য।

ষষ্ঠ গল্প

রিপোর্টারি তোদের গে সাহিত্য করা নয়, বুঝলি। তাহলে তো রবীন্দ্র-
াথ, মাইকেল, সেক্সপীয়র, টলস্টয়, সবাই এক একজন দিগ্‌গজ রিপোর্টার
য়ে উঠতেন।

ব্রজদার এক ধমকে সুনীত ঘোষ চুবসে এতটুকু হয়ে গেল। সুনীল বোস
যন-কিছুই-হয়নি ভাব করে টাইপ-রাইটারে চোখ বুঁজে আঙুল ঠুকতে
গেল।

ব্রজদা বললেন, আজকাল বুঝি বিনে কাগজেই তোরা টাইপ করিস
ুনীল।

সুনীল বোস দেখল, মেসিনে কাগজ পরানোই হয়নি। অপ্রস্তুত হয়ে
াগজ পরাতে লাগল!

ব্রজদা একটু হেসে বললেন, এতেই ঘাবড়ে গেলি। অথচ আমাদের আমলে
গজ ছাড়াই আমি টপাটপ টাইপ করে সব খবর পাঠিয়েছি! তিনটে বড়
 স্কুপও করেছিলাম।

সুনীলের টাকে তৎক্ষণাৎ গুড়িগুড়ি ঘাম জমে গেল। এই ভরা শীতেও
আর্তকণ্ঠে বেয়ারাকে ডাকতে লাগল।

ভানু, নরেন! কোথায় গেলি রে তোরা। ঠাণ্ডা জল আন। পাখাটা
লে দে।

তারপর হাঁসফাঁস করতে করতে গলার টাইটা ঢিলে করে দিলে। বোতাম-
লো আলগা করলে।

যদুবাবু মঞ্জুদের ছবিটা ক'কলম ব্লক করতে দিলে ভাল হয়, ধ্যানস্থ
য় তাই ভাবছিলেন। ব্রজদার কথায় চমকে উঠলেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠলেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

ব্রজদা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েছেন মনে হল। বললেন, করিস তো সিনেমা
ডটারি, রিপোর্টারির মর্ম বোঝা কি অতই সোজা। দে, একটা সিগ্রেট দে।

জম্পেশ করে এক সুখটান মেরে ব্রজদা বললেন, ঐ যে একটু আগে
নীল যা করছিল, মেসিনে কাগজ না পরিয়ে খটখটাস, ঠিক অমনি করে করেই
মি এককালে ওয়ার্লড্‌স্ বেস্ট স্কুপ করেছি।

সুনীত ঘোষ বলল, যাব্ বাবা, তা আবার কেউ পারে নাকি?

ব্রজদা গ্রুম্ মেরে যেতেই আমরা সর্বনাশের আভাস পেলাম। বে-অব-বেঙগলে ডিপ্রেশনের আভাস পেলে আলিপুর হাওয়া-আফিসের বড় সাহেবের মনের ভাবখানা যেমন হয়ে ওঠে, আমার অবস্থাও তাই হয়ে উঠল। একটা সাইক্লোন, ১০০ মাইল গতিবেগের ঝড়-ঝঞ্ঝা, কি যে উঠবে কে জানে?

নাঃ, মেঘ কেটে গেল।

ব্রজদা বললেন, স্পেশাল করেসপন্ডেণ্টরা সব পারে।

বললাম, স্পেশাল করেসপন্ডেণ্ট—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রজদা বললেন, রিপোর্টারেরই পরিবর্ধিত সংস্করণ আর কি। রাজ সংস্করণও বলতে পারিস। ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল। যেমন রিপোর্টার যদি আমড়া তো স্পেশাল করেসপন্ডেণ্ট হল গে ফজলি আম। রিপোর্টার যদি পাবদা মাছ, তো স্পেশাল করেসপন্ডেণ্ট হল গে রাঘব বোয়াল। এই যে আমি, ব্রজরাজ কারফর্মা, এই আমার কথাই ধর, আমি যখন কলকাতার কংগ্রেস কভার করব, তখন আমি স্টাফ রিপোর্টার, কিন্তু ঐ কাজে মালদয় গেলে সেই আমিই আবার স্পেশাল করেসপন্ডেণ্ট। তোরা এখনও নতুন তো, এসব এডিটোরিয়াল সিক্রেট বুঝতে সময় নেবে।

যাকগে, যা বলছিলাম। ন্যাশন্যাল নিউজ প্রেসের ওয়ার করেসপন্ডেণ্ট হয়ে তো মেসোপটেমিয়ায় গেলাম। নাইনটিন ফিফটিনে। কলকাতা থেকে আমি আর বোম্বাই থেকে এক পার্শী ছোকরা। নাম গুল মার্চেণ্ট। ছোকরা একেবারে আনকোরা নতুন। তাকে তালিম দিতে দিতেই আমার থ্রি-ফোর্থ এনার্জি খরচা হয়ে গেল। আমি তো এডভান্স পার্টির সঙ্গে ফ্রণ্টে আছি। গুল মার্চেণ্ট আছে প্রেস হেড কোয়ার্টারে। যা পাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড টেলিফোনে গুলকে জানিয়ে দিচ্ছি! গুল টেলিগ্রাম ঝাড়ছে। সব কিন্তু কোডে। রয়টার ফয়টারকে আমরা সেবার কানা করে দিয়েছিলাম। দমাদ্দম গুলি চলছে, বেয়নেট চার্জ হচ্ছে, তুরুকরা পিছু হঠছে। হাজারে হাজারে মরছে। প্রথম ট্রেঞ্চে বসে বসে ফিল্ড গ্লাস চোখে এঁটে দেখছি। আর আই-উইট্‌নেস বিবরণ পাঠাচ্ছি। আমার মাথার সঙ্গে হেডফোন আর মাউথ-পিস বাঁধা। কোলের উপর টাইপ-রাইটার। মুখে মুখে টেলিফোনে বলছি আর এক হাতের পাঁচ আঙুলে ঝড়ের মত টাইপ করছি। আমার স্পীড্ ছিল পার মিনিটে দেড় শ ওয়ার্ড। তোদের মত টুকুস টুকুস এমন বেতো টাইপ করলে আমাদের আমলে তৎক্ষণাৎ চাকরি যেত। নিউজ এডিটার সঙ্গে সঙ্গে মাইনে চুকিয়ে দিয়ে বলতেন, যাও বাবা মার্চেণ্ট অফিসে যাও। তখন, বুঝলি নে সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হত। যা হোক, সেদিন তন্ময় হয়ে ভিভিড ডেসক্রিপসন দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি আশপাশ থেকে গুর্খারা বাঘের মত তুর্কিদের উপর লাফিয়ে পড়ল। বেয়োনেটের খোঁচা দিতে দিতে তুর্কিদের পিছু পিছু

তাড়া করে চলল। মুহূর্তে ট্রেঞ্চ খালি। একা আমি শুধু বসে আছি। কি করব ভাবছি, এমন সময়, 'হ্যালো ব্রজ, রেস্ট নিচ্ছ বুঝি, তা নাও, আমি একটু ঘুরে আসি' বলে রয়টারের ঘাঘা করেসপণ্ডেণ্ট মিঃ রিউমার মঙ্গার আমাকে ঠাট্টা করে সামনের দিকে দৌড় দিলে। এই ব্যাটাই ছিল আমার এক নম্বর রাইভাল। ও যে কখন এসেছে আমি দেখিনি। জানিস তো, কেউ মেরে বেরিয়ে যাবে, তোদের ব্রজদা প্রাণ থাকতে তা হতে দেবে না! উইদিন এ সেকেণ্ড টাইপ-রাইটারটা গলায় বেঁধে নিলাম। ঐ যে বন্যার সময় চাঁদাওয়ালারা যেমন করে সিঙ্গল রীড হারমোনিয়াম গলায় ঝোলায় অবিকল তেমনি করে। তারপর যে স্পীডে এইট হাণ্ড্রেড ইয়ার্ড রেসে ওয়ার্লড রেকর্ড ব্রেক করেছিলুম নন্-অফিসিয়াল অলিম্পিকে, সেই স্পীডে দিলুম এক দৌড়। তখনও কিন্তু ফোনে আমার মুখ আর টাইপ রাইটরে আমার হাত সমানে কাজ করে চলেছে। তিন চার মিনিটের মধ্যেই মিঃ রিউমার মঙ্গার এক ফার্লং পিছিয়ে পড়ল। ওর মধ্যেই আমার ফার্স্ট মেসেজ গুল মার্চেণ্টের কাছে পৌঁছে গেছে। নিউজ সবার আগে পাঠাতে যে না পারে সে আবার রিপোর্টার কি? ঘাঘু রিপোর্টাররা অনেক সময় ঘটনা ঘটবার আগেভাগেই তাই মেসেজ পাঠিয়ে বসে থাকে।

সুনীত ঘোষ ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, সে আবার কি কথা? ঘটনা না ঘটলে আবার রিপোর্ট লেখা যায় নাকি?

তোমার মত বুদ্ধু পেতি রিপোর্টার হলে লেখা যায় না, আমার মত পোড় খাওয়া স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্ট হলে যায় বৈকি? জগতের বড় বড় কাগজের দিগ্গজ স্পেশাল করেসপণ্ডেণ্টরা ক'টা রিপোর্ট আর দেখে লেখেন। বেশির ভাগ ডেসপ্যাচ্ই তাঁরা আগে তারবাবুর হাতে গস্ত করে দিয়ে তার পরে ধীরেসুস্থে নিশ্চিন্ত মনে ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করে থাকেন।

ব্রজদার মুখের দিকে সুনীত ঘোষ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে ব্রজদা স্মিতহাস্যে বললেন, রিপোর্টারের কাছে সব থেকে জরুরী কি বল দেখি?

সুনীত বীরের মত বললো, খবরের সত্যতা যাচাই।

ব্রজদা বললেন, তোমার মাথা! তুমি কচু বুঝেছ। টেলিগ্রাফ আফিস। টেলিগ্রাফ অফিসটি আগেভাগে ক্যাপচার করতে পারলেই তোমার বার আনা কাজ হাসিল হয়ে গেল। আর যে চার আনা বাকি রইল তা দিয়ে তুমি খবরই পাঠাও আর আপিসকে টাকা পাঠাবার তাগাদাই দাও, যা তোমার খুশি। খবর কি আদালতের জবানবন্দী যে, তার সত্য মিথ্যা যাচাই করতে হবে। হিজরের যেমন স্ত্রী-পুরুষ হয় না, খবরেরও তেমনি সত্য-মিথ্যা হয় না। তাই রিপোর্টার যা পাঠায় তাই খবর।

ব্রজদা বললেন, এই দালাই লামা যখন পালাই লামা হয়ে এবার ভারতে



সেই স্পীডে দিলুম এক দৌড়

আশ্রয় নিতে এলেন, তখনকার কথাই ধর। দালাই লামা সবে তাওয়াং মঠে এসে পেঁাচেছেন, বিলাতি কাগজের বড় বড় করেসপন্ডেণ্টরা কলকাতায় বসেই কেমন সুন্দর করে দালাই লামার সঙেগ সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ নিজের নিজের কাগজে কত আগে পাঠিয়ে দিলে। আর তোরা এই দেশের লোক হয়ে কি করলি, দালাই লামার সঙেগ দেখা করার জন্য হাত গুটিয়ে বসে রইলি। দালাই লামা আসতে আসতে ততদিনে তার খবর বাসি হয়ে গেল। কি করব, নিতান্ত রিটায়ার করেছি তাই, নইলে দালাই লামা লাসা ছাড়বার আগেই তাঁর সঙেগ এক্সক্লুসিভ্ ইণ্টারভিউ-এর বিবরণ লিখে দিতুম। তোরা কি রিপোর্টার? কলকাতায় তো রিপোর্টার আছে দু তিন জন, আর তো সবই মুহুরি। যা দেখে তা ছাড়া কিছু লিখতে পারে না।

ব্রজদা রাগে গরগর করতে লাগলেন।

বিনীতভাবে বললাম, কিন্তু নাইনটিন ফোর্টিন তো এখনও শেষ হল না।

ব্রজদা তৎক্ষণাৎ শুধরে দিলেন, নাইনটিন ফিফ্‌টিন।

তারপর বললেন, হ্যাঁ, মেসেজ পাঠাতে পাঠাতে ছুটতে লাগলুম। সেদিন যা ঘটেছে তা তো দিলামই, পরেও যা ঘটবে তারও দু-তিন দিনের রিপোর্ট আগাম দিলাম পাঠিয়ে। অবশ্য এসব, এই এ্যাডভান্স মেসেজ লেখবার কায়দা আছে। লিখলেই তো হল না। রিপোর্টারকে সেফ্ সাইডেও থাকতে হবে। ধর, আজ আমি রিপোর্টটা লিখছি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটবে দুদিন পরে। খবরটা আফিস পেঁাছুতেই দুদিন লাগবে। কাজেই আপ টু ডেট করার জন্য আমি দুদিন পরের ডেট লাইনই দেব। এখন ধর, আমি আজ লিখে বসলাম : অদ্য মিত্র সৈন্য মেসোপটেমিয়ায় শত্রু শিবির দখল করিয়া ফেলিয়াছে। তারপর যদি সত্যি সত্যিই দখল করতে না পারে তো আমার বেইজ্জতির আর বাকী থাকবে না। তাই গাড়লের মত ডিরেকটলি না লিখে রিপোর্টটা আরম্ভ করতে হবে এইভাবে : বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত একটি নির্ভরযোগ্য গুজবে প্রকাশ—

সুনীল বোস মুখ ফসকে বলে ফেললে, গুজব আবার নির্ভরযোগ্য হয় কি করে?

ব্রজদা বললেন, তোদের হাতে হয় না বলেই আজ তোদের এই অবস্থা। আমার চিফ রিপোর্টার আমাকে নিজে হাতে তালিম দিয়েছেন, তা জানিস। আমাকে প্রায়ই বলতেন, ব্রজ, সাদা কথায় সিধে ভাবে কখনও কিছু লিখো না। কখনও কোন জিনিস কমিট্ করো না। রিপোর্টের মধ্যে সব সময় "প্রকাশ", "আরও প্রকাশ", "নাকি", এসব যত পার ঢুকিয়ে দেবে, ব্যস্ তাহলেই সেফ্ সাইডে থাকবে। ভাল ভাল রিপোর্টাররা এখনও দেখিস 'প্রকাশ' না লিখে কিছু প্রকাশই করতে পারে না।

সুনীল বোস বললে, কিন্তু ভাষার একটা অর্থ থাকবে তো।

ব্রজদা বললেন, এঃ, কী আমার সুনীতি চাটুজ্জে এলেন রে। ভাষা নিয়ে রিপোর্টার কি ধুয়ে খাবে? ভাসা ভাসা থাকাই তো তার পক্ষে ভাল। তাতেই সেফ্ সাইড্। আমার চিফের মত সদ্‌গুরুর সঙ্গ তোর যে হয়নি তা বুঝতে পারছি। রিপোর্টারির রি-ও শিখিসনি। আমার চিফ্ রিপোর্টার আরও বলেছিলেন, খবরদার নিজের কথা রিপোর্টে লিখো না, যদি নিতান্তই নিজের কথা বলতে হয়, তবে পরের জবানিতে বল। তেমন কাউকে যদি 'কোট' করার না পাও তবে আমরা যার জবানিতে বলি, সেই লব্ধি মহল আর ওয়াকিবহালের মারফতে বল। সে নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আর তা করেছি বলেই তোদের ব্রজদা আজ এত বড় রিপোর্টার হতে পেরেছে। লর্ড কার্জন থেকে লিনলিথগো অব্দি সবাই এই বেজো রিপোর্টারের নামে থরথর করে কাঁপত। বুঝলি না, ওদের হাঁচি কাশি অব্দি কাগজে স্কুপ করে দিতাম কিনা। আমাকে না পেলে গান্ধীজী কোন ঘোষণাই প্রেসে দিতেন না। সেটা জানিসনে বোধহয়। যা কিছু সব আমার এই হাত দিয়ে হয়েছে। একবার সবরমতিতে গেছি, দেখি বাপু খুবই ভাবিত। কি ব্যাপার? না কাকে ওর সাক্‌সেসার করবেন, এই খালি ভাবছেন। বললাম, বাপু, এত ভাবছ কেন, তোমার মন যাকে চাইছে তাকেই কর। জবাহরই উপযুক্ত লোক। বাপু খর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে বললেন, ব্রজ, আমার মনের কথা তুমি টের পেলে কি করে? হাসতে হাসতে বললাম, বাপু, ভুলে যাচ্ছ কেন আমি রিপোর্টার। স্কুপ করাই আমার পেশা। বুঝলি রে, তোদের ব্রজদা এমনি এমনিই এত বড় রিপোর্টার হয়নি।

সুনীল বলল, তারপর সেই টাইপ রাইটারের গল্পটার কি হল।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, তোদের ব্রজদা কখনও গালগল্প করে না। যা বলে, ট্রু ফ্যাক্ট।

কিছুক্ষণ পরে ব্রজদা বললেন, দনাদ্দন দনাদ্দন তখন শেল ফাটছে, ফট ফট গুলি ছুটছে। বোমা ফেটে মুহুর্মুহু ভূমিকম্প হচ্ছে। আর আমি ডাইনে বাঁয়ে বাঁচিয়ে ওর মধ্যে দিয়েই পথ করে বুলেট বেগে ছুটে চলেছি। আরও কিছুটা এগিয়েছি, দেখি তুরুক বাহিনীর এক হাই অফিসার মরে পড়ে আছে। জর্নেল কর্নেল হবে বোধহয়। জ্যান্ত লোক আর পাব কোথায় সেখানে, তাই ওর সঙ্গেই একটা এক্সক্লুসিভ্ ইণ্টারভিউ ঝেড়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনে নিউজটা বলে যাচ্ছি : যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত মৃত সৈনিকের দেহ পড়িয়া আছে। মৃত সৈনিকদের জনৈক মুখপাত্রের সহিত আমার এক বিশেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। উক্ত মুখপাত্র জানান আট ঘণ্টা পূর্বে মিত্রপক্ষের গোলন্দাজ-বাহিনী নাকি প্রবল গোলা বর্ষণ করে। প্রকাশ, তাহাতেই নাকি তুর্কী বাহিনী

ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং অনুমান প্রায় বহু সৈন্যের মৃত্যু ঘটে। আরও প্রকাশ, উক্ত মুখপাত্রও আমাদের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারের আধ ঘণ্টা পূর্বে মারা যান। এই খবরটুকু বলেছি এমন সময় পিঠে সঙ্গীনের খোঁচা। তুর্কীদের হাতে বন্দী হলাম। ছোট্ট একটা গ্রামের বুরুজের উপর আমাকে দিনরাত নজরবন্দী করে রেখেছিল। তবে রিপোর্টার বলে টাইপ-রাইটারটা কেড়ে নেয়নি। আমি করলাম কি, টাইপ রাইটারের বারের উপর ছোট্ট এক দাড়ি কামানো আয়না এমনভাবে ফিট্ করে দিলাম যেন তার উপর রোদ পড়ে চিকচিক করতে থাকে। তারপর আয়নার মুখটা বেস্-হেড-কোয়ার্টারের দিকে ফিরিয়ে টাইপ রাইটারের চাবি টিপে টিপে খবর পাঠিয়ে যেতুম আর গুল মার্চেণ্ট ষোল মাইল দূরে বসে সেই আয়নার উপরে এসে পড়া মধ্য প্রাচ্যের সেই তেজি রোদের রিফ্লেক্সান দেখে দেখে সেগুলো টুকে নিত। এইভাবে আমি একটার পর একটা স্কুপ করেছি। এর নাম রিপোর্টিং! তোরা ওয়েজ-বোর্ডের বরপুত্তুররা সে সব জিনিস কল্পনাও করতে পারবিনে।

সপ্তম গল্প

সুনীত ঘোষ মরীয়া হয়ে বললে, তাহলে কি কোন উপায়ই নেই বলতে চান?

সুনীল বোস বললে, উপায় থাকবে না কেন। পাড়ার মস্তানদের দলে ভিড়ে হয় গেট ভেঙে স্টেডিয়ামে ঢুকুন, আর নয় সুবোধ বালকটি হয়ে বিড়ির দোকানে রেডিওর কমেন্টারি শুনুন। টিকিট কেনবার বাসনা যদি মনের কোণে পুষে রেখে থাকেন তো সেটাকে গঙ্গাসাগরে ভাসিয়ে দিন। আর-জন্মে যদি ক্রিকেট কত্তাদের রিলেটিভ্ রূপে কলকাতায় জন্মাতে পারেন, তাহলে হয়ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

সুনীত ঘোষ ব্যাজার হয়ে বললে, খেলা দেখার মনোবাঞ্ছাটা যদি আমার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? কান দিয়েই খেলা দেখার সুখ মেটাতাম। ইচ্ছেটা জজ সাহেবের কিনা।

সুনীল বললে, জজ সাহেবের! জজের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক।

সুনীত থতমত খেয়ে বললে, আমার সঙ্গে তাঁর ডিরেক্ট সম্পর্ক কিছু নেই। তবে উকীলদের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছে। তাই আমার উকীলবাবু বললে—

যদুদা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আর কান পেতে সুনীতের কথা শুনছিলেন।

ফস্ করে বলে বসলেন, সে কি মশাই, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি!

বলেই জিভ কেটে টেলিফোনে বললেন, ওঃ ভেরি সরি, না আপনাকে নয়, কথাটা বললাম আমার এক ফ্রেন্ডকে। সামনেই বসে আছেন। হ্যাঁ, মেয়াদী মামলা। আবার কি, সেই বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়ার চিরকেলে ডোমেস্টিক ঝগড়া। কি বললেন, কদিনের মামলা? এই মশাই—

যদুদা সুনীত ঘোষকে জিজ্ঞেস করলেন, কদিনের মামলা?

সুনীত বললে, এই তিন বছরে পড়ল।

যদুদা টেলিফোনধারীকে বললেন, এই থার্ড ইয়ারে পড়ল। হাঃ হাঃ হাঃ। যা বলেছেন। আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।

রিসিভারটি ঠিক করে রেখে যদুদা মন্তব্য করলেন, বাড়ি ভাড়ার বখেড়া

মেটাতে আদালতের তিন বছর পার হয়ে যায়! যা হচ্ছে না আজকাল! কি আর বলব।

সুনীত ঘোষ বললে, সেই জন্যই তো আমার উকীল টেস্ট খেলার একখানা টিকিট যোগাড় করতে বললে।

সুনীল বোসের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল।

যাব্বাবা, তা আপনার মামলার সঙ্গে টেস্ট খেলার রিলেসান কি?

সুনীত ঘোষ এবার চটে গেল।

একখানা টিকিট দেবার মুরোদ নেই। তখন থেকে খালি টিক টিক করছেন। রিলেসান কি, সম্পর্ক কি? যত সব ফালতু কোশ্চেন। রিলেসান কি একটা যে, এক কথায় বলব।

সুনীত ঘোষ মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না। তাকে দুম করে খেপে উঠতে দেখে সুনীল বোস ঘাবড়ে গেল। টাকে বার দুয়েক হাত ঘষে নিল।

তারপর আমতা আমতা করে বললে, তা চটছেন কেন?

সুনীত ঘোষ লজ্জায় স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

বললে, মাথার ঠিক নেই মশাই, মাপ করবেন। শিরে সংক্রান্তি কিনা। মামলায় হেরে গেলে যে কেয়ার অফ্ ফুটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্স। কিন্তু সে চান্সও তো দেখছি পাংকচার্‌ড্ হয় হয়।

ব্যাপারটা তাহলে বলি। যে জজের এজলাসে আমার মামলা, তাঁর একটিই মাত্র মেয়ে। আর সে মেয়ে আবার ক্রিকেট ফ্যান। আব্বাস আলি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স পেল না বলে অন্নজল ত্যাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুন্দরামের খেলার রেজাল্ট দেখে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে রেশমের মালা গেঁথে রেখেছে মশাই। যদি কুন্দরাম কলকাতার টেস্টে কোয়ার্টার সেঞ্চুরীও করতে পারে তাহলে আর কথা নেই। আলুথালু হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে যাবে. কুন্দরামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে মূর্চ্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিসমিল্লায় গলদ, সিজিন টিকিট গায়েব হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা যোগাড় করে দেবে তো দাও, নইলে এই হাঙগার-স্ট্রাইক করলুম। আদুরে মেয়ে তো। যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে সেরেফ অনশন। শুধু সেদ্ধ ডিম আর কফি খাচ্ছে। জজ-গিন্নী দুবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর 'কি লোকের হাতে বাপ আমাকে তুলে দিয়েছেন গো' বলে নন্ স্টপ্ বিলাপ শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন। রোজ জজ সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে

তিনি কী করে বসবেন, সেই ভাবনায় আমার উকীল অস্থির। না হলে যে উকীল তিন বছর ধরে আমাকে 'নির্ঘাৎ জিতে যাবেন' বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বললেন কিনা, 'কিচ্ছু বলা যায় না মশাই, হাওয়া বড় খারাপ। বাঁচতে চান তো শিগ্গির একখানা টিকিট যোগাড় করুন।'

একটু থেমে সুনীত বললে, এখন বুঝলেন রিলেসানটা। কি করি বলুন তো।

বললুম, এতই যখন দরকার তখন ব্ল্যাক মার্কেটের দ্বারস্থ হন।

সুনীত বললে, সে চেষ্টাও করেছি মশাই। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার হেবোদার হাতে উনিশখানা পঁচিশ টাকার টিকিট দেখলাম। আমায় বললে, নিবি। আমার কস্ট প্রাইস্ পড়েছে চাল্লিশ। কাল পর্যন্ত ষাট টাকায় ঝেড়েছি। আজ সেভেনটি ফাইভে তোকে একখানা দিতে পারি। আসছে কাল সেঞ্চুরি করব মাইরি। নিবি তো এই বেলা নিয়ে নে, ক্যাশ ডাউন, নো চেক বিজনেস বাওয়া। একটু হেজিটেট্ করলাম। পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তরে নেব—

পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তর, এ তো খুব সস্তা রে গাড়োল। খেলার মত খেলা হলে দু টাকার টিকিটও একশ টাকায় বিক্রি হয়, তা জানিস্। হয়েও ছিল।

ব্রজদার আওয়াজ পেতেই চার জোড়া চোখ পিছনে চাইলে। ব্রজদা ততক্ষণে যদুবাবুর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ব্রজদা ধপাস করে বসে পড়লেন। সুনীল বোস বারবার মুখ মুছতে লাগল।

একবার বললে, এইবার তাহলে পাখাটা খুলে দেওয়া যাক, নইলে গরমে বসা যাবে না।

ব্রজদা বললেন, তোমার গরমটা একটু বেশি হয়েছে দেখছি। জানুয়ারি মাসে পাখা খুলে বন্ধুবান্ধবের বিপদ ঘটানোর চাইতে এই বেলা একটা বিয়ে-থা করে ফেল।

ব্রজদার কথায় বাঁকা বাঁকা ভাব দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, দু টাকার টিকিট একশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সে কি খেলায়?

ব্রজদা সহজ হলেন।

বললেন, যে খেলায় কলকাতায় টিকিট নিয়ে সব থেকে বেশি কাড়াকাড়ি হচ্ছে, সেই ক্রিকেট খেলায়। সাহেবরা সেবার বড় মুখ করে বিলেত থেকে খেলতে এসেছিল তো, তা টীমটাও বড় সরেস এনেছিল জার্ডিন। ভারতে নেমে একটার পর একটা খেলায় জিতে ব্যাটার সাহস বড় বেড়ে উঠেছিল, সেই

জার্ডিন সাহেব কলকাতার মাঠে এক বাঙ্গালীর কাছে রাম প্যাঁদান খাচ্ছে, কথাটা লাঞ্চের আগে মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতেই ডালহৌসী স্কোয়ার খালি করে সাহেব মেমেরা এসে ভিড় করল মাঠে। টিকিটের দাম না বেড়ে আর যায় কোথায়? সাহেবদের ঐ একটা অসাধারণ গুণ। খেলাধুলোর ব্যাপারে নিতেটার মত অত পুতু পুতু করে না। টিকিট একটা পেলেই হল, অ্যাট এনি দাম। কিনলেও তাই! লাঞ্চের আগে যারা দু টাকার টিকিটে ঢুকেছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে গেট পাস ঝেড়ে দিয়ে তারা গাছের ডালে উঠে বসলে।

সুনীত ঘোষ ততক্ষণে নিজের কথা ভুলে গেছে।

উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলে, কার খেলা দেখতে এত ভিড় হয়েছিল ব্রজদা?

ব্রজদা একগাল হেসে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, সত্যিই তুই বড় বোকা নিতে। তোদের ব্রজদা ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? এই সাদা কথাটা ধরতে পারলিনে।

সুনীল বোস বলে উঠল, আপনি আবার ক্রিকেটও খেলেছেন নাকি। কই জানতাম না তো।

ব্রজদা খপ্ করে প্রশ্ন করলেন, তোর ঠাকুর্দার বাপের নাম কি বল তো।

সুনীল বিষম খেল। কিছুক্ষণ মাথা চুলকাল।

তারপর বোকার মত বললে, জানিনে।

অথচ ঔরঙ্গজেবের ঠাকুর্দার বাপের নামটি মুখস্থ করে রেখেছ। তোমার আর দোষ দেব কি, দোষ আমাদের জাতীয় শিক্ষার।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, আমাদের শিক্ষা তো নিজের লোককে চিনতে শেখায় না। তাই তো ব্র্যাডম্যানের নাড়ি-নক্ষত্রও জান অথচ তোমাদের ব্রজদা যে ক্রিকেটে ওয়ার্লড রেকর্ড করেছে, পৃথিবীর কোন ক্রিকেটারই যার ধারে কাছে পেঁছতে পারেনি, সে খবর তুমি, তুমি কেন, কোন বাঙ্গালীই জানে না। বাঙ্গালীর অধঃপতন কি সাধে হয়েছে!

বিরক্তি ছড়িয়ে ব্রজদা বললেন, দে যদু, একটা সিগারেট।

হুস্ করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ব্রজদা বোধ করি মেজাজটাই সাফ করে নিলেন।

বললেন, তবে শুনে রাখ, মাত্র তিন ওভারে সেঞ্চুরি করে শুধু ওয়ার্লড রেকর্ডই করিনি, ক্রিকেট খেলার আইনকানুনে নতুন একটা প্রবলেমও সৃষ্টি করেছি। আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। যদি কখনও চান্স পাস অরিজিন্যাল বৃটিশ ক্রিকেট ম্যানুয়ালখানা খুলে দেখিস। দেখবি "ব্রজদাস্ পাজল্" বলে একটা কথা তাতে আছে।

আমরা চারজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, ব্রজদাস্ পাজল্! সে বস্তুটা কি?

ব্রজদা একটু নড়েচড়ে তারপর আবার স্থির হয়ে বসলেন। একেবারে যেন কাম্বোডিয়ার ধ্যানী বুদ্ধটি।

ধীর গম্ভীর গলায় আওয়াজ বেরুতে লাগল, যে বল ব্যাটের ঠুকুস ঘা খেয়ে মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউন্ডারি লাইন পার হয়, ক্রিকেট রুলে তাকে বলে বাউন্ডারি, তার রান চার। আর যে বল ঠকাস ঘা খেয়ে বাপ বাপ ডেকে তোল্লা হয়ে বাউন্ডারি পেরোয়, তার নাম ওভার বাউন্ডারি, তার রান ছয়। এসব নিয়ম তো দুধের ছেলেরাও জানে। কিন্তু ব্যাটসম্যানের হাঁকড়ানির চোটে যে বল বিপ বিপ করতে করতে স্পুটনিক হয়ে আকাশের বাউন্ডারি পার হয়, তার রান কত? আর সে বাউন্ডারির নামই বা কি? আজ পর্যন্ত তা ঠিক হয়নি। কারণ ক্রিকেটের জন্ম ইস্তক আকাশের বাউন্ডারি বল পার করতে পারে এমন ব্যাটসম্যান একটাই জন্মেছে—

সুনীল বোস মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললে, তিনি আমাদের ব্রজদা।

ব্রজদা কোন কথা না বলে নাকমুখ দিয়ে সেরেফ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

একটু পরে বললেন, কিন্তু একজনের জন্য তো আর রুল হয় না। তাই জার্ডিন সাহেব বলেছিল, ব্রজদা, তোমাকে গ্রেট বললে ছোট করা হয়, ইউ আর ডাবল গ্রেট। দুঃখ এই, তোমার আর জুড়ি জন্মাবে না, তাই ক্রিকেটে তোমার এই থার্ড ডাইমেনশন আর আনাও যাবে না, আমাদের চিরকাল বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তোমার যে মারে বল আকাশে মিলিয়ে যায়, সেটা হিস্ট্রিতে ব্রজদাস্ পাজল্ বলে আবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে।

আগুনটা সিগারেটের একেবারে লেজে এসে ঠেকেছিল। তাই ব্রজদা তাড়াতাড়ি সুখটান মেরেই সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন।

শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।

সুনীতের ডিউটি ছিল, উঠতে যাচ্ছিল। ও কথা শুনে ধপাস করে বসে পড়ল।

ব্রজদা বলে চললেন, কথাটা যখন উঠলই, তাহলে সব খুলেই বলি। জার্ডিনের দল যখন এল, ভারতের ক্রিকেট গগনে তখন সব চন্দ্র সূর্যই বিরাজ করছেন। নাম আর কারও করব না, তোরা কাগজের পুরনো ফাইল দেখে নিস। তবে এটাও সত্যি, ছোকরারা ফাইট দিয়েছিল ভাল। ইণ্ডিয়া হারছিল তবে রিয়েল স্পোর্টসম্যানের মত হারছিল। আসলে যারা হারে, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা দেখাবার চান্স তারাই কিন্তু পায়। এটা আমি বরাবর দেখেছি। জার্ডিনের দল কলকাতায় এলে লাটসাহেব তাঁদের অনারে একটা পার্টি দিলেন।

সেই পার্টিতে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী কথায় কথায় আমাকে জাত তুলে একটু খোঁচা দিলে। বললে, ক্রিকেট তো সিভিলাইজ্ড্ খেলা, রপ্ত করতে ইণ্ডিয়ার সময় নেবে। কি বল ব্রজদা? ন্যাশন্যাল স্পিরিটে ঘা লাগলে তোদের ব্রজদা ছেড়ে কথা কয় না, জানিস তো। বললাম, সাহেব, যা বললে আমাকে বললে। খবরদার একথা আর কাউকে বল না। একে সাহেব তায় লাটের খাস মুন্সি। তেরিয়া হয়ে বললে, কি বলতে চাইছ। বললাম, তোমার জার্ডিনের ভাগ্য ভাল বাঙালীদের পাল্লায় পড়েনি। তাই মান-সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরতে পারছে। সাহেব বললে, তার মানে! বললাম, ঐ যা বললাম তার থেকেই বুঝে নাও। বাঙালীদের খপ্পরে পড়লে তোমার ঐ জার্ডিনের এম সি সি একেবারে টেম সি সি হয়ে যেত। যদি সাহস থাকে, তোমার জার্ডিনকে বল না নেট প্র্যাকটিসের দিন আমাদের সঙ্গে এক হাত খেলে যাক। এমন সময় লাট-গিন্নী সেখানে এসে হাজির হলেন।

হ্যাল্লো ব্রজদা, বলে লাট-গিন্নী আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? মাথায় যেন কোন মতলব ঘুরছে। বললাম, ম্যাডাম, তুমি চ্যারিটি করে রেডক্রসের জন্য টাকা তুলবে বলেছিলে, তা সেই ব্যাপারে আমার মাথায় এক আইডিয়া এসেছে। জার্ডিন সাহেবকে বল না, আমাদের সঙ্গে এক ইনিংস চ্যারিটি ম্যাচ খেলুক। তাতে তোমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্র্যাকটিসও হবে।

লাট-গিন্নী খুব খুশি। বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া। ব্রজদা, ইউ আর লাভ্লি।

ব্যস্, এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম. সি. সি. ভার্সাস গবর্নেসেস্ ইলেভেন।

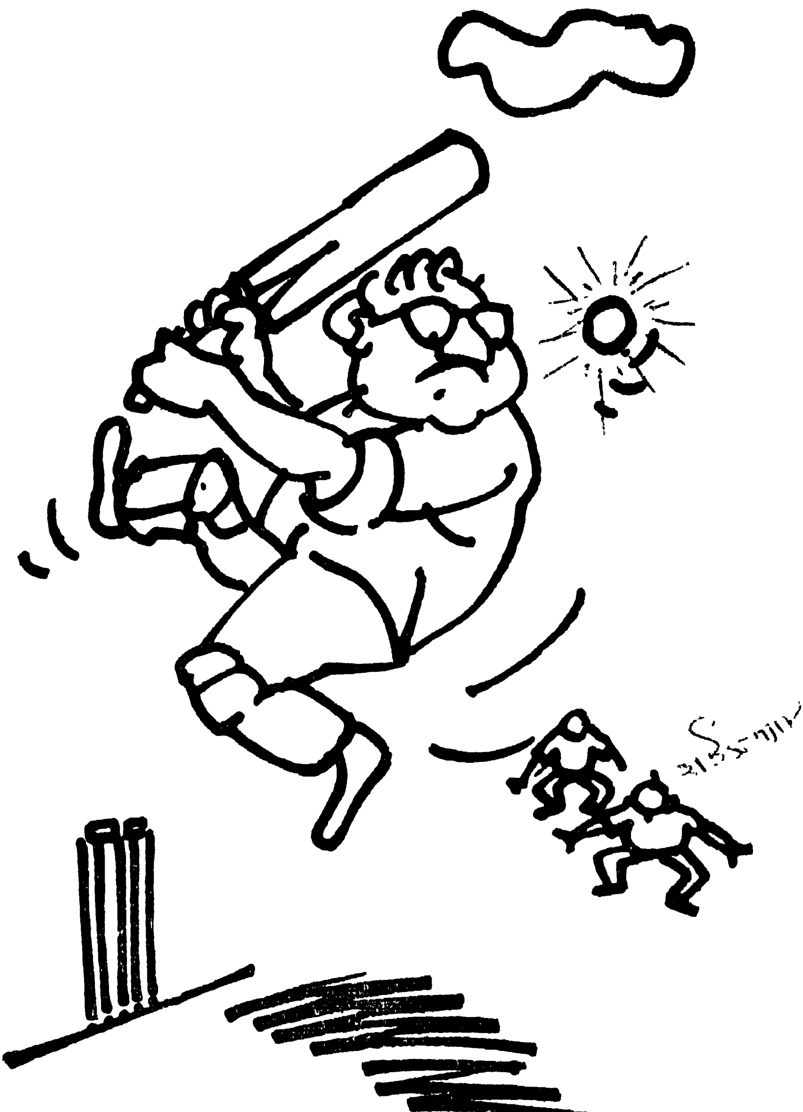
যদুদা জিজ্ঞেস করলেন, গবর্নেসেস্?

ব্রজদা বললেন, গবর্নরস্ ওয়াইফ ইজিকলটু গবর্নেস। তার পরে এপস্ট্রপি এস্। নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারখানা দেখে নিস। নে এখন শোন। তারপর মাঠে তো নামলাম। ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে। খেলার শুরুতে ছিল গোটা কতক ক্লাব মেম্বার আর দিশি রাজা-মহারাজা খেতাবধারীর দল। মোস্ট অব দি মাঠ ফাঁকা। তেমন টিকিট বিক্রি হল না দেখে লাট-গিন্নী একটু মনক্ষুণ্ণ হলেন। যা হোক খেলা শুরু হল। তাড়াতাড়িতে টীম যোগাড় করেছি। উইকেট-কীপার অব্দি নেই। জার্ডিনের লাকটা ভাল। টসে জিতে ব্যাটিং নিলে। কি আর করি, আমিই স্টাম্পের পিছনে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা ছোকরাকে বল করতে ফিল্ডে পাঠাই আর জার্ডিনের ব্যাটসম্যানরা তাকে পেঁদিয়ে বিন্দাবন পাঠায়। একশ বাব মিনিটে ওরা পঁচানব্বই ফর নো উইকেট

করলে। বেইজ্জতির একশেষ! আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা আনাড়িকে প্যাড পরিয়ে উইকেট কিপিং-এ পাঠিয়ে নিজেই বল হাতে নিলাম। জানিস তো আমি দু হাতেই বল করতুম। ডান হাতে ফাস্ট বল দিতুম আর বাঁ হাতে স্পিন। কার সাধ্যি খেলে। যা হোক, ওভারের প্রথম বলেই লেগ ব্রেক। ব্যাটসম্যানের ডান পায়ের প্যাডে ঠক করে বলটা লাগতেই সে ব্যাটা ওফ্ ফাদার বলে ক্রীজের উপর শুয়ে পড়ল। হেঁটে আর প্যাভিলিয়নে যেতে পারলো না। রিয়েল লেগ ব্রেক কিনা।

সেকেণ্ড বল দিলাম গুগলি। অফ স্টাম্প ছিটকে পড়ল। পর পর দু বলে দুজন আউট হতেই দেখলাম গ্যালারির সবাই নড়েচড়ে বসল। মৃদু হাততালিও পড়ল। কিছুক্ষণ পরে দেখি জার্ডিন হোঁৎকা মতন এক ব্যাটসম্যান পাঠিয়েছে। সে তো বেশ পোজ নিয়ে ক্রীজে ব্যাট-ট্যাট ঠুকে খুঁটি গেঁড়ে দাঁড়ালে। দেখেই বুঝলাম ব্যাটা খুব তুখোড়। শুধু গুগলিতে কাবু করা যাবে না, বড় শামুক লাগবে। ব্যাট ধরা দেখেই বোলাররা বুঝতে পারে, ব্যাটসম্যানদের দুর্বল স্থানটা কোথায়। দেখলাম বেটা পা দিয়ে লেগ স্টাম্প কভার করেছে আর ব্যাট দিয়ে অফ আর মিডল স্টাম্প। পরপর দুটো বল কোন ক্রমে ঠেকিয়েও দিলে। নো রান। ঘাঘু ব্যাটসম্যান, মার দেখেই বুঝলাম। আচ্ছা বাবা, তুমি যদি বুনো ওল তো আমি, এই ব্রজরাজ কারফর্মাও, হলাম গে বাঘা ট্যামারিন। কুড়ি স্টেপ পিছিয়ে গেলাম, তারপর ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে একস্ট্রা ফাস্ট বলের সঙ্গে লেগ স্পিন মিলিয়ে অফ স্টাম্পে ঝুলিয়ে দিলাম ছুড়ে। চোখের পলক না পড়তে সিলি মিড অফে বলটা ড্রপ খেয়েই তীব্র গতিতে মোড় নিয়ে লেগ স্টাম্পের দিকে বোঁ করে ঘুরে গেল। ব্যাটসম্যান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোনক্রমে কভার করতে গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম বাছাধন লাট্টুর মত পিন পিন করে স্পিন খেতে খেতে সর্ট ফাইন লেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঐ স্পিন কি আটকান সোজা কথা! ব্যাটসম্যান নিজেই স্পিন করে গেল। আর বলটা ব্যাটের কোনায় ঠেকে গালিতে ইজি ক্যাচ তুলে একেবারে ফিল্ডারের বুক পকেটে ঢুকে পড়ল। টিপখানা দেখেছিস আমার। ক্যাচ মিস করা আমাদের জাতীয় অব্যেস কি না, তাই কোনরকম রিস্ক নিলাম না। তারপর ওঃ, সে কি হাততালি। আমার প্রথম ওভারের রেজাল্ট হল থ্রি উইকেটস—নো রান।

ওয়াটার রিসেস হতেই জার্ডিন সাহেব, লাট-গিন্নী ছুটে এসে আমার সঙ্গে সে কি হ্যাণ্ডসেক। প্রাইভেট সেক্রেটারি লাট-গিন্নীর আদেশে লাটসাহেবকে ফোন করতে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রটে গেল জবর খেলা শুরু হয়েছে। মাঠে ভিড় বাড়তে লাগল। বাইরে গুঁতোগুঁতি। নিমিষের মধ্যে সব টিকিট নিঃশেষিত। গেট পাস নিয়ে নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট শুরু হল। সে এক এলাহী কাণ্ড।



আমিও ঝাড়লাম জাম্পার

লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগেই কোন রান অ্যাড না করে জার্ডিনের দল ঐ পঁচানব্বইতেই আউট হয়ে গেল। স্কোর বোর্ডের বোলিং এনালিসিসটা দিচ্ছি, তার থেকেই রেজাল্টটা জানতে পারবি। বি কারফর্মা সেভেন ওভার ফাইভ মেডেন নো রান টেন উইকেটস।

সুনীল ফস করে বলে উঠল, তা আবার কি করে হয়। এই বলছেন নো রান, আবার বলছেন সেভেন ওভার, ফাইভ মেডেন।

ব্রজদা বললেন, তোদের কাছে হয় না, ব্রজর হাতে সবই হয়। এখন শোন। বকবক করিসনি।

আমরা এবার ব্যাট করতে নামলাম। লাঞ্চের আগে মাত্র তেইশ রানে আমাদের চারটে উইকেট ঝপ ঝপ করে পড়ে গেল। লাঞ্চের পরে মাত্র সাত রান হতে আরও একটা পড়ল। সিক্স্থ ম্যান নামলাম আমি। ওদের বাঘা বোলারকে ফেস করলাম। সে বল ছুঁড়লে। সেটা ছিল ইন সুইংগার। বল মাটিতে পড়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে সর্ট লেগ থেকেই মারলাম একখানা ছয়। বল মাঠ পেরিয়ে লাট সাহেবের বাগানে গিয়ে পড়ল। নতুন বল আনা হল। ঘষে ঘষে তার রঙ চটিয়ে বোলার আবার ছুঁড়লে। অফ্ ব্রেক। মাথার উপর দিয়ে প্যাভিলিয়নের ছাতে পাঠিয়ে দিলাম। আবার ছয়। ফার্স্ট ওভারের ছটা বলেই আমার ছত্রিশ রান হল। নেক্সট্ ওভারে মাত্র দু রানে আমাদের আরও একটা উইকেট গেল। তার পরের ওভারে আমি আবার ছত্রিশ রান করলাম। আমার বাহাত্তর রান নিয়ে মোট রান হল একশ চার ফর সিক্স। পরের ওভারে একেবারে কেলেঙ্কারি। কোন রান না হতেই আরও একটা উইকেট গেল। তারপর আমি আবার ফেস করলাম। বোলার প্রবল বিক্রমে ছাড়লে একটা বাম্পার। আমিও ঝাড়লাম জাম্পার। আমার সঙ্গে চালাকি! লাফিয়ে উঠে এইস্যা এক তাড়ু মার মারলাম যে বল সোজা উপরে গিয়ে আকাশের নীলিমায় একেবারে বিলীন হয়ে গেল। পুরো দশ মিনিট সকলের চোখ উপরে। রিপোর্টারের কলমে কালি সরল না, ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলল না। সব হাঁ হয়ে গেছে। মাঠে পিন ড্রপ সাইলেন্স। শুধু খুব দূরে থেকে, বোধ হয় চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার কোলের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেতার তরঙ্গে ভেসে উঠতে লাগল। বিপ্ বিপ্ বিপ্। তোরা আজকালকার ছোকরা কীথ মিলারের মারের বড়াই করিস! আরে আমি ছিলাম মিথ কীলার।

হ্যাঁ, তারপর শুরু হল ক্ল্যাপিং। অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাততালি পড়তে লাগল। তারপরে সমস্যা হল, এইবারে কত রান দেওয়া হবে। এটা কি বাউন্ডারি, না ওভার বাউন্ডারি, না সুপার বাউন্ডারি, না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক, শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস্ পাজ্‌ল্ নাম দিয়ে ওভার বাউন্ডারির পয়েন্টই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেকস্ট্ বলে আরেকটা পাজ্ল্। সেটা আরও মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মারের চোটে বলটা ফট করে নারকোলের মালার মত দু টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। অর্ধেকটা একজন ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ ধরে ফেললে আর বাকি অর্ধেকটা ওভার বাউন্ডারি হল। আবার খেলা বন্ধ করে কনফারেন্স বসল। কী করা হবে এখন। আমি কি আউট হয়েছি, না ছয় মেরেছি ? ফয়সালা আর হয়ই না। খেলতে গিয়ে বার বার এই ডিস্টার্বেন্স। কার ভাল লাগে বল। এদিকে তখন আবার আমার ইভনিং ডিউটি। সময় হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে ব্যাট ফেলে দিয়ে অফিসে চলে এলাম। পরে শুনলাম, জার্ডিন সাহেব নাকি বলে গেছেন, ইন্ডিয়া একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে। ঐ এক খেলাতেই তাঁর চোখ ফুটেছিল, বুঝলি।

অষ্টম গল্প

আমাদের বিশু, প্রেস ফটোগ্রাফার বিশ্বম্ভর তরফদারকে আপনারা চেনেন?

চিনতে পারছেন না। তবে চিনবেন শিগগিরই। কলকাতার প্রেস ফটোগ্রাফারদের মধ্যে বয়সে সব থেকে তরুণ হলেও, ক্রিয়াকর্মে খুবই তুখোড়। যাকে বলে রাইজিং ফটোগ্রাফার। স্পুটনিকও বলতে পারেন। চড়চড় করে উঠছে।

বিশুবাবু ফটো তুলতে ওস্তাদ। তবে কাবু হয়ে পড়েন ক্যাপশন লিখতে। যে আঙুল অ্যাপারচার ঠিক করতে অভ্যস্ত, সেই আঙুলে কলম ধরতে যাওয়া একটা মস্ত ডিপারচার তো। তাই বিশুকে বার বার সুনীল বোস আর সুনীত ঘোষের দ্বারস্থ হতে হয়। এবং এই সুযোগে সুনীল এবং সুনীত প্রাণ খুলে তাকে লেকচার দেয়। প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিবারেই এক। ফটোগ্রাফার যত বড়ই হোক রিপোর্টারদের তুলনায় তারা নিকৃষ্টতর জীব।

কাজটি হাসিল করা দরকার, তাই বিশু তরফদার এতকাল এদের আপ্তবাক্য হাসি-হাসি মুখ করে শুনে গেছে।

সেদিনও বিশু তরফদারকে সুনীত ঘোষের দ্বারস্থ হতে হল। কলকাতার ফ্যাশানেবল্ পাড়ার আস্তাকুঁড়ের ছবি তুলে এনেছে! ক্যাপশনে এখন হিউম্যান টাচটি দিতে হবে। তাই সুনীতের হাতে ছবিখানা তুলে দিল।

সুনীত ঘোষ প্রিণ্টখানি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। তারপর তৈরী হল। ক্যাপশন লিখতে নয়, লেকচার দিতে।

সুনীত বললে, দেখুন বিশুবাবু, আপনারা ফটোগ্রাফাররা বড় পরাধীন। যতই আপনারা ইয়ে করুন না কেন, স্ট্যাটাসের দিক দিয়ে—

বিশু এই প্রথমবার চিরাচরিত প্রথাটি ভাঙল। বললে, দেখুন মশাই, কথায় কথায় স্ট্যাটাস্ দেখাবেন না। আমরা, ফটোগ্রাফারস্ অব্ দি ওয়ার্লড, এখন আর হেজিপেজি লোক নই, খোদ মহারাণীর বড় কুটুম, তা জানেন। রিয়েলি দাদা বড় আফশোস হয় এখন, সাত সকালে যদি বিয়েটা না করতুম তাহলে অ্যাঃ—

· রাণীর বোনাই হতিস্! ইডিয়েট!

চেয়ে দেখি ব্রজদা। বিরক্ত মুখে দরজা ঠেলে ঢুকে যদুদার সামনে গিয়ে বসলেন।

বললেন, তোদের আজকালকার জেনারেশনটা বড্ড হ্যাংলা হয়ে পড়েছে। আমাদের অমলে, সেই নাইনটিন ফোর ফাইভে, আমরা মানুষ হিসেবে অনেক বেশি সরেস ছিলুম, বুঝলি। আর ছিলুম বলেই অ্যাডমিরাল হিগিনবিগিন, ডিউক অফ নোম্যানস্‌ল্যাণ্ডের জামাই হবার প্রস্তাবটা অমন হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলুম। লর্ড হিগিনবিগিন যে-সে লোক নন। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের মেজো ভায়রার ছোট ভগ্নিপতি। তার উপর রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির বড়কর্তা। ব্যাটার পিরেন প্যাণ্টালুনে অব্দি রয়েল ব্লাড অমাবস্যে পূর্ণিমায় জোয়ার ভাঁটা খেলত। তাঁরই ওনলি ডটার, লেডি পমেটম। আর কে জানত, এক বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারই শেষ পর্যন্ত তাঁর—

ব্রজদা হ্যাঁচ্চো হ্যাঁচ্চো করে বার কয়েক হেঁচে উঠলেন। তারপর চুপচাপ সিগারেট টানতে লাগলেন।

সুনীত বলে উঠল, কি হল ব্রজদা?

ব্রজদা নাক মুছতে মুছতে বললেন, সর্দি।

সুনীত বিনয়ে অবনত হয়ে বলতে লাগল, না, মানে ঠিক আপনার কথা, মানে আপনার সর্দির কথা, অবিশ্যি হাঁচিটা সর্দিরই একটা রূপ, কিংবা সর্দিরই ফেউ, কিন্তু আমি, আমরা এখন, এই মুহূর্তে, ঠিক আপনার সর্দির কথা জানতে চাইছি না। জানতে চাইছি সেই বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারটির কি হল?

ব্রজদা এক কথায় সেরে দিলেন, তোমাদের সেই বাঙ্গালী ফটোগ্রাফারটিও এই আমিই।

সুনীতের মুখ এমন হাঁ হয়ে গেল যে তার ভেতর থেকে আর কথা বের হল না।

সুনীল বোস বললে, সুনীতবাবুটা যেন কি রকম। ব্রজদা যে বিলাত থেকে ফটোগ্রাফিতে ডিগ্রি এনেছেন, তা বুঝি জানেন না।

ব্রজদা একগাল অমায়িক হাসি বাজারে ছেড়ে বললেন, তুই বড় তিলকে তাল করিস সুনীল। আমাদের আমলে বিলাত যাওয়া কি অত সোজা ছিল রে। ফটোগ্রাফির বিষয়ে যা কিছু আমার শেখা সবই এই কলকাতায়। দ্যাখ সুনীল, একটা উপদেশ দিই, জীবনে যদি সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা অর্জন করতে চাস তো কক্ষনো গুল মারিসনে। মনে রাখিস, সত্যের চেয়ে অবিশ্বাস্য আর কিছুই নেই।

তবে হ্যাঁ, ব্রজদা বললেন, ফটো তোলা শিখেছি খাস সাহেবের বাচ্চার কাছ থেকেই। সে কি আজকের কথা!

তবে বলি শোন। জনস্টন হপমানের নাম শুনেছিস? চৌরঙ্গীতে ছিল তাঁর জমকালো ফটোর দোকান। সেই দোকানের চিফ ফটোগ্রাফার ছিল আমার

ওস্তাদের ওস্তাদ। আমার ওস্তাদ ছিল কলকাতার সেরা সোসাইটি ফটো-গ্রাফার। মিঃ স্যাম্য়েল সমসের জঙ্গ বাহাদুর। এক ডাকে সবাই চিনত। ওর হাতেই আমার তালিম।

যা ব্বাবা, বিশু বলে উঠল, এই যে বললেন খাস সাহেবের কাছে তালিম নিয়েছেন। নাম শুনে তো খাসা সাহেব বলেই মনে হচ্ছে।

ব্রজদা বিশুর দিকে কটমট করে চাইলে।

বললেন, কানটা পরিষ্কার করাস বিশে, নইলে স্টেটবাসের যে রকম দৌরাত্ম্য। তলায় পড়তে বিলম্ব হবে না। বললুম কি, আর শুনলি কি। সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা নেবে ব্রজ! অমন ঢের সাহেবকে সে বগলের তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে। আমার ওস্তাদ ছিল 'খাস সাহেবের বাচ্চা'। আর এদেশে সাহেবের বাচ্চারা যে কখন কোথা দিয়ে ফুটে বেরোয়, হিসেব রাখা মুস্কিল। তা সাহেবরাও জানে না। আমার ওস্তাদের মা সাহেবের বাড়ির আয়া ছিল। যা বলি শুনে যা।

সে আমলে তোদের এই ব্রজদার কাছে ফটো তোলাতে লাট-বেলাটের বউ মেয়ে এসে ভিড় করত, বুঝলি। ভাইসরয়ের গিন্নী কত সাধাসাধি করেছে বড় লাটের খাস ফটোগ্রাফার হবার জন্য। সে প্রস্তাবও হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছি। তোরা হলে তো ল্যাল ল্যাল করে ছুটতিস। তবে তোদের ব্রজদা তো আর তোরা নয়, সে অন্য মেটেরিয়েলে গড়া। তাই গোলামী না করে স্বাধীন ব্যবসায়ে মন দিয়েছিলুম। দুদিনেই পসার জমে উঠেছিল।

কি বলব ভাই, দোকান খুলতুম সকাল দশটায় আর বন্ধ করতুম রাত আটটায়। আর এর মধ্যে তিলার্ধও বিশ্রামের ফুরসৎ পেতুম না। দিশি বিলিতি অপ্সরা কিন্নরীর দল সব সময় আমাকে ঘিরে থাকত। তখন আমার ইয়ং বয়েস। পাট্টাই জোয়ান। একটু এদিক ওদিক হলেই যে কি হত বলা যায় না। একে কাঁচা বয়েস, তার উপর তোদের ব্রজদার রূপ তখন চেকনাই ছাড়ছে। কত খুব-সুরৎ লেডির যে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি, তার হিসেব নেই। লেডি পমেটম কি বলেছিল জানিস?

আমাদের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব ছিল না। তাই চুপ করে রইলাম।

ব্রজদা নিজেই জানালেন। বললেন, লেডি পমেটম একদিন আবছা অন্ধকারে আমার দুটো হাত চেপে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বলেছিল, ব্রজদা, ব্রজ, মাইডিয়ার ব্র, তুমি হিরো। তোমাকে দেখলেই আমার সেকস্‌পীয়রের হিরোর কথা মনে পড়ে। ঠিক যেন মূর্তিমান ওথেলোটি।

যা চান্স পেয়েছিলাম না, ব্রজদা টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলেন, আমি বলে তাই সামলে নিয়েছি। এই বিশু-টিশুর মত চ্যাংড়া হলে সে অবস্থায়— যাক সে কথা আর বলতে চাইনে।

বিশুর দিকে চেয়ে ব্রজদা বললেন, প্রিন্সেস মার্গারেটকে বিয়ে করছে লন্ডনের এক সোসাইটি ফটোগ্রাফার আর কলকাতায় আমাদের বিশুবাবু বোমেরা ঘাড়ে করে ছাগলের সেজ ছেলের মত লাফাতে লেগেছেন। ইংরেজ মিলে—

আমি বাধা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, ছাগলের সেজ ছেলে তো বুঝলাম না!

তা বুঝবে কেন? ব্রজদা বিরক্ত হলেন। ওটা যে দিশি জিনিস। যদি ছাগল না বলে ক্যাঙারু কি পেরুর কথা বলতুম তো পরিষ্কার বুঝে যেতে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দেশের কী সর্বনাশটাই না করেছে! বলি ছাগল চেনো?

ভয়ে ভয়ে বললাম; তা বোধহয় চিনি।

বাস, তবে আর কি। মধ্যে মধ্যে ছাগলের যে এক্সট্রা বাচ্চা হয় জানো? দুটোর জায়গায় তিনটে? এদিকে মায়ের তো দুটি বাঁট। বড় আর মেজ যখন সে দুটো দখল করে ঢুঁ মেরে মেরে দুধ খায় তখন এই সেজ বৎসটি কি করে? অন্য দুটোর খাওয়া দেখে আর তিড়িং তিড়িং লাফায়। এই আমাদের বিশুবাবু যেমন রাণীর বোনাই হবার আনন্দে লাফাচ্ছেন।

আরে এ-ও ইংরেজ ও-ও ইংরেজ। ওদের মধ্যে বিয়ে হচ্চে, তা নিয়ে এত নাচানাচি করার কি আছে। বরং আমার ব্যাপারটা নিয়ে যে হৈ চৈ হয়েছিল তার তবু একটা মানে ছিল। কারণ রয়েল ফ্যামিলির মেয়ের সংগে ফটো-গ্রাফারের বিয়ে সেই প্রথম, ইংলণ্ড এবং ভারত, দুটোর ইতিহাসেই সেই প্রথম, পাকিয়ে ওঠে। এই মার্গারেট ফার্গারেট এখন যা করছে, এতে তো আর নতুনত্ব কিছু নেই। আমার স্টোরিটাই টুকে মারছে। লেডি পমেটমের রক্তও ছিল খাঁটি ইম্পিরিয়াল কোয়ালিটির, মেড-ইন-ইংলণ্ড। আর এই ব্রজরাজ কারফর্মার দেহে ছিল গ্যারাণ্টি দেওয়া স্বদেশী ব্লাড। এই দুই রক্তে যখন তুফান উঠল, মানে প্রেমের তুফান, তখন তো প্রায় রক্তারক্তি হবার যোগাড়।

তাহলে ব্যাপারটা বলি শোন।

আমার পসার তখন তুঙ্গে। দিনরাত অপরূপ সব সুন্দরী এসে স্টুডিওতে সিটিং দিচ্ছে। কল দিচ্ছে বাড়িতে। নিয়ে যাচ্ছে পার্টিতে, বোটানিক্সে, ডায়মণ্ড হারবারে, দার্জিলিঙে, সিমলেয়।

ব্রজদা ব্রজদা করে কলকাতার তাবৎ সুন্দর মুখ পাগল হয়ে উঠেছে। মানে ফটো তোলার জন্যে। স্টুডিওর ওয়েটিং রুমে সর্বদা বিউটি কুইনদের গাঁদি লেগে থাকত। দিনরাত নাড়াচাড়া করে সুন্দরী মেয়ের উপর অরুচি ধরে গেল। এক জিনিস আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়, বল। শেষে বিরক্তিও

ধরে গেল। স্বপ্নে পর্যন্ত সুন্দরী মেয়ের চেহারা দেখলে চোঁয়া ঢেঁকুর উঠতে লাগল।

দ্যাখ বিশু, ব্রজদা সস্নেহে বললেন, কুলিগিরি করে খাস সেও ভাল, কিন্তু খবরদার, সোসাইটি ফটোগ্রাফার হ'সনে। অম্লশূলে মরবি। অত রোজগার করা সত্ত্বেও সাধে কি আর ও প্রফেশন ছেড়েছি। আজ যদি তোদের ব্রজদার স্টুডিও থাকত, তাহলে আর কোন মিঞাকে এই কলকাতায় সাটার টিপে করে খেতে হত না। তা বাবা এখন খাসা আছি, রাতদিন যে মেয়েদের মুখে চোখ রাখতে হচ্ছে না, এই বাঁচোয়া।

হ্যাঁ রে, সুনীল, তুই কি কখনও বাড়ি বাড়ি দুধের যোগান দিতিস?

আচমকা প্রশ্নে সুনীল থতমত খেয়ে গেল।

বলল, আমি? দুধের যোগান? কই না তো। আমি দুধ বেচতে যাব কেন? কি যে বলেন। যাঃ।

তবে নিশ্চয়ই তুই সোসাইটি ফটোগ্রাফার ছিলি।

না না, কক্ষনো না। সুনীল তীব্র প্রতিবাদ করে।

ব্রজদা দৃঢ়স্বরে বললেন, নিশ্চয়ই ছিলি। এ জন্মে না হলেও আর জন্মে ছিলি। নইলে বিয়ে-থা করছিসনে কেন? মেয়েদের সম্পর্কে এত বিতৃষ্ণা তোর হল কি করে? মেয়েদের সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এক হয় গয়লাদের। দুধের রোজ দিতে গিয়ে রোজই সাত-সকালে মেয়েদের ঘুম-ভাঙা পেটেন্ট লেদারি মুখ দেখতে হয় বলে; আর হয় ফ্যাশানেবল্ ফটোগ্রাফার কিংবা ইদানীংকার সিনেমা পত্রিকার "ফটো শ্রীঅমুকদের"। দিন রাত তারকাদের পিছনে ঘুরতে হয় বলে। কারণ যেই অমুক তারকা "বিশ্রামের অবসরে প্রিয় বাঁদরকে কলা খাওয়াইতেছেন, পাশে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি", কিংবা অমুক শ্রীমতীর মুখে "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে", কিংবা কোন বিলাসিনী নাইলন শাড়ীতে শরীরকে সরব করে "গৃহ-বধূর কর্তব্য করিতে রান্নাঘরে পুংইশক রন্ধনে ব্যস্ত" থাকেন, অমনি সেই মুহূর্তটিকে "ক্যামেরায়িত" করতে হ'মেশা সাটার টিপতে হতো। কাজেই তাদের চোখে অনবরত তারা-ফুল ফোটে। পরম রমণীয়রাও চরম হয়ে ওঠে।

আমার পসারটি জাঁকিয়ে ওঠার এক বছরের মধ্যেই আমার অবস্থাটিও এমন চরম হয়ে উঠেছিল।

ব্রজদার স্বর ক্রমেই সিরিয়াস হয়ে উঠল।

বললেন, এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলাম। এমনি সময় একদিন বাইরে "আউট" লাগিয়ে ভিতরে চুপচাপ বসে আছি। দার্জিলিং থেকে কল এসেছে। স্বয়ং ভাইসরয়-গিন্নীর অনুরোধ। গেলে অনেক টাকার কাজ হবে। অথচ কোন উৎসাহ পাচ্ছিনে। ভাইস্রয় এখন দার্জিলিংয়ে।

তার মানে গোটা সোসাইটিই ওখানে। বসে বসে ভাবছি, কি করা যায়। এমন সময় হুড়মুড় করে লর্ড হিগিনবিগিন স্টুডিওতে ঢুকে পড়লেন। সারা গায়ে রয়েল নেভির মেডেল আর ডেকোরেশন।

হিগিনবিগিনের সঙ্গে মৌখিক আলাপ আমার হয়নি। বড় লাটের পার্টিতে বার কয়েক ওকে দেখেছি। রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভির অ্যাড্মিরাল হয়ে বছর খানেক হল ইণ্ডিয়াতে এসেছেন। ভাইসরয়-গিন্নীই আমাকে বলেছিলেন, লর্ড সাহেব মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের পরমাত্মীয়। ডিউক অব নোম্যান্সল্যাণ্ড। আরও কত কি? আলাপও করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাট্ আই রিফিউজড্।

দুদিন ধরে হিগিনবিগিনের সেক্রেটারী আমার কাছে আসছে ওর একটা বার্থ ডে পোর্ট্রেট তোলাবার জন্য। কিন্তু আমার এনগেজমেণ্ট ডায়েরি এক মাসের মত ভর্তি। তাই সময় দিতে পারিনি।

হিগিনবিগিন হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

তারপর অভদ্র ভাষায় বললেন, তুমিই কারফর্মা? তোমাকে আমার সেক্রেটারী দুদিন ডাকতে এসেছিল, যাওনি যে বড়!

ব্যাটার এই চোয়াড়ে ব্যাভার দেখে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। তবু অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে বললাম, আমার খুশি। তা ছাড়া, শুনলাম তোমার পোর্ট্রেট তুলতে হবে, তাই শুনে আমার ক্যামেরা ভড়কে গেল।

হিগিনবিগিন আমার কথা শুনে ব্যোম্কে গেলেন।

তার মানে?

বললাম, লর্ড সাহেব, মানে নিতান্তই সরল। এই পোর্ট্রেটগুলো দেখছ তো। বলেই একেলে উর্বশী মেনকা রম্ভা ভেনাসদের মুখচ্ছবিগুলো দেখিয়ে দিলুম। বললুম, ভাল করে আগে এগুলো দেখ।

দেখলুম, হিগিনবিগিন বেশ করে ফটোগুলো দেখছেন। দেখা হল।

বললেন, হ্যাঁ, দেখলুম। তারপর?

বললাম, নাউ লুক অ্যাট্ দ্যাট্ মিরর্।

ব্যাটা তাও দেখলে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে। ঘোড়ার মত মুখ, উটের মত নাক, ভোঁদড়ের মত চোখ, কান দুটো যেন বাতাবি লেবুর পাতা। আর খ্যাংরা কাঠির মত গোঁফ। থুতনির নিচ থেকে যেন বিচে কলার মোচা বেরিয়েছে। এই তো ছিরৎ। তার আবার পোর্ট্রেট! কিন্তু কি জাঁহাবাজ সাহেব! যেন কিছুই বোঝেনি।

বললেন, দেখলাম। তারপর?

এর পরেও আবার "তারপর" বলে! বুঝে দেখ। কিন্তু আমিও তো তোদেরই ব্রজদা।

বললাম, দ্যাখো লর্ড সাহেব, যে ক্যামেরা এইসব ফ্যান্সি মুখের ছবি তুলতে অভ্যস্ত তা যে তোমার ঐ জু গার্ডেনের ছবি তুলতে ভড়কে যাবে, এতে আর আশ্চর্য কি? আমার আবার খুব দামী জার্মান ক্যামেরা তো, লেন্সটা অতি মাত্রায় সেন্‌সিটিভ।

ব্যস্‌, তারপরেই ঘরে যেন অ্যাটম্‌ বোমা ফাটল। বাজখাই গলায় চোস্ত ইম্পিরিয়াল লব্‌জে রয়েল গালাগাল দিতে দিতে ফস্‌ করে দুটো রিভলবার বের করে একটা পেটে আর একটা বুকে চেপে ধরলে। বললে, উড়িয়েই দেব শালাকে। ভাবলাম, হয়ে গেল। আমি মন স্থির করে কায়মনোবাক্যে বন্দেমাতরম্‌ জপ করতে লাগলাম। কারণ, আমাদের সেকালের পেট্রিয়টদের তাই ছিল দস্তুর। বিপদে পড়লেই বন্দেমাতরম্‌। যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্‌ বলে। কত ছেলে এই মন্ত্র জপে হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চড়েছে সে আমলে। বেঁচে থাকলে অবিশ্যি পি ডি অ্যাক্টের আসামী হয়ে ফাটক খাটতে হত। শহীদ হয়ে হিস্ট্রিতে এখন অমর হয়ে গেছে। লেখাপড়া ছেড়ে কত ছেলে বন্দেমাতরম্‌ বলতে বলতে তখন জেলে গিয়ে ঢুকেছে। এমনিতে হয়ত গোমুখ্যু হয়েই থাকত. কিন্তু স্রেফ এই মন্ত্রের জোরেই তাদের অনেকে দেশ স্বাধীন হবার পর এডুকেশন মিনিস্টার অব্দি হয়ে গেছে। বন্দেমাতরমের কি সোজা এফেক্ট রে!

ব্রজদা এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালেন। গোটা কয়েক সুখটান দিয়ে শেষে একটু দম নিলেন।

তারপর বললেন, পেটে বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে দুশমনটা ফোঁস ফোঁস করে গজরাচ্ছে আর আমি চোখ বুঁজে পরিত্রাহি বন্দেমাতরম্‌ জপে চলেছি। বললে বিশ্বাস করবিনে, একেবারে হাতে হাতে ফল। যেমন ভাবে ফস্‌ করে রিভলবার দুটো বের করেছিলেন আবার তেমনি ফস্‌ করে সে দুটো পকেটে পুরে ফেললেন।

দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, না, মারলে হবে না। ওকে মেরে ফেললে আর ফটো তুলবে কে? ওকে দিয়ে আমার গুষ্ঠির ফটো তুলিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। আমার দিকে চাইলেন না পর্যন্ত। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম, করবি আমার কচু। আমিও সেই রাত্রেই দার্জিলিং রওনা দিলাম।

আর শিলিগুড়ি স্টেশনে নামতেই দেখা হয়ে গেল অপূর্ব এক লাবণ্যের সঙ্গে। একেবারে চোখাচোখি। মেয়ে নয় ভাই, সে মেয়ে নয়। মেয়ে আমি কম দেখিনি। মেয়ে দেখলে আমার কোন রি-অ্যাকশন হয় না। সুন্দরী বললে তাঁকে কিছুই বোঝান যায় না। কারণ সুন্দর মুখ দেখলেই আমার চোয়া ঢেঁকুর

ওঠে। কিন্তু এ-যে প্যাস্তুরাইজড্ মাখন। গ্যাস্ট্রিকের রুগীর পথ্যি!

ব্রজদা দম নেবার জন্য একটু থামলেন। বললেন, মেয়েদের তাবৎ ভালোর সবটুকু তুলে নিয়ে তা থেকেই এই মাখনটুকু যেন তোলা হয়েছে। তাই এর মধ্যে কমনীয়ত্ব, নমনীয়ত্ব, রমণীয়ত্ব পুরোমাত্রায় আছে অথচ অনিয়নত্ব ছিটে-ফোঁটাও নেই।

সুনীত ঘোষ বললে, অনিয়নত্ব কি ব্রজদা?

ব্রজদা বললেন, তুই না খুব ইংরিজিনবিশ। অনিয়ন চেনো না? পেঁয়াজ? তার থেকেই অনিয়নত্ব, অর্থাৎ পেঁয়াজি। হ্যাঁ, যা বলছিলুম। স্পেশাল কোচ্ থেকে সে নামছিল। সেই মুহূর্তে চোখাচোখি হল। তারপরই কি বলব ভাই, আমার শরীরে পুলকের বান ডাকল। মুহূর্তে মলয় পবন ফুর ফুর ক'রে পাক মেরে গেল। পরক্ষণেই বুঝি এ ভরা বাদর মাহ ভাদর এসে পড়ল। হিরো হিরোইন লভে পড়লে তোদের এখনকার হিন্দী সিনেমায় যেমন নানা দৃশ্য ফুটে ওঠে, জানলার ধারে চাঁদ লটকে যায়, লেকের জলে ফুড়ুং ফুড়ুং পদ্ম ফোটে, কোকিল ভ্রমর কুহু কেকা মত্ত দাদুরি, বালসারার ইউনিভক্স ইস্তক লতা মঙ্গেশকর যেমন প্লে-ব্যাকে গান জুড়ে দ্যায় ঐ কছমের একটা হ্যাণ্ডা ব্যাণ্ডা হয়ে আমার মনটারও সারা গায়ে অপুর সংসারের দিওয়ানা অপুর মত দাড়ি গজিয়ে গেল।

মনটা ফিক ফিক করে এই হাসে আবার হুস্ হুস্ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বুঝলুম লভ্ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট হলে যা হয় তাই হয়েছে। যাকে বলে পিপুল ফার্স্ট-সাইটিস্। বড় শক্ত ব্যামো। যখন হুঁশ হল দেখি কেউ কোথাও নেই। প্ল্যাটফরম ফাঁকা। দার্জিলিঙের ছোট রেল ততক্ষণে মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে গেছে।

আর ফার্স্ট সাইটের ধকল সামলাতে না পেরে আমি একা শূন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি।

হঠাৎ 'সাব' শুনে চমকে চেয়ে দেখি সামনেই এক উর্দী পরা পাহাড়ি আর্দালী সেলাম জানাচ্ছে।

বললে, কারফর্মা সাব?

বললুম, ইয়েস, কারফর্মা স্পিকিং?

আমার ইংরেজি শুনে ব্যাটা আরও দুটো স্যালুট দিলে। আমি সাহেবদের সামনে পারতপক্ষে ইংরেজি বলিনে। পিওর মাদার টাং-ই চালাই। তোমার অসুবিধে হয়, ইণ্টারপ্রেটার রাখ। তবে ট্রেন জার্নি কি টুরে বেরুলে এ-দিশি ড্রাইভার, টাঙ্গাওয়ালা কুলি ইস্তক বাঙালী চেকারের সঙ্গে সমানে ইংরাজি চালাই। ওতে সার্ভিসটা ভাল পাওয়া যায়। হাজার হোক ইংরেজ আমলে ওটা রাজভাষা ছিল তো। দিশি লোকের কাছে ওর কদরই আলাদা। কালে

কালে দেখবি হিন্দিরও কদর হবে। ওটা আবার রাজেন্দ্রভাষা কিনা!

যাই হোক, অনেক খাতির-টাতির জানিয়ে আর্দালী বললে, ওর হুজুর আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি যেন এখন সেই গাড়িতে উঠে ওকে কৃতার্থ করি। বুঝলুম, এ ছোট লাটের কীর্তি। বড়লাটের গিন্নীর আমন্ত্রণে এসেছি তো। সেটা কি করে টের পেয়েছে। এখন আমাকে একটু খাতির করতে চায়।

বললাম, ইয়েস গো।

কিন্তু তখন কি জানি, বাঘের মুখে গলা দিয়েছি। জানলাম শিলিগুড়ি ছাড়ালে, আমাকে জাপটে ধরে যখন নাকে ক্লোরোফর্মের রুমাল বেঁধে দিলে। কোন কিছু বোঝবার আগেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আর জ্ঞান-অজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থায় দেখলাম সেই মন-ভোলান মুখখানি আমার হৃদয়ের ডাল লেকে গণ্ডোলায় চড়ে ভাসছে। তারপরই অন্ধকার।

ক্রমে জ্ঞান হল। কিন্তু তখনও অন্ধকার। মাথা ভার ভার। হাত পা বাঁধা। বুঝলাম একটা খাটে শুয়ে আছি। কিন্তু কোথায়?

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানিনে। হঠাৎ ক্যাঁচ কোঁচ করে দরজা খোলার শব্দ হল। হেড়ে গলায় কে যেন ইংরাজিতে বলল, তুই আগে ঢোক (আরে আওয়াজটা চেনা চেনা লাগছে যে), ঐ ছুঁচোটার মুখের সামনে ডিনার টেবিল সাজিয়ে দিবি। আচ্ছা, দাঁড়া, আমিই আলোটা নিয়ে আগে ঢুকি।

পরক্ষণেই মোমবাতি জেবলে যিনি ঢুকলেন তাকে দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম। লর্ড হিগিনবিগিন। এগিয়ে এলেন।

কি হে ছোকরা, এবার যাবে কোথায়?

বললাম, কি ইয়ার্কি করছেন স্যার, খুলে দিন।

হিগিনবিগিন বললেন, খুলব তো বটেই, কিন্তু আমার পোর্ট্রেটটি তোলার পর। তোর ওখানে আমাকে যে বড় ইনসাল্ট করিছিলি রাসকেল। এবার?

এবার আমি চটে গেলুম।

বললাম, এইভাবে আমাকে দিয়ে ফটো তোলাবে! কভি নেহি। জান যায়, সো ভি আচ্ছা। আমি ভাইসরয়ের গেষ্ট, মনে থাকে যেন। তাছাড়া আমার হেভি ইনসিওর করা আছে। বঙ্গমাতা আমার নমিনি। আমি মলে টাকাটা স্বদেশীওয়ালারা পাবে, সেটা জান? একথা কেন বললুম, সে গল্প আরেকদিন বলব।

আমার তেজ দেখেই হোক, কি ঐ লাস্ট কথাটা শুনেই হোক, হিগিনবিগিন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

বললেন, দ্যাখো ইয়ংম্যান, আই এপ্রিসিয়েট ইওর স্পিরিট। এস একটা রফা করা যাক। আমার ছবি না হয় নাই তুললে, আমার মেয়ের একটা পোর্ট্রেট তুলে,

দাও। তাতে তো তোমার আপত্তি নেই। তাহলেই তুমি খালাস।

আমার পিত্তি জ্বলে গেল ওর এটিচিউড দেখে। ফস করে বলে ফেললুম, তোমারই তো মেয়ে, তার সামনেও আমার ক্যামেরা ভড়কে যাবে।

কি বললি, আমার মেয়েকে এত বড় ইন্‌সাল্‌ট। তোকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।

বললুম, যাই কর আর তাই কর, তোমার গুষ্ঠির কারো ফটোই এ শর্মা তুলছে না। এই আমার শেষ কথা।

ততক্ষণে বাবুর্চি এসে আমার নাকের ডগায় ডিনার সাজিয়ে ফেলেছে। খুব খোস্‌বু ছাড়ছে। আহা হা চিকেন রোস্ট! আমার পেটের মধ্যে ক্ষিধেটা গুল গুল করে বেশ জাঁকিয়ে উঠল।

হিগিনবিগিন এতক্ষণ গুম মেরে বসে ছিল। আমার ক্ষিধের প্রচণ্ডতা বোধহয় ও টের পেয়েছিল। হঠাৎ বাবুর্চিকে বললে, এই এসব নিয়ে যা। স্রেফ দু টুকরো শুকনো রুটি আর এক গ্লাস জল রেখে যা। হিংসার পথে কিছু হবে না। ওকে অহিংসা দিয়ে কাবু করতে হবে।

এ একেবারে মোক্ষম প্যাঁচ। সকালে ব্রেক ফাস্ট আসে, দুপুরে লাঞ্চ, রাত্রে ডিনার। নানা রকম পদ। আমার সামনে সব থরে থরে সাজিয়ে রাখে। গন্ধে ঘর ভরে যায়। পেটে খামচাখামচি শুরু হয়। জিভে জল আসে। তারপর আবার একে একে সব নিয়ে যায়। রেখে যায় দু টুকরো শুকনো রুটি আর জল। ওঃ সে যা যন্ত্রণা, কি বলব? তবু নতি স্বীকার করিনি।

তবে একটা বড় পরিবর্তন আমার ঘটে গেল। প্রথম দিকে সেই ট্রেনে দেখা সেই মুখখানা কল্পনায় হৃদয়-রাস-মন্দিরে আবাহন করে এনে কারাক্লেশ ভুলতে চেষ্টা করতুম। ক্রমে কল্পনায় সেই মুখের বদলে চিকেন রোস্ট ভেসে উঠতে লাগল। গোড়ার দিকে আমার কল্পনার থ্রি-ফোর্থে সেই মুখ আর বাকী ওয়ান-ফোর্থে চিকেন রোস্ট দেখতুম, তারপর হাফ অ্যাণ্ড হাফ এবং ক্রমশ চিকেন রোস্টের স্বপ্নই ষোল আনা হয়ে দেখা দিতে লাগল। একী জ্বালা! অস্থির হয়ে শেষ পর্যন্ত মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছি ভেবে অন্যমনস্কভাবে হাতের দড়ি চিবোতে লাগলুম। এমনি করে চিবিয়ে চিবিয়ে একদিন হাতের বাঁধনই কেটে ফেললুম। চিকেন রোস্টকে আন্তরিকভাবে থ্যাংকস্‌ দিয়ে পায়ের বাঁধনও খুলে ফেললুম। ব্যাস্‌ মুক্তি, এইবার মুক্তি। বন্দেমাতরম্‌।

জানি, একটু পরেই হিগিনবিগিন আসবে। রোজকার মত জিজ্ঞাসা করে যাবে আমার মতের পরিবর্তন হয়েছে কিনা। আচ্ছা, আজ এসো। ব্রজরাজের শক্তির একটু নমুনা পেয়ে যাও।

দরজার তালা খোলার শব্দ হল। এসো বাছাধন! নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। আবছা মূর্তি ঘরে ঢুকল। আজ আলো আনেনি। নতুন



আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও এইসব বলে যাচ্ছে আর...

কোন মতলব ভেজেছে নাকি? আমার কাছে এগিয়ে এল। অন্ধকারের মধ্যেও একটা ছুরির ফলা চিকচিক করে উঠল। ছোরা মারবে না কি? এই মতলব!

জুজুৎসুর জুৎসই এক প্যাঁচে মুহূর্তের মধ্যেই আততায়ী ধরাশায়ী হল। ছোরাটা ঠন্ করে ছিটকে পড়ল। বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে তাকে জাপটে ধরলাম।

তারপর দাঁত কিড়মিড় করে বললুম, ওরে হিগিনবিগিন, সন অব এ লর্ড—

আমার কথায় বাধা দিয়ে আততায়ী ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেয়েলি গলায় বললে, আই অ্যাম্ নট্ দি সন বাট্ দি ডটার অব এ লর্ড। বলেই ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল।

আমি তো চমকে উঠলুম। এ তো হিগিনবিগিন নয়। আর হুঁশ ফিরতে এই প্রথম টের পেলুম এনিমির গাটা তো বেশ নরম নরম। তাড়াতাড়ি তাকে ছেড়ে দিতেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

বললে, আমার পা ভেঙে গেছে বোধ হয়, আই কাণ্ট স্ট্যান্ড।

বড্ড লজ্জা পেলুম। শেষ পর্যন্ত নারীহত্যার দায়ে পড়তে যাচ্ছিলাম যে। ছি ছি। বললুম, সরি ম্যাডাম, আমি বুঝতে পারিনি। তুমি কে? এ সময়ে এখানে কেন?

শুনতে পেলুম অপূর্ব কণ্ঠস্বর। ছোটে খাঁর সারেঙ্গিতে যেন মুন লাইট্ সোনাটার লহরা বাজছে।

বললে, সবাই আমাকে লেডি পমেটম বলে ডাকে। আমার বাবা হিগিনবিগিন। বাট আই অ্যাম ইওর ডার্লিং। তুমি তাই বল। সেদিন শিলিগুড়ি স্টেশনে তোমাকে দেখে ইস্তক আমার ফার্স্ট সাইটিস্ হয়ে গেছে। ইনকিওরেবল্। অল্ মাই ফ্রেন্ডস্ আর ইওর ক্লায়েন্টস্। তুমি খুব ভাল ফটো তোল তাই জানতুম। কিন্তু তুমি যে তার চেয়েও ভালো, তা শিলিগুড়িতে টের পেলুম। ইউ আর এ রিয়েল হিরো ব্রজদা, এ সেক্সপীরিয়ান হিরো। ব্রজদা, ব্রজ, মাই ডিয়ার ব্র, তুমি আমার ওথেলো।

বুঝে দ্যাখ, কি সংকটময় অবস্থা। সেই অন্ধকারে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ও এই সব বলে যাচ্ছে আর ফাঁকে ফাঁকে আমার গালে মুখে--ঐ তোরা যা ইংরেজি সিনেমায় নিত্যি দেখিস আর কি—সে সবও চলছে। কিন্তু আমি অচল অটল।

বললে, ওর বাপ নাকি অধৈর্য হয়ে আজ আমাকে গুম করার প্ল্যান করেছে। অতি কষ্টে চাবিটা হাতিয়ে আমার পালাবার সুযোগটা তাই করে দিতে এসেছে। একথা শুনে আমি যেই ধন্যবাদ দিতে গেছি এমন সময় লর্ড হিগিনবিগিন এক হাতে মোমবাতি আরেক হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে পারফেক্ট একটি ভিলেনের মত প্রবেশ করলেন। সেই আলোয় লেডি পমেটমের

দিকে চেয়ে দেখি, আরে এ যে সেই মুখ সেই চক্ষু দুটি। দেখা মাত্র আমার সমগ্র মুখ-ভাব, আমার চাউনি, বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় নায়কের বক্স-অফিস হিট্ করা হাবভাবের সঙ্গে টু দি পয়েন্ট মিলে গেল। কোথায় ভেসে গেল হিগিনবিগিনের হিংস্র উপস্থিতি, কোথায় বা ভেসে গেল তার খোলা তলোয়ারের শাণিত ভ্রূকুটি। একের চোখের উপর অন্যের আঁখিতারা স্থির হয়ে আছে। সব ভুলে আমরা শুধু পরস্পরের দিকে চেয়ে আছি। বাপ চেয়ে আছে মেয়ের দিকে, মেয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে, আর আমি চেয়ে আছি ওর বাপের দিকে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। এবারে শুরু হল সংলাপ।

বললুম, তুমি!

বললে, হ্যাঁ।

বললুম, তুমি, সত্যিই তুমি! সেই তুমি!!

বললে, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই আমি।

হিগিনবিগিন : এ সবের অর্থ?

লেডি পমেটম : ফাদার, দি প্রিজনার ইজ দি মাস্টার অব মাই লাইফ।

হিগিনবিগিন : (সগর্জনে) তার মানে?

আমি : লর্ড সাহেব, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় আছে কি?

হিগিনবিগিন : হু ইজ বঙ্কিমচন্দ্র?

আমি : জীবিতকালে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইদানীং ঋষি হয়েছেন। ফার্স্ট গ্রাজুয়েট অব্ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি। ফাদার অফ বেঙ্গলি নভেল। গ্র্যান্ড ফাদার অফ বেঙ্গলি রম্য রচনা। অ্যান্ড ক্রিয়েটার অব্ ইন্ডিয়াজ্ অ্যাডিশন্যাল ন্যাশন্যাল সঙ্ বন্দেমাতরম্।

হিগিনবিগিন : হ্যাঙ ইওর বঙ্কিমচন্দ্র।

আমি : সেটা এখন একটু শক্ত সাহেব, তিনি অনেককাল গত হয়েছেন কিনা। বঙ্কিমচন্দ্রের নভেল পড়া থাকলে তোমার মেয়ের কথার মানেটা বুঝতে। এই ডায়ালগটা দুর্গেশনন্দিনীতে আছে। সাহেব, সোমত্থ মেয়ে তোমার ঘরে, আর তুমি আমার মত একটা মদ্দ জোয়ানকে বন্দী করে রেখেছ! নাও এখন ঠ্যালা সামলাও। তবে তোমার মেয়ের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলুম তা আমি উইথ্ড্র করছি। সি ইজ দি কুইন অফ অল কুইনস্। এর পোর্ট্রেট তোলার সুযোগ পাওয়া তো ফটোগ্রাফারের মহা ভাগ্য।

হিগিনবিগিন একথা শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বার বার বললেন, হাউ নাইস অব্ ইউ। আমাকে বেঁধে রাখবার জন্য, না খেতে দেবার জন্য, গুম করার প্রস্তাবের জন্য আলাদা করে ক্ষমা চাইলেন।

হিগিনবিগিন বললেন, মিঃ কারফর্মা, তোমার যা ক্ষতি করেছি আমি তা পূরণ করতে চাই। বল, কি তুমি চাও।

তোরা আজকালকার ছোকরারা এমন একটা সুযোগ পেলে ফস করে হয়ত একটা চাকরিই চেয়ে বসতিস। কিন্তু বুকের ছাতি টান টান করে আমি বললুম, স্বরাজ চাই। স্বরাজ চাই। স্বরাজ ইজ মাই বার্থ রাইট্। দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আমার আর কোন কাম্য নেই।

হিগিনবিগিন : সিডিশাস্ কথা বলো না। আর তাছাড়া স্বরাজ দেব, সে ক্ষমতাও আমার নেই।

লেডি পমেটম : তবে বাবা, অনুমতি দাও, আমি ওকে বিয়ে করি। হি ইজ মাই লাভ।

হিগিনবিগিন সে কথা শুনে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, ও লাকি ডগ, লাকি ডগ।

ব্রজদা আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলেন।

সুনীল বললে, তা আমাদের সেই বৌদির সঙ্গে পরে বুঝি ডাইভোর্স হয়েছে ব্রজদা।

ব্রজদা একটু হেসে বললেন, না, রয়েল ফ্যামিলিতে ডাইভোর্স হয় না। ও বিষয়ে ওদের নিয়ম বড় কড়া। আসলে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা আর হল না। ঠিক সেই সময় বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেল কিনা। মুভমেণ্টে নেমে পড়লুম। অ্যারেস্ট হলুম। আর জানিস তো পুলিশ রিপোর্ট থাকলে, বৃটিশ জাত সামান্য একটা বেয়ারার চাকরিই দেয় না, আর এ তো একেবারে জামাই করা। হ্যাঃ।

নবম গল্প

তা বিশ্বাস করবি কেন? ওরা চীনে কি না।

ব্রজদা একেবারে খেঁকিয়ে উঠলেন।

বললেন, হিলারি এভারেস্টে উঠল, সেটা বিশ্বাস করতে তো তোদের বাধেনি। কেন না হিলারি যে সাহেব! বৃটিশ!

না না, নিউজিল্যান্ডার। সুনীত মুখ ফস্কে কথাটা বলে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটল।

ব্রজদা বললেন, ঐ একই কথা, যার নাম চালভাজা, তারই নাম মুড়ি। দ্যাখ নিতে! আমাকে জিওগ্রাফি শেখাসনি। রয়েল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই হাত দিয়ে। স্যর জর্জ এভারেস্ট রিটায়ার করলে রাধানাথদাকে সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট করবার প্রস্তাবও এই শর্মাই করেছিল। কিন্তু আমাদের জাতের শ্লেভ্ মেণ্টালিটি তো আর আজকের আমদানি নয়। খেতাবধারী গোটাকতক অকালকুষ্মাণ্ড খয়ের খাঁ বিপক্ষে ভোট দিয়ে ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিলে। নইলে দেখতিস্ বৃটিশের বিরুদ্ধে সেটাই হত ফার্স্ট ন্যাশন্যাল আপরাইজিং।

সুনীত ঘোষ টোকা মারা কেন্নোর মত গুটিয়ে ফেলল নিজেকে।

সুনীল বোস জিজ্ঞেস করল, ঘটনাটা কবেকার?

ব্রজদা একটু ভেবে নিলেন। বললেন, তা এইট্টিন ফিফ্টি ওয়ান, না ফিফ্টি ওয়ান নয়, ভুল বলছি, ফিফ্টি টু-এর। ইয়েস, এইট্টিন ফিফ্টি টু। সালটা ভারতের ইতিহাসে সর্বদা স্মরণীয়। কারণ ঐ বছরই গুড্ ফ্রাইডের আগের দিন এক বাঙ্গালী অঙ্ক কষে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কার করেন। আর ২৫শে ডিসেম্বর, খৃস্টমাসের দিন আরেক বাঙ্গালী সেই শৃঙ্গ সর্বপ্রথম ডিঙিয়ে চলে যায়।

সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলাম, কি করে?

ব্রজদা বললেন, কেন, হাই জাম্প দিয়ে।

আমি অবাক। যদুদা হতভম্ব। সুনীত নিরুত্তর। সুনীল গলগল করে ঘামতে লাগল।

ভ্রূক্ষেপ না করে ব্রজদা বলে চললেন, আবিষ্কারক বাঙ্গালীর নাম যে রাধানাথ শিকদার, আশা করি তা আর বলে দিতে হবে না। দ্বিতীয় জনের

নামই তোমরা জান না। এখন জেনে রাখ, তার নাম ব্রজরাজ কারফর্মা। চীনেরা এভারেস্টে উঠেছে এই খবরটাই তোমরা প্রাণ ধরে বিশ্বাস করতে পারছ না, আমার হিস্ট্রি শুনলে তো তোমরা হিস্টিরিয়া হয়ে মরবে। বাঙ্গালী যদি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে পারত, তাহলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম আজ আর মাউন্ট এভারেস্ট হত না, হয় রাধাচূড়া হত, না হয় হত রাজশৃঙ্গ।

যদুদা জিজ্ঞাসা করলেন, রাধাচূড়া না হয় বুঝলাম। কিন্তু রাজশৃঙ্গ? রাজ কেন?

ব্রজদা বললেন, ওটা রাধানাথদারই প্রস্তাব। অমন নির্লোভ ব্যক্তি জীবনে আর তো দ্বিতীয়টি দেখলুম না। এভারেস্ট (তোদের সুবিধের জন্য এভারেস্টই বলছি) ডিঙিয়ে ফিরে এসে যেদিন রাধানাথদার পায়ের ধুলো নিলুম, সেদিন প্রথম কথাই জিজ্ঞেস করলেন, একচুয়াল হাইট্‌টা কত দেখলি?

বললুম, ২৯০০২ ফুট। আপনার গণনা অভ্রান্ত।

রাধানাথদা বললেন, ঠিক মেপেছিলি তো।

বললুম, ভুল হবার কোন চান্স নেই। ২৮৯৯০ ফুট উপরে উঠেছি অমনি অলটিমিটারে তুষার কুচি ঢুকে সেটা বিগড়ে গেল। তখন সেখান থেকেই দিলুম ফুলফোর্সে এই হাই জাম্প। এভারেস্ট ডিঙিয়ে পড়লুম এসে থায়াংবোচি গুম্ফার উঠোনে। সেদিন সাংঘাতিক পরিমাণে তুষারপাত হয়েছিল তাই রক্ষে। পেঁজা তুলোর মত নরম তুষারের উপর পড়েছিলুম। হাড়গোড় ভাঙ্গেনি। আপনি তো জানেন দাদা, আমি ম্যাক্সিমাম ১২ ফুটই ক্লিয়ার করতে পারি। তাহলে ২৮৯৯০+১২, ইক্সিকলটু ২৯০০২ ফুটই দাঁড়াল। এ বাবা ক্যাল-কুলেশনের ব্যাপার, পিওর এরিথমেটিক, একটুও এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই।

রাধানাথদা দুহাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আনন্দে।

বললেন, ব্রজ রে, তুই বাঙ্গালীর মুখ রাখলি। কিন্তু খবরদার একথা এখন প্রকাশ করিসনি। সাহেবরা তোকে কিন্তু গুম করে ফেলবে। তোর নামে আমি এই শৃঙ্গের নাম করলুম। ব্রজচূড়া, নাঃ কানে ভাল ঠেকছে না। ব্রজরাজ শৃঙ্গ, উহুঁ। হঠাৎ ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠলেন রাধাদা। বললেন, পেয়েছি। রাজশৃঙ্গ। ব্রজরাজের রাজটুকুই নিলুম, সুন্দর হয়েছে নামটা। রাজশৃঙ্গ। আবার শৃঙ্গের রাজা, সে মানেও করা যাবে। এই নামই থাকল। এখন চেপে যা। এই ভবিষ্যৎ-বাণী করলাম, দেখিস, দেশ স্বাধীন হলে কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা বিলিতির বদলে দিশি নামের সাইনবোর্ডখানা এভারেস্টের গায়ে ঝোলাবার প্রস্তাব পাশ করে দেবে।

ব্রজদা বললেন, আরে আগের আমলের লোকেরা ছিল ত্রিকালদর্শী।



দিলুম ফুলফোর্সে হাই জাম্প

কলকাতা কর্পোরেশন তৈরী না হতেই, তার কাউন্সিলারের সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী যা করেছিলেন, এখন হাতে হাতে তা মিলিয়ে দেখে নে। রাজশৃঙ্গ নামটা বঙ্কিমবাবুরও খুব মনঃপূত হয়েছিল, বুঝলি। এর অনুকরণে বঙ্কিমবাবু তাঁর এক উপন্যাসের নাম দিয়েছিলেন রাজসিংহ। রাধানাথদা ব্যাপারটা ওকে বলেছিলেন কি না। তাহলে হিস্ট্রিটা বলি তোদের।

সুনীল বোস শিউরে উঠে বলল, দোহাই ব্রজদা, আপনার এই অসুস্থ শরীরে আপনাকে এখন আমরা কিছুতেই এভারেস্টে উঠতে দেব না। এই তো ক'দিন হল করোনারির ধকল থেকে উঠলেন। এবার কিছুদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।

ব্রজদা সস্নেহে সুনীলকে এক ধমক মেরে বললেন, থাম। করোনারিই বল আর পরনারীই বল, ব্রজরাজ কারফর্মাকে ঘায়েল করতে পারে যে নারী সে তো আর সমতল ভূমিতে থাকে না। থাকে হিমালয়ের কাঁধে, স্নো লাইনের অনেক উপরে। ২৭০০০ ফিটের এক ইঞ্চি নিচে নামে না। সেই নারীই বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে আমাকে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠার খিড়কির দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল। সে হচ্ছে এক তুষারনারী। ইংরেজদের ঐ কুচ্ছিৎ ভাষায় যাকে বলে আবমিনেবল স্নো উওম্যান। আমি যেবার এভারেস্ট এক্সপিডিসনে যাই, ভাগ্যক্রমে দেখা পেয়েছিলুম ঐরকম এক তুষারনারীর। সে ভাই নারী অফ অল নারীজ্। সেই ছিল আমার গাইড্। তাহলে শোন।

ব্রজদা নড়েচড়ে সিধে হয়ে বসলেন।

বললেন, একদিন সন্ধ্যের সময় রাধানাথদার বাড়িতে গেছি। দেখি কি, গম্ভীরভাবে দাদা বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেও যেন দেখলেন না। টেবিলের উপর কাগজপত্র ছড়ান। জ্যামিতি, ত্রিমিতির বিস্তর নক্সা এঁকেছেন, বিস্তর অঙ্ক কষেছেন। একটু পরেই এসে চেয়ারে বসলেন। আবার ডুবে গেলেন গণিতের দুরূহ ক্যালকুলেশনের অতল গভীরে। কি কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে তখনও বুঝিনি। অনেকক্ষণ পরে হতাশ হয়ে বলে উঠলেন, না, হচ্ছে না। কোথায় যেন গোলমাল হচ্ছে।

এমন সময় আমার দিকে নজর পড়ল। একটু হেসে বললেন, কি রে, কখন এলি? তারপর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই আবার ডুবে গেলেন ধ্যানে। বসে থাকলে পাছে তাঁর কাজে ব্যাঘাত হয়, আমি তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা কাগজে লিখে রেখে এলাম—"গোড়ায় গলদ"।

পরদিন বিকালে রাধানাথদা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে আমার বাসায় এলেন। চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন, ব্রজ আছিস? ব্রজ? ডাক শুনে বেরিয়ে আসতেই আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে কাঁধে তুলে রাধানাথদা ধেই ধেই করে

নাচতে লাগলেন। যত বলি, ছাড়ুন ছাড়ুন, দাদা, করছেন কি? তা সে কথা কে শোনে। খানিকক্ষণ নাচানাচি করে দাদা আমাকে নামিয়ে দিলেন। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ব্রজ, আজ আমি পৃথিবীর সব থেকে উঁচু চূড়া আবিষ্কার করেছি। ক'দিন ধরেই এর পিছনে লেগে ছিলুম। হিসেব আর কিছুতেই মিলছিল না। হঠাৎ তোর চিরকুট্টার উপর নজর পড়ল। দেখলুম গলদটা সত্যিই গোড়াতে। ভুলটা ছিল লম্ব অভিক্ষেপে। আজ আপিসে বসে নতুন করে হিসেব শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ল উচ্চতম শৃঙ্গ। আর এটা সম্ভব হয়েছে তোরই জন্য। ভুলটা ভাগ্যিস ধরিয়ে দিয়েছিলি।

রাধানাথদার কথা শুনে আমি তো ভাই লজ্জায় মরে যাই। কী-ই বা এমন করেছি। নেহাৎ ভুলটা চোখে পড়ে গিয়েছিল তা-ই। কিন্তু সে কথা দাদাকে বোঝাতেই পারলাম না।

ক'দিন পরে রাধানাথদা বললেন, দ্যাখ ব্রজ, একটা কাজের ভার তোকে দিতে চাই। পারলে তুই-ই পারবি। নিবি কাজটা?

জিজ্ঞাসা করলাম, কাজটা কি?

রাধানাথদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর চুপি চুপি বললেন, তোকে ঐ শৃঙ্গটায় চড়তে হবে। পারবি? আমি চাই এই শৃঙ্গে সর্বাগ্রে বাঙালীর পদচিহ্ন পড়ুক। রাধানাথদার কথা শুনে আমি তো এক পায়ে খাড়া। বললুম, আপনি গুরুজন, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

রাধানাথদার আশীর্বাদ নিয়ে তার পরদিনই রওনা দিলুম। এখনকার মত এত লোক-লস্কর লটবহরের বালাই ছিল না আমার। তিব্বতী লামার ছদ্মবেশ ধরে রওনা দিলুম অজানা সেই শৃঙ্গটির দিকে। ঘণ্টায় দশ মাইল এবং দিনে-রাত্রে বিশ ঘণ্টা হেঁটেছি তখন। দার্জিলিং, নেপাল, ভুটান, সিকিম, পার্বত্য ত্রিপুরা পেরিয়ে যাতুং-এর উপর দিয়ে ঢুকে পড়লাম তিব্বতে।

যাতুং-এর চটিতে এক লামার সঙ্গে আমার দেখা হল। সে লাসায় যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই খবর পেলাম চো মো লাংমা বলে এক সুউচ্চ শৃঙ্গ আছে তাদের দেশে যার মাথা ডিঙিয়ে সূর্যও যেতে পারে না। দেখলুম তার বর্ণনার সঙ্গে রাধানাথদার কথার কিছু কিছু মিল হচ্ছে। ঠিক করলুম চো মো লাংমাটাই দেখে আসব। লামাটাই বললে, ঐ পাহাড়ের নিচেতেই একটা বড় মঠ আছে। মঠটার নাম রংবক।

এই সামান্য মাত্র সংবাদ আর কম্পাসের উপর নির্ভর করে রওনা হলাম রংবকের দিকে। সঙ্গে ছিল দুটি মাত্র চমরি গাই। একটা মাল বইত আরেকটা দুধ দিত। মে মাসে কলকাতা ছেড়েছিলাম। পুরো বর্ষা তিব্বতের পথে পথে কাটিয়ে দিলাম। রংবকে যখন পৌঁছালাম তখন অক্টোবরের শীত হানা দিতে শুরু করেছে। পুরো নভেম্বর মাসটা সেই মঠে বিশ্রাম নিলাম। খাই দাই

ঘুরি। অ্যাক্লাইমেটাইজেশনও হয়। অর্থাৎ ওখানকার আবহাওয়াটা সইয়ে নিচ্ছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাপও আঁকি। আর সন্ধ্যেবেলার প্রার্থনা শেষে মঠের বুড়ো বুড়ো লামাদের সঙ্গে হীনযান, মহাযান, ব্যোমযান, অম্লযান, যবক্ষারযান সাধনতন্ত্রের গূঢ় অর্থ নিয়ে আলোচনা করি। কোন বিষয়েই আমাকে কাবু কেউ করতে পারেনি।

আমি কাবু হয়েছিলাম ওখানকার শীতে। সে শীত বর্ণনা করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হত আমার মাংসগুলো কুরুনি দিয়ে কেউ বুঝি কুরে নিচ্ছে। হাজার হাজার হাঙরের দাঁত আমার হাড়ের উপর বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাপমাত্রা একবার এমন নামাই নামল যে, একদিন দেখি আমার ব্যারোমিটারটার পারদ তলা ফুটো করে মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত নেমে গেছে। গিয়ে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে। বুঝে দ্যাখ কারবাবখানা!

ব্যারোমিটার না থার্মোমিটার? সুনীত সরলভাবে জানতে চাইল।

ব্রজদা তার দিকে না চেয়েই জবাব দিলেন, আসলে ওটা ছিল থার্মাল-ব্যারো-অল্টি-কম্পাস। ঐ এক যন্ত্রেই সর্বকার্য সিদ্ধি। ঐ যে তোদের সর্বার্থ-সাধক না কি, তাই। হ্যাঁ, এখন শীতের কথা শোন।

তোদের বলব কি, অনেক খেটেখুটে আমি একখানা রিলিফ ম্যাপের খসড়া করছিলাম। রাত্তির বেলা শোবার আগে আমি চো মো লংমার অর্থাৎ এভারেস্টের একটা পেন্সিল স্কেচ করে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি সেই বাফ্ স্কেচের ডগাতেই শক্ত শক্ত বরফ জমে গেছে। অ্যাইসাই শীত সেখানে। আমার দুধেল চমরি গাইটা শীতের চোটে ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। একদিন তো যায়-যায় অবস্থা। ওর শরীরের তাপ বাড়াবার জন্য চিনির কনসেনট্রেটেড ট্যাবলেট্ গোটাকয়েক খাইয়ে দিতেই চাঙ্গা হয়ে উঠল! পরদিন দুধ দুইতে গেছি। দুধ আর বেরোয় না। জোরে জোরে টান দিতেই দেখি বাঁট দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বড়বাজারের স্পেশ্যাল কুলপি মালাই বেরোচ্ছে। এক একটা করে তাই সবাইকে খেতে দিলাম। লামারা সাত জন্মে কুলপি খায়নি। এমন বড়িয়া চীজ খেয়ে ওরা আমার উপর যে কি খুশি হল, তোদের কি বলব। সবাই মিলে আমাকে আশীর্বাদ করলে। কিন্তু ফাঁকা আশীর্বাদে কি শীত মানে? আমার তো অক্কা পাবার অবস্থা হল।

আমার অবস্থা দেখে মঠের সব চাইতে যে বৃদ্ধ লামা, তার বড় করুণা হল। একদিন রাতে এসে আমায় বললে, বাচ্চা, এমনভাবে থাকলে তুই মরে যাবি। তোকে একটা মাদুলি দিচ্ছি, তুই লুকিয়ে সেটা হাতে বেঁধে রাখ। শরীর গরম হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার একথা কেউ যেন টের না পায়। তাহলে এরা তোকে মেরেই ফেলে দেবে। মঠধারী ছাড়া এসব জিনিস কাউকে দেওয়া নিষেধ।

মাদ্বলিটা বাঁ হাতের ডানায় বেঁধে নিলাম। কি আশ্চর্য সেই মাদ্বলির ক্ষমতা! দেখতে দেখতে শরীর গরম হয়ে গেল। একট্ব পরে গলগল করে ঘাম বের্বতে লাগল। একে একে গরম জামা খ্বলে ফেললাম। শেষ পর্যন্ত সেই মাইনাস জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচারে, বললে বিশ্বাস করবিনে, শ্বধ্ব আন্ডার-ওয়ার আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে চমরি গাইয়ের ল্যাজ নেড়ে নেড়ে হাওয়া খেতে লাগলাম।

মাদ্বলিটা অনেকদিন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল। কতবার শীতকালে যে পরিবারস্বদ্ধ ঐ মাদ্বলি নিয়ে দার্জিলিং-এ চেঞ্জে গেছি তার আর হিসেব নেই। একটা এয়ার-টাইট কাঠের হাতবাক্সে মাদ্বলিটা প্বরে রাখতাম। কারণ এ দেশের যে শীত তাতে মাদ্বলিটা আর দেহে ধারণ করতে হত না। ঐ কাঠের বাক্সটা ঘরের এক কোণে রেখে দিলেই গোটা বাড়িটা দিব্যি গরম হয়ে যেত। খ্বব বেশি শীত পড়ল তো, ডালাটা সামান্য একট্ব ফাঁক করে দাও। ঐ যথেষ্ট।

স্বনীত খ্বব শীত-কাতুরে। বললে, মাদ্বলিটা আছে ব্রজদা?

ব্রজদা ম্লান হাসি হেসে বললেন, তবে আর দ্বঃখের কথা বলছি কেন? আমার ম্বখে এই মাদ্বলির কথা শ্বনে স্যর পি সি রায় একদিন আচার্য রমণকে কথাটা বলেন। তারপর দ্বজনেই একদিন আমার বাড়িতে এসে হাজির। মাদ্বলিটা দেখতে চাইলেন। তখন গরমকাল। বরফের গামলায় বাক্সটা ডুবিয়ে রাখতে হত।

কি আর করি, সেই গামলাস্বদ্ধ বাক্সই এনে দেখালাম। আচার্য রমণ আসল বৈজ্ঞানিক তো। অ্যাস্‌বেস্টাসের দস্তানা পরে বাক্স খ্বলে মাদ্বলিটা হাতে নিলেন। ঘরের ভিতর গরমে অস্থির হয়ে উঠল্বম। বললাম, ছাতে হাওয়া আছে, চল্বন যাই। তিনজনে ছাতে গেলাম। দেখি কি ঈশান কোণে মেঘ করেছে।

আচার্য রমণও মাদ্বলির ক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এইট্বকু বস্তুর মধ্যে এত প্রচন্ড এনার্জি ল্বকিয়ে আছে। ভিতরে কি আছে দেখবার কৌত্বহল দমন করতে না পেরে তিনি একটা ছ্বরির ফলা দিয়ে মাদ্বলির ম্বখটায় চাড় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছ্বরির ফলাটা গলে জল হয়ে হয়ে ট্বপ ট্বপ করে ঝরে পড়ল। মাদ্বলির তেজটা একবার বোঝ। শেফিল্ডের ইস্পাতও মাখনের মত গলে গেল। এখন সমস্যা দাঁড়াল, মাদ্বলির ম্বখটা খোলা যায় কি করে? আমি একট্ব হেসে তোদের বউদিকে ডাকলাম। সে বাঙ্গালীর মেয়ে। দিনরাত হেঁসেলেই পড়ে থাকে। গনগনে হাঁড়ি কড়াই খালি হাতে অনবরত নামাচ্ছে উন্বন থেকে। তার হাত দ্বখানা তো ফায়ার-প্রুফ। বললাম, মাদ্বলির ম্বখটা খ্বলে দাও তো। কিন্তু তোদের বউদিও ফেল মেরে গেল। তখন সত্যিই আমি অবাক হলাম। তাহলে উপায়?

আশ্চর্য, উপায় তোদের বউদিই বাতলে দিলে। এরকম উপস্থিত বুদ্ধি খুব কম লোকেরই আছে। বললে, দাঁড়াও এখুনি খুলে দিচ্ছি। একটা দেশলাই-এর কাঠি নিয়ে আসছি। বললাম, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। নাকি মস্করা করছ? দেখছ বিলিতি মেকারের ইস্পাতের ছুরি গলে গেল, আর তুমি দেশলাই-এর কাঠি আনতে যাচ্ছ? তোদের বউদি বললে, বিলিতি মেকারের ছুরি বলেই গলেছে, এ হচ্ছে স্বদেশী মেকারের দেশলাই, সূর্যের গায়ে ঘষলেও এর কাঠি জ্বলে না।

সত্যিই তাই, কোত্থেকে এক "ক্ষুদিরামের ফাঁসি" মার্কা দেশলাই নিয়ে এল। ছবির নিচে "বাই স্বদেশী" লেখা আছে। একটা কাঠি বের করে তোদের বৌদি তা দিয়ে খুঁটে খুঁটে অনায়াসে মাদুলির মুখটা খুলে দিলে। দুই আচার্য স্বদেশী দেশলাইয়ের মহিমা দেখে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আচার্য রমণ মাদুলিটাকে তাঁর অ্যাসবেস্টাসের দস্তানার উপর উপুড় করে ঢেলে দিলেন। খুব সূক্ষ্ম একটা কি পড়ল, তাও দেখলাম। আচার্য রমণ হাতটাকে চোখের কাছে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কালবোশেখীর দমকা ঝড়ে বস্তুটি স্যাঁৎ করে উড়ে চলে গেল। আচার্য রমণ হায় হায় করে উঠলেন। ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। ও কি আর পাওয়া যায়?

ব্রজদা গভীর বিষাদে নিমজ্জমান হয়ে গেলেন।

সুনীত রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। ব্রজদা থামতেই প্রশ্ন করল, সেই সূক্ষ্ম বস্তুটা কি? আপনি দেখেছিলেন ব্রজদা?

দেখেছি বৈ কি।

বললাম, কি সেটা?

ব্রজদা বললেন, একগাছি রোঁয়া।

রোঁয়া!

কিসের রোঁয়া?

ব্রজদা বিরক্ত হলেন। বললেন, তা আমি কি জানি?

ব্রজদা গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর দুম করে বলে উঠলেন, আর ও কি যে-সে মাদুলি। একবার প্রকাণ্ড এক তুষার ধসের নিচে কবরস্থ হয়ে গিয়েছিলাম। তিন দিন তিন রাত সেই বরফের পাহাড়ের নিচে চাপা পড়েছিলাম। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে কেউ বাঁচে না। কারণ প্রথমত, তুষার ধস বা অ্যাভালান্সের ধাক্কা। সে ধাক্কায় ছোটখাট পাহাড় গুঁড়িয়ে যায় তো মানুষ কোন্ ছার। দ্বিতীয়ত, অ্যাভালান্স বা তুষার ধসের ওজন। যদিও দৈবগতিকে ধর অ্যাভালান্সের ধাক্কাটাও সামলালি, কিন্তু পাহাড়প্রমাণ বরফের স্তূপের হাজার হাজার টন ওজনের চাপেই যে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবি। এবং তৃতীয়ত, অক্সিজেনের অভাব। তোর শরীরের উপর—'সে রাফলি'—বিশ হাজার টন

বরফ পড়ে আছে। তুই নিঃশ্বেস নিবি কি করে? যদিও ধর কোন গতিকে ধুকপুক করে কিছুক্ষণ শ্বাসগ্রহণ প্রক্রিয়াটাকে চালু রাখলি, কিন্তু অক্সিজেন, অক্সিজেন পাবি কোথায়? এইসব কারণেই ভাল ভাল মাউণ্টেনিয়াররা অ্যাভাল্যান্স ট্যাভালান্সকে পারতপক্ষে এড়িয়েই চলতে চায়। কারণ তারা জানে, এর কবলে পড়া মানেই অবধারিত মৃত্যু। তবে আমি মরিনি। যদি বলিস, কেন? তবে তার উত্তর: ঐ মাদুলি। সে এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী। বলছি শোন।

ব্রজদা সিগারেট ধরাবার জন্য একটু থামলেন।

এই ফাঁকে সুনীল বলল, এভারেস্ট ওঠা তবে কি আজ বন্ধ থাকল?

ব্রজদা ইঙ্গিতটা বুঝে কটমট করে তার দিকে চাইলেন।

বললেন, তোদের ব্রজদা একবার যে কাজে হাত দেয় তা শেষ না করে থামে না। এভারেস্টের দিকেই যাচ্ছি।

একটু থেমে ব্রজদা ফসফস করে সিগারেটে কয়েকটা টান দিলেন।

তারপর বললেন, সেই বুড়ো লামা, কৃপা করে যিনি আমাকে মাদুলিটা দিয়েছিলেন, তাঁর নাম সংক্ষেপে হচ্ছে ঘ্যাঙচক থোন্ডাপ ৎসেরিখেরি লবসাঙ কাঙপোঙ দোরপু জবড়জঙ্গ দোরজে। আসলে তিনি থ্রিজঙ্গ মঠের লামা। আর আমি ঐ অঞ্চলে যে ছদ্মনামে ঘুরেছি সেটা হচ্ছে বোরজে ৎসাম্পো রাজজঙ্গ নোরগে ৎছাগ লাগ খাঙ কারফঙ গাম্পো। আমার মঠের নাম বলে-ছিলাম ভুজুংভাজঙ মঠ। পরস্পরের সুবিধের জন্য আমি তাঁকে বলতাম ঘ্যাঙচক লামা আর তিনি আমাকে বলতেন বোরজে লামা। ঘ্যাঙচক লামা আমাকে রোজ একবার করে সাবধান করে দিতেন, খবরদার, এই মঠের লামা ব্যাটারা যেন ঘুণাক্ষরেও তোমার মাদুলির কথা টের না পায়। তাহলে বরফের নিচে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে। সর্বদা জামা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকবে।

আমি ঘ্যাঙচক লামার উপদেশ সর্বদা মেনে চলতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু সেই মাদুলি হাতে বেঁধে জামা গায়ে দিয়ে থাকে কার সাধ্যি। তবু তো আমি ঢিলে হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে রাখতুম। কিন্তু মাদুলির ডিরেক্ট কনট্যাক্টে ছিলাম তো, তাই ঐ মাইনাস জিরো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডেও আদ্দির পাঞ্জাবী অসহ্য লাগত। মনে হত, জুন মাসের গনগনে কলকাতায় যেন ফুল-হাতা সোয়েটার পরে আছি।

সুনীত ফট করে বলে বসল, আপনি ঐ রংবক মঠে আদ্দির পাঞ্জাবী কোথায় পেলেন?

সুনীল বলল, এসব কথা জিজ্ঞেস করবার মানে হয়? মঠের টেলারিং ডিপার্টমেণ্ট থেকে ব্রজদা বানিয়ে নিয়েছেন।

ব্রজদা বললেন, তিব্বতী মঠ কি তোমাদের কমলাপতি স্টোরস্ যে, তার

টেলারিং বিভাগ থাকবে? পাঞ্জাবীটা গুলে ওস্তাগর লেনের ইয়াসিন দর্জির তৈরি। লখনউ-এর কলিদার ছাঁট। দুদিকের ডানার উপর আর বোতামের ঘরের দুপাশে নবাবি লেস দেওয়া। ও কাজ তিব্বতী দর্জির চোদ্দপুরুষও করতে পারত না। তোরা তো এক একটা আস্ত ছাগল। মাথায় ঘি নেই একটি ফোঁটা। তাই এমন আজগুবি কথা মনে আসে। কলকাতা থেকে যখন যাত্রা করি, তখন সময়টা কি ছিল মনে আছে?

ব্রজদা সকলের মুখের দিকে একবার করে চাইলেন।

যদুদা বললেন, বোধ হয় গ্রীষ্মকাল।

ব্রজদা খিঁচিয়ে উঠলেন, আবার বেনিফিট অব্ ডাউট্ কেন? স্পষ্ট করেই কাশ না। হ্যাঁ, পুরো গ্রীষ্ম। কলকাতার মে মাস। সেই গরমে আমি কি এখান থেকে অলেস্টার গায়ে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম! যতো সব। বৃথা সময় নষ্ট না করে, যা বলছি শুনে যা।

ব্রজদা শুরু করলেন : গরমটা তবুও মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিলাম। দিনরাত ভয়ে ভয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীটা পরে থাকতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাহিল করে ফেলল ঘামাচি। উঃ, ঘামাচির চিটপিটোনির জ্বালায় এক এক সময় মনে হত পাগল হয়ে যাব। মনে হত, টান মেরে দিই মাদুলিটাকে ফেলে। পরক্ষণেই ভয় হত, মাদুলি ফেললেই সর্দিগর্মি লেগে যাবে। হুপিংকাশি কি ডবল নিউমোনিয়া হওয়াও বিচিত্র নয়।

একদিন সন্ধ্যে রাত্রে আর থাকতে পারলাম না। এক টানে জামা গেঞ্জি খুলে ফেলে পট পট করে ঘামাচি মারতে শুরু করলাম আর ঠিক সেই সময় এক-চোখ কানা দ্রিপুং লামা ব্যাটা সেই অবস্থায় আমায় দেখে ফেললে। সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীটা পরে ফেললাম। কিন্তু সর্বনাশ যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। এক লাফে সে আমাকে জাপটে ধরল। তার একটা চোখ ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগল।

বললে, কে তুই? তুই তো লামা নোস। বিদেশী। গুপ্তচর। এখানে কি করতে এসেছিস? বল, তুই কে?

বলতে বলতে ফস্ করে একখানা ধারাল ছোরা বের করল। মুহূর্তের মধ্যে তাকে মারলাম এক রদ্দা। ঘুরে পড়ে গেল। আমি দেখলাম, এখন পলায়নই প্রশস্ত। যন্ত্রপাতিগুলো তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবীটা পরে নিলাম। হাতের কাছে পেলাম তিব্বতী চায়ের দুখানা ইট। ভরে ফেললাম পকেটে।

তারপর বেরিয়ে পড়লাম। তখন তুষার ঝড় শুরু হয়েছে প্রচণ্ড বেগে। ঘণ্টায় সত্তর আশি মাইল তো হবেই। একশ হওয়াও বিচিত্র নয়। তার গতি সোজা দক্ষিণে। মঠের গেট বন্ধ। দুটো যমদূত গেট পাহারা দিচ্ছে। বিপদের

উপর বিপদ। সেই দ্রিপুং লামা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে প্রাণপণে তিব্বতী শিঙগা বাজাতে শুরু করেছে। মুহূর্তের মধ্যে মঠের ভিতর বিপজ্জনক সংকেত বেজে উঠল। হিংস্রতায় উন্মত্ত হয়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লামারা পিলপিল করে চারদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল। দেখলাম, বেড়াজালে পড়ে গেছি। অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মঠের পিছনে মাঠের দিকে এগুচ্ছি। হঠাৎ কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। ঠাহর করে দেখি দুটো বেশ প্রমাণ-সাইজের রাম-শিঙগা মঠের উঠোনের বরফের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। রামশিঙগা দুটো পেয়ে বুঝলাম, এ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আমার মুক্তির পথ পেয়ে গেছি। ঈশ্বরকে মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে রামশিঙগা দুটো দু'পায়ে জুতোর নিচে বেশ শক্ত করে বেঁধে নিলাম। আর আমাকে পায় কে?

ব্রজদা চুপ। আরেকটা সিগারেট ধরালেন। আমরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। অর্ধেকটা সিগারেট নিঃশব্দে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিয়ে ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন।

বললেন, ভাগ্যিস, একদিন শী-খেলাটা শিখে রেখেছিলাম! আজ সেটা এমনভাবে কাজে লাগবে বুঝতে পারিনি। শী-এর তক্তার চাইতে তিব্বতী রামশিঙের গুণ দেখলাম আরও বেশী। এখান সেখান থেকে দুটো বেশ পোক্ত দেখে লম্বা লম্বা লাঠিও যোগাড় করে ফেললাম। তারপর মঠের খিড়কির উঠোনে বার কয়েক পাক মেরে ট্রায়ালও দিয়ে নিলাম। বরফ পড়ে উঠোনটায় চমৎকার এক স্কেটিং রিং হয়ে গেছে। মনের আনন্দে শী করে বেড়াচ্ছি, এমন সময় গোটাকয়েক লামা আমাকে দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে ছুটে এল। আমি প্রবল বেগে শী-এ চড়ে গোটা উঠোনে বার চারেক পাক মেরে যতটা স্পীড্ আমার দরকার তা তুলে নিলাম। তারপর তড়াক করে দিলাম আকাশচুম্বি এক লাফ। এক লাফে মঠ ডিঙিয়ে এসে পড়লাম রংবক হিমবাহে। ঝড়ের বেগ হু হু করে বেড়ে চলেছে। আমার পাঞ্জাবী ফুলে ফুলে উঠছে। বিদ্যুতের ঝিলিকের মত আরেকটা আইডিয়া আমার মাথায় খেলে গেল।

আমি লাঠি দুটো ফেলে দিয়ে পাঞ্জাবীর দুটি প্রান্ত চেপে ধরলাম। সেটা খানিকটা পালের কাজ করল। তখন ঝড়ো বাতাসের সেই তীব্র গতি ভয়াবহ বেগে আমাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল দক্ষিণ দিকে। ডানদিকে একটু দূরে গিয়াংচু কাঙের চূড়া এক ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

বাঁয়ে পড়ে থাকল খার্তা ফু। চাঙৎসের মাথা টপকে সোজা পড়লাম গিয়ে নর্থ কলে। রাতের অন্ধকারেই আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের। আর মাত্র কয়েক হাজার ফুট। অলটিমিটারে দেখি, হু হু করে উচ্চতা বাড়ছে। পঁচিশ হাজার ফুট, ছাব্বিশ হাজার ফুট। আর মাত্র হাজার তিনেক ফুট। তাহলেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে এই সর্বপ্রথম

মানুষের পদচিহ্ন পড়বে। আর সে মানুষ আবার এক বাঙ্গালী। মনে মনে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর, বাতাস যেন এখন কিছুক্ষণ বন্ধ না হয়। সাপ্লাইটা আরও কিছুক্ষণ চালু রাখ প্রভো।

কিন্তু মানুষ যা চায়, সব সময় কি তা পায়। যে ঝড়ের সাহায্যে তরতর করে এতদূর উঠে এলাম অবলীলাক্রমে, সেই ঝড়ই আমাকে মারলে মোক্ষম এক ল্যাং। ঝড়ের গুঁতোয় সাতাশ হাজার পাঁচশ একচল্লিশ ফুট ওপরের এক জায়গায় বরফের লেয়ার উড়ে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। আমার তিব্বতী শিঙ্গার শী সেই ন্যাড়া পাথরে ঠোক্কর খাওয়ামাত্র দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল। আমি হুমড়ি খেয়ে ছিটকে পড়লাম। দুটো পা-ই মচকে গেল। কোনক্রমে দুহাতে ভর দিয়ে উঠতে গেলাম, এমন সময় অতর্কিতে ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল এক অ্যাভালান্স। মুখ থুবড়ে সেই যে পড়লাম তিনদিনের মধ্যে আর উঠতে পারিনি।

কখনো উঠব তাই কি ভেবেছিলাম? থ্যাংকস্ টু দ্যাট মাদুলি। তার কৃপাতেই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। সেই মাদুলির আঁচে খানিকটা জায়গায় বরফ গলে জল হয়ে গিয়েছিল। সেই যে একটু ফাঁক হল তাতেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন থাকবার জায়গা মিলে গেল। আমার জ্ঞান হতেই দেখি পেল্লায় বরফের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছি।

ঘোর অন্ধকার। প্রচন্ড তেষ্টা পেয়েছে। পকেট হাতড়ে হাতড়ে তিব্বতী চায়ের একখানা ইঁট থেকে এট্টুসখানি ভেঙ্গে নিলাম। তারপর এক খাবলা বরফ গুঁড়ো করে তার সঙ্গে মিশিয়ে ডান হাতের গন্ডুষে সেই মিকশ্চার নিয়ে বাঁ হাতের মাদুলিতে হাফ-এ মিনিট ঠেকিয়ে রাখলাম। ধীরে ধীরে বরফ গলে জল হল। সেই জল ফুটে উঠতেই হাতটা সরিয়ে নিলাম। ব্যস্, বিউটি-ফুল লিকার। এমনি করে কয়েক গন্ডুষ গরম চা পান করতেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর সেই বরফের স্তূপে মাদুলি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে বরফ গলাতে লাগলাম। তিনদিনের মধ্যে কয়েক হাজার টন বরফ ক্লিয়ার হয়ে গেল। প্রচন্ড বন্যা হয়েছিল সেবার। মানস সরোবর ওভার ফ্লো করে গঙ্গা যমুনা প্লাবিত করলে। আবার ওদিকে ব্রহ্মপুত্রের চ্যানেলে যে জল বেরিয়ে গেল তা আসামকে তছনছ করে দিলে।

তিনদিন পরে আমি আবার আকাশ দেখলাম। তারপর ক্লান্ত হয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানিনে। চোখ মেলতেই দেখি, সূর্য ঢলে পড়ছে। বরফে বরফে সূর্যের রাঙ্গা আলো প্রতিবিম্বিত হয়ে স্বর্গীয় অপার্থিব সব বর্ণালী খেলা শুরু হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে নয়ন ভরে তাই দেখছিলাম। হঠাৎ শিয়রের দিক থেকে এক বিজাতীয়, বড় মিঠে, বড় মধুর সঙ্গীত ভেসে এল। চমকে চেয়ে দেখি, একটু দূরে, একটা বড় বরফের চ্যাঙড়ের উপর পা ঝুলিয়ে

এক ভালুক বসে আছে। প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। তারপরই অবাক হলাম। এত উঁচুতে ভালুক এল কোত্থেকে? ভালুক আবার গান গায়, এ তো কখনো শুনিনি। ভালুকের দিকে নিষ্পলক চেয়ে আছি। আবার সেই সংগীত ধ্বনিত হল। এবার ঠাহর করে বুঝলাম, এ তো গান নয়, কথা। এক রকমের গীতিময় ভাষা। কান খাড়া করে মানে বুঝতে চেষ্টা করলাম। আবার সেই সংগীত শুনলাম। আর আশ্চর্য, অর্থটাও এতক্ষণে বোধগম্য হল। মাথা নেড়ে জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তারপর—

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ভালুকটা কি জিজ্ঞাসা করল?

সুনীল বিরক্ত হয়ে বলল, এ-ও জানেন না! তবে কি ঘোড়ার ডিমের লেখাপড়া শিখেছেন মশাই। ভালুকরা তো ঐ একটা কথাই জানে, এ ফ্রেণ্ড্ ইন নিড্, এ ফ্রেণ্ড ইনডিড্।

তোমার মাথা! ব্রজদা গর্জন করে উঠলেন। এ ভালুক তোকে কে বললে? অপ্সরীর মত মেয়ে, তাকে বলে কিনা ভালুক! চোখের মাথাটি খেয়ে বসে আছ দেখছি। ইস্টুপিড, ইডিয়েট কোথাকার।

সুনীল থতমত খেয়ে বললে, আমি ভালুক বলব কেন? আপনিই তো বললেন।

আমি বললুম? আমার বলা শেষ করতে দিলি তোরা? ব্রজদা গজ গজ করতে লাগলেন। বললেন, সবটা আগে শুনবি তো।

যদুদা বললেন, ওদের কথায় কান দেন কেন? আপনি তো বলছেন অপ্সরা। ওহো, বুঝেছি। এই বুঝি সেই তুষার-নারী।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, রাইট ইউ আর। এই মেয়েটিই আমার লভে পড়ে গিয়েছিল। আমাকে এভারেস্টের খিড়কি দরজার হদিস বলে দিয়েছিল। সেদিন হাইজাম্পটি দিয়ে এভারেস্ট ডিঙেগালাম বটে, কিন্তু মেয়েটিকে চির-জীবনের মত হারালাম। পারুকে কথা দিয়েছিলাম, এভারেস্টে ওঠার পর ওর কাছে ফিরে যাব, তা আর পারলাম কই?

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ব্রজদা, পারু কে?

ব্রজদা বললেন, ঐ সেই তুষার-নারী, ওরা তো পর্বত-দুহিতা, অর্থাৎ পার্বতী। তাই আদর করে পারু বলতাম। খুবই লাইক করত আমাকে।

যদুদা বললেন, আচ্ছা, অমন একটা মেয়েকে আপনার প্রথমে এই ইয়ে বিয়ার (যদুদা আর ভালুক বলতে সাহস পেলেন না) বলে মনে হল কেন? আপনার তো এমন ভুল হয় না।

ব্রজদা বললেন, শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওরা আগাপাশতলা লোমশ ভালুকের চামড়ার পোশাক পরে। তাই প্রথমটা আমার ঐ রকম একটা

ভ্রম হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল ভেঙেছিল। প্রথম কথাটি শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, ও কে।

উসখুস করে সুনীত জিজ্ঞাসা করল, কথাটা কি? প্রথমে আপনাকে উনি কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

ব্রজদা বললেন, কি আবার বলবে? ভাল ভাল হিরোইনরা প্রথম সাক্ষাতে হিরোদের যা বলে, তাই বললে। সেই সংগীত-সংকেত ডিসাইফার করলে কথাটার মানেটা দাঁড়ায় : পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?

দশম গল্প

"শার্লক হোমস্ নামটা কাল্পনিক, কিন্তু মানুষটা রিয়েল। আর এ-ও জেনে রাখ, তোমাদের এই ব্রজদাই সেই শার্লক হোমস্।"

ব্রজদার এক মন্তব্যে আমরা একেবারে চুপ। ঘরের মেঝেয় সূঁচটি পড়লেও, সেই আওয়াজে আমরা বোধহয় তখন চমকে উঠতাম। পুরনো পাখাটা আমাদের মাথার উপর এতক্ষণ ধরে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে ঘুরপাক খাচ্ছিল, ব্রজদার কথা শুনে সেটা অব্দি থ মেরে গেল।

ব্রজদা যে কখন ঢুকেছেন, তা আমরা টের পাইনি। আজ আলোচনাটা এমনই জমেছিল।

সুনীলের বক্তব্য : আমাদের বাঙালী জাতটা যেমন মিনমিনে, তার পোশাক-আসাকও তেমনি ফিনফিনে। এমনই ললিত-লবঙ্গলতা কছমের যে, বাঙালীর ছেলে রুখু রুখু চুল রেখে হয় কবিতা লিখছে, আর না হয় গিলে করা কোঁচা দুলিয়ে নেমন্তন্ন খেতে চলেছে, এই ছবিটাই খাপ খায়। "বাঙালীর বৈশিষ্ট্য যদি ধুতি আর পাঞ্জাবীতে, তাহলে একবার চোখ বুজে কল্পনা করুন তো (সুনীতের দিকে দৃষ্টি হেনে সুনীল প্রশ্ন ছুঁড়ল) সেই ধুতি আর পাঞ্জাবী ল্যাটপ্যাট করতে করতে ওয়ার-ফিল্ডে গিয়ে পড়েছে, এভারেস্টে উঠছে, সমুদ্রের অতলে নামছে, স্পেস্-শিপে উঠে চন্দ্র সূর্য তারায় তারায় পাড়ি জমাতে প্রস্তুত হচ্ছে। পারেন কল্পনা করতে? রাবিশ! এই কোঁচা দোলানো মেণ্টালিটিই বাঙালীকে বাঙালী করে রেখেছে, মানুষ হতে আর দেয়নি। বেশী কথা কি মশাই, বাংলা দেশে একটা অ্যাডভেঞ্চারের সিনেমা তুলুন দেখি, বাঙালী টার্জন কোঁচা দুলিয়ে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। দেখবেন, আপনিই আর ও ছবি দেখতে যাবেন না। হয় না মশাই, যতদিন না ইওরোপীয় পোশাকটি গায়ে চাপাচ্ছেন, ততদিন আপনাদের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা থেকে ভেতোমি যাবে না। যাদের নিজেদের জীবনে অ্যাডভেঞ্চার নেই, তাদের সাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, ডিটেকটিভ গল্প সৃষ্টি হবে কি করে?"

সুনীত অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল, কিন্তু সুনীলের মুখের তোড়ে সে দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছিল না এতক্ষণ। সুনীলের এই সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ভাষণে এমন কয়েকটি বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে

যেগুলির প্রতিবাদ সঙ্গে সঙ্গে করা উচিত, অথচ সে করতে পারছে না। কারণ সুনীল একটা বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদযোগ্য আরেকটি বক্তব্যে লাফিয়ে পড়ছে। তাই সুনীত বার বার মুখ খুলতে গিয়েও হাঁ গুটিয়ে নিয়েছে।

অবশেষে সুনীল সমে পেঁাছে দম ফেলতে না ফেলতে সুনীতের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল।

"আপনার কথার কোন মানে হয় না।"

সুনীল চোখটা ট্যারা করে প্রশ্ন করল, "কোন কথার?"

"আপনার কোনও কথারই মানে হয় না।"

সুনীল বলল, "স্পেস-শিপ, মেণ্টালিটি, অ্যাডভেঞ্চার আর ডিটেকটিভ—এই শব্দগুলোর মানে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে পাবে আর বাদবাকি সব চলন্তিকায়।"

"আহা", সুনীত বিপন্ন হয়ে বলল, "আমি তা বলছি না। ওসব কথা যে ডিকশনারিতে আছে তা আমি জানি। আর ঐসব শব্দের অর্থ সম্পর্কে ডিকশনারির যা ধারণা, আমি তা সমর্থনও করি। কিন্তু একথা মানতে আমি কিছুতেই রাজি নই যে, আপনার ইওরোপীয় পোশাক—"

সুনীল বাধা দিয়ে বলল, "না, ইওরোপীয় পোশাক আপনি ডিকশনারিতে পাবেন না। সে-কথা ঠিক। আর পেলেও তা আপনার ডে-টু-ডে কাজে লাগবে না। ওসব জিনিস পেতে হলে আপনার বরং কোন ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে যাওয়াই ভাল। এসব ক্ষেত্রে সেটাই বেশী নির্ভরযোগ্য হবে। আপনি বরং চাঁদ—"

সুনীত দেখল কথা অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি হাল ঘোরাবার চেষ্টা করল।

"কি মুশকিল!"

"কিচ্ছু মুশকিল নয়। ডিকশনারিতে ঢোকা আর ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে ঢোকা, ও প্রায় একই কথা। প্রথম প্রথম অবশ্যি একটু ঘাবড়ে যেতে হয়, কিন্তু কায়দা-কানুন রপ্ত হয়ে গেলে দেখবেন, আর কোন মুশকিল নেই, দেখবেন ব্যাপারটা একেবারে জলবৎ হয়ে গিয়েছে। তবে ব্যবস্থাটা একটু বোঝা দরকার।"

ফটোগ্রাফার বিশু পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সুনীলের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ফোড়ন কাটলে, "যা বলেছিস্ মাইরি। আমার এক বৌদি একবার বায়না ধরলে, সাহেবের দোকান থেকে পাউডার পমেটম কিনে দিতে হবে। দাদা মেয়েছেলের কথায় নেচে হোয়াইটওয়ে লেডলতে ঢুকে পড়লে। কত বারণ

করলুম, শুনলে না। তারপর মাইরি, মহা কেলেঙ্কারি। দাদা থরে থরে জিনিসপত্র সাজানো দেখেই ভিরমি খেয়ে গেছল। খোঁজাখুঁজি করে হাল্লাক। নিজের জিনিস আর পায় না। তখন এক মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস করলে, 'টয়লেট হোয়ার?' মেমসাহেব বললে, 'উধর, লেফট'। দাদা সেইদিকে একটু এগুতেই দেখলে, দরজার গায়ে সাইনবোর্ড সাঁটা—টয়লেট। বাঁদিকে ফর জেণ্টস্ আর ডানদিকে ফর লেডিজ্। ইউরেকা বলে দাদা বুক চিতিয়ে যেই ফর লেডিজে ঢুকেছে আর শালা হৈ হৈ। দাদা দু-হাতে চোখ ঢেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পিছনে গোটা চারেক মেমসাহেব। 'স্কাউণ্ড্রেল', 'বদমাস', 'পাকড়ো'। শেষে দাদা অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বাড়ি গেল।"

সুনীল বলল, "জেলে যে দেয়নি, এই যথেষ্ট।"

সুনীত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কেন, জেলে দেবে কেন? টয়লেট কেনা কি বে-আইনি?"

সুনীল হতভম্ব হয়ে বিশুর মুখের দিকে চাইল।

বিশু বললে, "টয়লেট কেনা বে-আইনি নয়, লেডিজ টয়লেটে ঢোকা বে-আইনি।"

"কেন?"

"এর আবার কেন কি রে? ওখানে—" বাকীটা বিশু সুনীতের কানে কানে বলে দিলে। "খবরদার ও জায়গায় ঢুকো না।"

সুনীত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ইস্! খুব বেঁচে গিয়েছি। এতদিনে মানেটা বুঝলাম। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসেও টয়লেট লেখা থাকে। আমি ভাবতাম, মেয়েরা ওখানে ঢুকে রুজ লিপস্টিক মাখে বুঝি।"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমি বলছিলাম", সুনীল বলল, "ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের অ্যারেঞ্জমেণ্টটা জানা দরকার। ডিকশনারির যেমন অ্যালফাবেট্, এর তেমনি কমোডিটি, আপনি যখন যাবেন—"

"দেখুন, আপনি ভুল করছেন। আমি—"

সুনীল এই কথায় খেপে গেল।

"দেখুন মশাই, আমাকে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর চেনাবেন না।"

"আহা আমি তা বলিনি।"

"দেখুন মশাই, আপনি কি বলেননি, সেটা আমার শোনার দরকার নেই, কি বলবেন তাই বলুন।"

"তাইতো বলতে চাইছি।"

"না, আপনি যা বলেননি, তখন থেকে তাইতো বলছেন্।"

"না।"

"হ্যাঁ।"

"না।"

"হ্যাঁ।"

"আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করতে চাইছি। (সুনীত আর দমও নিল না) আমি বলতে চাইছি, বাঙ্গালীদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল। ধুতি পাঞ্জাবী পরার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার না করার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি কি বলতে চান যে, শার্লক হোমস্ নামে কোন লোক ছিল ইংরেজ জাতের মধ্যে, তাই অত ভালো ডিটেকটিভ গল্প লেখা হয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে?"

"আমি মোটামুটি অবিশ্যি তাই বলতে চেয়েছি।"

সুনীলকে থামিয়ে সুনীত বলে চলল, "এ অত্যন্ত ভুল থিয়োরী। শার্লক হোমস্ বলে কোন লোক ছিল না। চরিত্রটি একেবারে কাল্পনিক।"

"শার্লক হেমস্ নামটা কাল্পনিক, তবে মানুষটা আসল। আর এও জেনে রাখ, তোমাদের এই ব্রজদাই সেই শার্লক হোমস্।"

আমাদের সংবিৎ ফিরে আসতে দেরি আছে দেখে ব্রজদা যদুদার কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

কোনান ডয়েলের সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়, (ব্রজদা বলতে শুরু করলেন) ছোকরা তখনও লিখতে শুরু করেনি। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে, ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিকেল কোরে চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে। এখানে মানে অবিভক্ত ইণ্ডিয়ায়। আমাকে একটা বিশেষ কাজে তখন ওয়াজিরিস্তানে থাকতে হয়েছিল। ঠিক ওয়াজিরিস্তান নয়, তার গায়েই। জায়গাটার নাম ফিকিরিস্তান। সেখানেই ছোকরার সঙ্গে আলাপ হয়।

আমি তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সির এমন এক জায়গায় বাস করছি, যার উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক দাবা খেলা পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি লোকের হাঁ কি না-এর উপর তখন বড় বড় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেই লোকটির নাম মীর মালিক পীর খওয়াব খান। ওয়াজিরিস্তানের উত্তর পশ্চিমে মাত্র সাতান্ন বর্গ মাইল ভূমি—এই ফিকিরিস্তানের মালিক ছিল এই দুর্ধর্ষ সর্দারটি। ওকে দলে টানাই ছিল সকলের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সূত্রেই আমি বড়লাটের রিকোয়েস্টে ঐ পাণ্ডববর্জিত দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আর কী দেশ! যেমন তার মাটি রুক্ষ, তেমনি তার লোকগুলো কাঠখোট্টা। ঘোড়া আর রাইফেল, এ হল গে ওদের প্রাণের চাইতেও দামী। আমি সেখানে গিয়ে একটা রাইফেল শুটিংএর ক্লাব খুলে ফেললুম। এই যে আজ ওয়ার্লডে (ব্রজদা একটু থেমে আবার শুরু করলেন) রাইফেল শুটিং-এর এত ধুম পড়ে গিয়েছে, এ কার জন্য? এই লোকটির জন্য। ব্রজদা নিজের বুকেই হাত ঠেকালেন। রাইফেল ক্লাবের গোড়াপত্তনটি ওখানেই করলুম।



সত্যিই আমি দুঃখিত ওয়াটসন

ব্যস্, দুদিন যেতে না যেতেই আমি সেখানে মোস্ট পপুলার ফিগার। মীর মালিক পীর খওয়াব খানের একেবারে দিল-জানের দোস্ত বনে গেলুম। দোস্ত আমাকে ওর বাড়ির প্রাইভেট টিউটার করে নিলে। ওর ছেলেমেয়েদের আমি রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতে লেগে গেলুম!

মীর মালিকের রাজ্যে স্টেট গেস্ট হয়ে বেস্ট হোটেলে তোফা আরামে দিন কাটাচ্ছি আর বৈদেশিক এজেণ্টদের নাড়িনক্ষত্রের খবর যোগাড় করছি। আমি পাঞ্জাবী মুসলমানের ছদ্মবেশ ধরেছিলাম। নাম নিয়েছিলাম খান সাহেব গর্দান মর্দান খান।

হোটেলের লাউঞ্জে একদিন বসে আছি, এমন সময় এক বৃটিশ ছোকরা ঢুকল।

মুচকি হেসে বললুম, "মর্নিং, ডাক্তার কোনান ডয়েল। যাত্রাপথ নির্বিঘ্নে কেটেছে, আশা করি।"

দেখলুম, ছোকরা বিমূঢ় হয়ে গেল।

আমতা আমতা করে বলল, "সরি, তুমি ভুল করেছ মিঃ—, আমার নাম তো কোনান ডয়েল নয়।"

"তাই নাকি." আমি যেন ক্ষমা চাইছি, এমনিভাবে জবাব দিলাম, "তাহলে আমি সত্যিই দুঃখিত ডাক্তার ওয়াটসন।"

এইবার সাহেবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল।

ফিসফিস্ করে বললে, "হু আর য়ু?"

বললুম, "মাই বডি ইজ এ ব্রিটিশ সাবজেক্ট, বাট মাই আত্মাটি ভারতমাতার চারণ। হেইল মাদার, আই ওয়ারশিপ্ দী।"

বন্দে মাতরমের ইংরাজি শুনেই তো সাহেবের চোখ ট্যারা হয়ে গেল।

বললুম, "ডাক্তার মাভৈঃ! বস এখানে। চা খাও। দুটো সুখ-দুঃখের কথা শুনি।"

সাহেব খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বসল। তারপর আর বেশি পেঁয়াজি করল না।

সরাসরি প্রশ্ন করল, "তুমি তো আমাকে কখনও দেখনি, তবে আমায় চিনলে কি করে?"

বললুম, "এলিমেণ্টারি, ডাক্তার কোনা— থুড়ি, ডাক্তার ওয়াটসন, এলিমেণ্টারি। তুমি রোগ চেন কি করে?"

সাহেব খুশি হয়ে বললে, "কোয়াইট্, ইণ্টারেস্টিং।"

আমি বললুম, "হোটেলে নিউ অ্যারাইভালের লিষ্টিটা দেখা আমার অভ্যেস। কাল রাত্রে এখানে একজন মাত্র অতিথিই এসেছেন। ডাক্তার ওয়াটসনকে সেখানেই পেলাম। তারপর ডিডাকশনের মাধ্যমে পেলাম কোনান ডয়েলকে।

সিম্‌পল্‌ অব্‌জারভেশন।"

"বাই জিঙ্গো", ছোকরা লাফিয়ে উঠল, "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এমন লোককে পেলে লুফে নিত!"

"তিন তিন বার অফার এসে গিয়েছে," আমি শান্তভাবে বললাম, "ব্ল্যাঙ্ক চেকে মাইনে দিতে চেয়েছে হোম ডিপার্টমেণ্ট। কিন্তু পরের গোলামি তো করব না ভাই। বেকার ষ্ট্রীটের স্থায়ী ঠিকানায় থাকি, সেও ভাল।"

"নাউ নাউ, এবার তো আপনাকে চিনে ফেলেছি। আপনিই তাহলে সেই কুখ্যাত গুণ্ডা—"

"হুজুলাম ডেস্‌পেরেডো", (আমি জুগিয়ে দিলাম)।

"দমনকারী বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রাইভেট ডিকেট্‌টিভ্‌—"

"ব্রজরাজ কারফর্মা," ফিসফিস করে বললাম, তারপর একটু জোরে, "ওরফে খান সাহেব গর্দান মর্দান খান, রাইফেল কোচ অব্‌ হিজ হাইনেস্‌ মীর মালিক পীর খওয়াব খান্‌স্‌ রয়্যাল ফ্যামিলি।"

"মাই লা—"

"মিস্‌ জিঞ্জার এল-ও আমার ছাত্রী।"

"ও! তাও তুমি জান। হাউ ডু ইউ নো?"

"এলিমেণ্টারি, ডাক্তার ওয়াটসন, এলিমেণ্টারি।"

ছোকরা বিস্ময়ে ভেঙেই পড়বে যেন। শান্ত করবার দাওয়াই দেবার জন্য ওকে ড্রিংকস্‌ দিতে বললাম।

তারপর শুরু করলাম, "যদি দেখা যায়, লাহোরের মত সিভিলাইজ্‌ড্‌ জায়গা ছেড়ে, বাপ-মা আত্মীয়-পরিজনকে ছেড়ে কোন সুন্দরী, শিক্ষিতা, কালচার্‌ড্‌ মেয়ে ওয়াজিরিস্তানের মত দুর্গম জায়গায় এসে চাকরী নেয়, তারপর যেদিন সেখানে লাহোর থেকে একটি যুবক ডাক্তার এসে পৌঁছায়, অমনি মেয়েটি ফিকিরিস্তানের হারেমে এসে চাকরী নেয়, তাহলে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইট্‌ ইজ্‌ এ প্লেন অ্যাণ্ড সিম্‌পল্‌ গেম্‌ অব্‌ লুকোচুরি। অর্থাৎ একটি মেয়ে প্রাণপণ পালাতে চাইছে, এবং একটি ছেলে তাকে ধরতে চাইছে। এমন কি মরীয়া হয়ে সে ছদ্মবেশও ধরেছে। এখন একটি প্রশ্নই ওঠা উচিত ডাঃ ওয়াট্‌সন্‌, (বৎস, এখন থেকে তোমাকে ওয়াট্‌সনই বলব) হোয়াই?"

"হয়ত ছেলেটি," ছোকরা তিক্তভাবে বলল, "মেয়েটিকে খুন করতে চায়।"

"ঠিক বলেছ ওয়াট্‌সন, তোমার বুদ্ধির তারিফ করি। শুধু একটি ছোট্ট জিনিস তোমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। তোমার দোষ নেই। মিস্‌ এলের নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানা যে সরম-রাঙা হয়ে উঠেছিল, নিজের মুখ তোমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় বলেই সেটা বুঝতে পারনি। খুনীরা এমন

কথায় কথায় ব্লাশ করে না।"

আমার কথা শুনে ছোকরা চুল ছিঁড়তে শুরু করল।

"মিস্‌আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, সেরেফ ভুল বোঝাবুঝি, মাই ডিয়ার ব্রজদা, ডু য়ু মাইণ্ড, তোমাকে যদি ব্রজদা বলি?"

"সার্টেনলি নট্।"

"ব্রজদা, সেরেফ ভুল বোঝাবুঝিতে এই কেলেঙ্কারি। কুক্ষণে ঠাট্টার ছলে বলেছিলাম, পোগির ব্যবহার অনেক ভাল। ও ডব্‌ল ডিলিং জানে না। ব্যস্, এই দেখুন তার পরিণতি।"

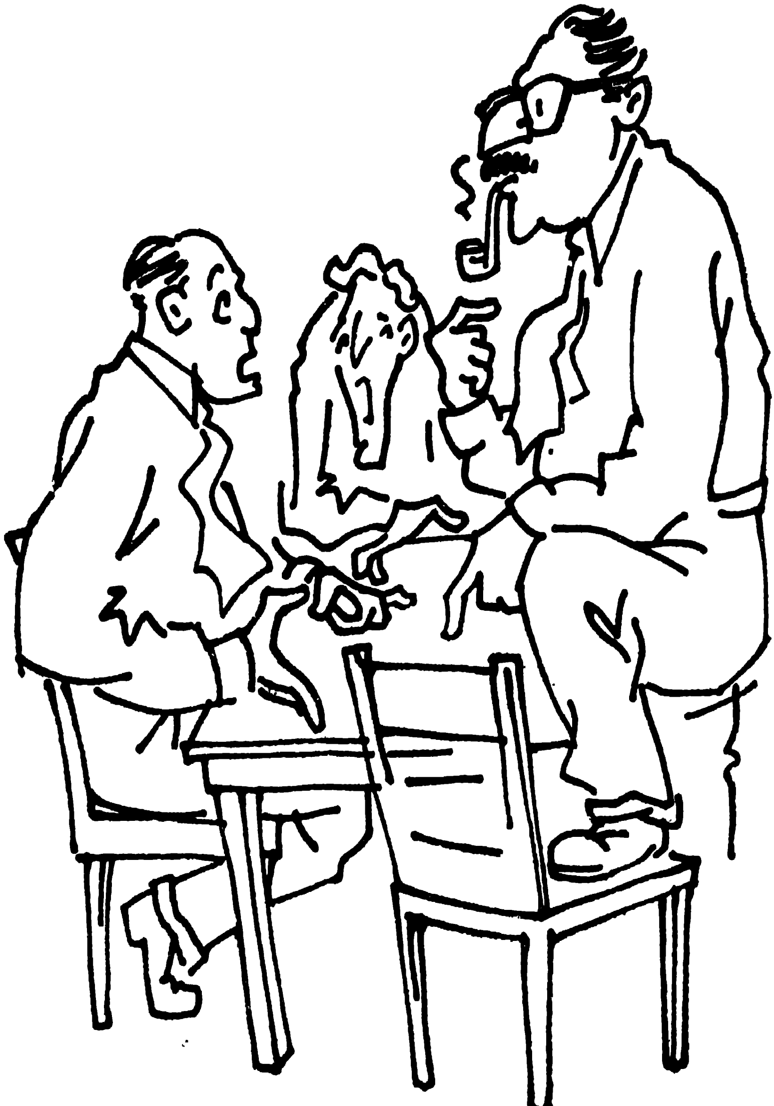
"বুঝেছি মাই ডিয়ার ওয়াটসন, বুঝেছি। মিস্ এল্ এখনও পর্যন্ত তোমার উপর বেজায় চটে আছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে এনিমি কাণ্ট্রির এক ধূর্ত এজেণ্ট ওকে বাগিয়ে ফেলেছে প্রায়।"

"হোয়াট্! কি বললে তুমি!" ছোকরা রাগে ঠক ঠক করতে লাগল। "ফ্রেলটি, দাই নেম্ ইজ্ য়োম্যান্।"

"ধীরে, বৎস ধীরে।" বললুম, "মাথা গরম করো না। ঠাণ্ডা হয়ে বস। এক কাপ লেমন চা খাও। বায়ুটা কিঞ্চিৎ কমবে। তারপর মন দিয়ে আমার কথা শোন। প্রথমেই জেনে রাখ, মেয়েদের কথায় রাগ করতে নেই। ওরা হচ্ছে ফ্রিক্ অব্ নেচার। ভগবানের আজব বনাওট্। সাচ্চা জিনিসের কদর বোঝে না। ঝুটো মালের আদর করে। এখানে এনিমি কাণ্ট্রির একটা ধুরন্ধর এজেণ্ট আছে। সে মিস্ এলের উপর ভর করেছে। নিদারুণ এক ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেছে ওকে। ওরা মীর মালিকের একটা গোপন দলিল মিস্ এল্-কে দিয়ে চুরি করাচ্ছে। ঐ দলিল যার কব্জায় থাকবে মীর মালিক তার গোলাম হতে বাধ্য হবে।

"পরশু দিন মিস্ এল্ দলিল চুরি করে ওয়াজিরিস্তানে চলে যাবে। কানা ফকিরের সরাইখানার দোতালায় ওর জন্য ঘর রিজার্ভ করা রয়েছে। তার পাশের ঘরটাই আমার। এজেণ্টটা একটা জঘন্য ফন্দী এঁটেছে। কয়েকজন হানাদার ভাড়া করেছে। তাদের দিয়ে মিস্ এল্-কে লুঠ করাবে। তারপর দলিলটা নিয়ে মিস্ এল্-কে সেই পিশাচদের হাতে ছেড়ে দেবে, যাতে তার কুকর্মের একমাত্র সাক্ষীও মুছে যায়।

"এখন প্রশ্ন করতে পার, এত কথা আমি জানলুম কি করে? এনিমি কাণ্ট্রির ঐ এজেণ্ট ব্যাটার পায়ের ছাপ আমি একদিন মিস্ এলের বসবার ঘরের কার্পেটের উপর পাই। তারপর খুব কায়দা করে মিস্ এল্-কে রাইফেল চালনা শিক্ষা দিতে থাকি। একদিন রাইফেলের বাঁট থেকে মিস্ এলের আঙুলের ছাপ তুলে নিয়ে দুইয়ে দুইয়ে যোগ করতেই ষড়যন্ত্রটা আমার চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। সেই আঙুলের ছাপ থেকে আমি তোমার



হোয়াট!

পরিচয়ও পেয়ে গেলাম। কোনক্রমে একবার পরিষ্কার একটা আঙ্গুলের ছাপ পেয়ে গেলে ঝানু গোয়েন্দাদের আর ভাবনা থাকে কি? সেই সূত্র ধরেই পটাপট সব রহস্য জল করে ফেলে।"

ছোকরা "ব্রজদা, ব্রজদা, তুমি" বলে বুড়বুড়ি কাটতে লাগল।

বললুম, "এখন আমড়াগাছি রাখ। আমি জানতে পেরেছি মিস্ এল্-কে হত্যা করা হবে।"

"হা ঈশ্বর—" ছোকরা কঁকিয়ে উঠল। "এখন উপায়!"

"মিস্ এল্-কে এবং দলিলটাকে উদ্ধার করা।" একটু থেমে আমি বললাম, "তুমি এখন সিধে বেরিয়ে যাও। কানা ফকিরের সরাইতে গিয়ে নিচের তলায় একখানা ঘর নাও গে। তারপর আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। কোনও রকম উস্কানিতেও মাথা গরম করবে না। মনে রেখো, তোমার সামান্য ভুলে সাংঘাতিক কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারে। তখন অনুশোচনা ছাড়া পথ থাকবে না!"

ছোকরা সেইদিনই চলে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে আমিও। সন্ধ্যের অন্ধকারে আমি পৌঁছুলাম। ঘণ্টাখানেক আগে মিস্ জিঞ্জার এল্ও এসে পৌঁছে গিয়েছে।

ভোররাত্রেই একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। হানাদারেরা দুমদাম রাইফেলের আওয়াজ করে সরাইটা আক্রমণ করল। আমি তেমন গা লাগাইনি। তারপর পাশের ঘরে হুটোপাটি শুরু হল। মিস্ এলের আর্ত চীৎকার কানে এল। টের পেলুম ওকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেল। আশঙ্কা করছিলুম, মিস্ এলের চীৎকার শুনে ছোকরাটা না বেরিয়ে পড়ে। না, সে কথা রাখল।

আমি চট করে উইণ্চেস্টার রিপিটারটা বগলদাবা করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সেই আবছা অন্ধকারে দেখলুম, চারটে ভাড়াটে উপজাতি গুণ্ডা মিস্ এল্-কে টেনে হিঁচড়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে। একটু দূরেই ওদের ঘোড়াগুলো বাঁধা। মতলবটা বুঝে ফেললাম। ঘোড়ায় ওরা একবার উঠতে পারলে, ওদের ধরা আমার পক্ষেও কষ্টসাধ্য হত।

তাই আমি প্রথমেই ওদের ঘোড়াগুলোকে কাত করলুম। তারপর ওরা কিছু বোঝার আগেই তিনজন মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ল। এ জীবনে আর উঠবার সাধ্য রইল না। গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ম্যাগাজিনে গুলি পুরতে যা দেরি। ওর মধ্যেই বাকি লোকটা আমার ভবলীলা প্রায় সাঙ্গ করে এনেছিল আর কি! ওর একটা গুলি আমার খুলিটা টাচ্ করে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা বাঁ হাতের অনামিকায় অষ্টধাতুর আংটিতে বাধা পেয়ে ছিটকে পড়ল। কিন্তু তৃতীয় গুলিটা সোজা এসে বাঁদিকের বুকে একেবারে হার্টে লাগল। আমার সর্বশরীর কেঁপে উঠল। চক্ষে অন্ধকার। টলে পড়ে গেলাম। যা হোক,

রেলিংটা ধরে কোনমতে সামলে নিলাম। ভাগ্যিস্ বুকপকেটে একটা বুলেট-প্রুফ সিগারেট-কেস ছিল, স্টেইনলেস স্টীলের, অবশ্যি এ সব ক্ষেত্রে সব বড় বড় গোয়েন্দার কাছেই এমারজেন্সির জন্য এসব জিনিস থাকেই, তাই বাঁচোয়া, নইলে সেখানেই অক্কা পেয়ে যেতুম সেদিন।

উঠে দাঁড়িয়েই খুব ক্লোজ দিয়ে দুটি গুলি চালিয়ে দিলুম। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি, ব্যাটা শয়তান বিপদ দেখে মেয়েটাকে নিজের সামনে ঢালের মত ধরে রেখেছে। আমি মুস্কিলে পড়লাম। একটা গুলি সেই হানাদারের হাতে গিয়ে লাগল। রাইফেলটা ছিটকে পড়ল তার হাত থেকে। দ্যাখ্, বৃথাই তোদের ব্রজদাকে বিশ্বের রাইফেল-সুটাররা গুরু বলে মানে না।

রাইফেলটা পড়ে যেতেই দুর্বৃত্তটা ক্ষেপে উঠল। মেয়েটাকে চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে ফস করে একটা ছোরা বার করল। ওর মতলব বুঝতে পেরে আমি রেলিং টপকে কার্ণিসে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোকটার থেকে একটু দূরে একটা স্টীম-রোলার পড়েছিল রাস্তায়। অনেকক্ষণ ধরে তার পজিশনটা লক্ষ্য করছিলুম। কারণ সামনাসামনি লোকটাকে গুলি মারার উপায় নেই, মেয়েটা মরবে। এখান থেকে অন্যদিকে সরে গিয়ে পজিশন নেবার উপায় নেই, মেয়েটার বুকে ততক্ষণে আততায়ীর ছোরা ঢুকে যাবে। একেবারে উভয় সংকট।"

ব্রজদা এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন।

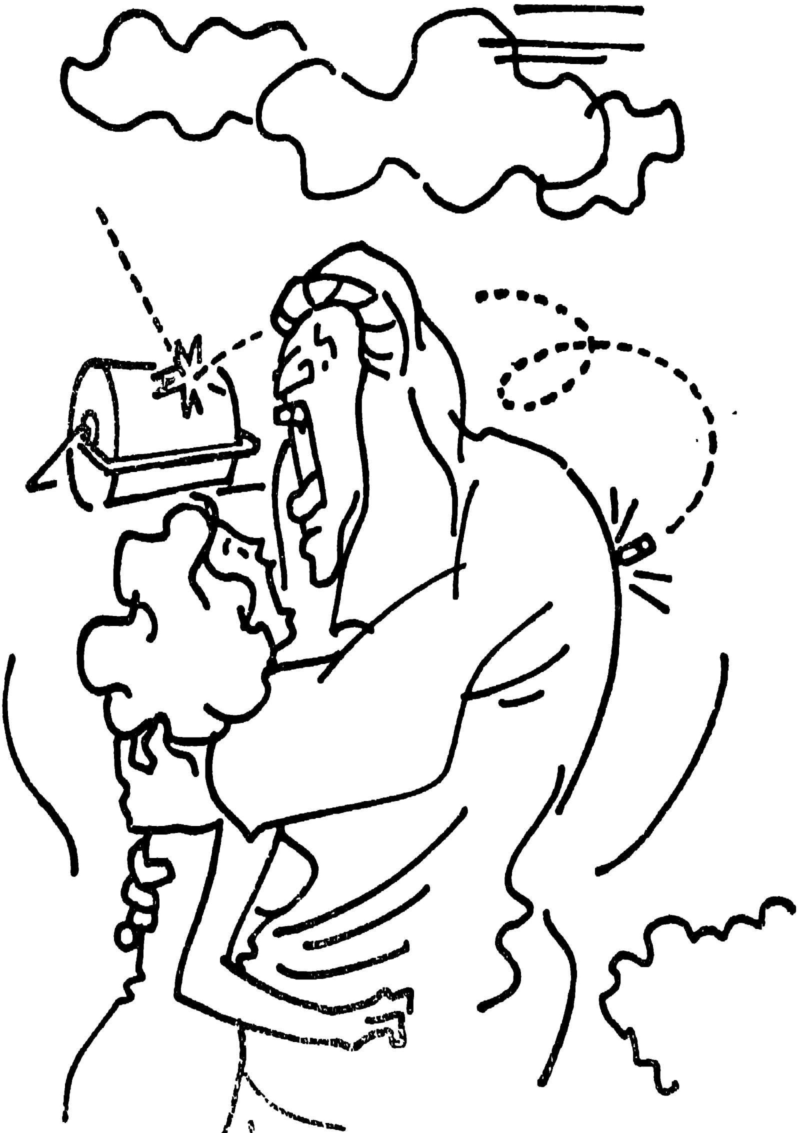
"তারপর কী হল ব্রজদা?" সুনীত প্রায় চেঁচিয়েই উঠল।

"মেয়েটা একটুর জন্য বেঁচে গেল," সুখটানটা দিয়ে ব্রজদা বললেন, "ঐ রোড-রোলারটার জন্য।"

"কেমন করে?"

"আমি", ব্রজদা বললেন, "এক হাতে রেলিং ধরে, কার্ণিসের উপর ঝুঁকে পড়ে অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিয়ে রোলারের গায়ে গুলি ছুঁড়লাম। রিবাউন্ড করে গুলিটা ওর পিঠের দিক থেকে একেবারে হার্টে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে খতম। ইস্কুলে ক্যারামে চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। যে-কোন অ্যাঙ্গেল থেকে টাংকি মেরে যে-কোন পকেটে ঘুঁটি ফেলতে পারতাম। দেখলাম বিদ্যেটা ভুলে যাইনি।"

একটু দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "তারপরের ঘটনাটা একেবারে ইজি। ইংরেজি সিনেমায় দি এন্ডের আগে যা যা ঘটে, এমন কি সেন্সর বোর্ড যে-সব জায়গায় কাঁচি চালায়, অবিকল তাই ঘটল। ছোকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ও জিঞ্জু, ফরগিভ মি, মেয়েটা ফোঁস ফোঁস করে বললে, ও আর্থার,



একেই বলে টাংকি মার

ফরগিভ মি।

"যাবার আগে কোনান-ডয়েল বলে গেল, আমার কীর্তিকাহিনী সব লিখে প্রকাশ করবে। করলও তাই। আমার নামটা শুধু পাল্টে দিলে। বইয়ের হিরো ইংরেজ না হলে বিলেতে বই কাটানো শক্ত। তাই আমার নাম দিলে শার্লক হোম্‌স্‌। কথাকে কথা অবিকল বসিয়ে দিয়েছে, এমন কি ঐ যে বলেছিলুম বেকার থাকব, অমনি বেকার স্ট্রীটের বাসিন্দা করে দিয়েছে। এই হল তোদের শার্লক হোম্‌সের জন্ম-বৃত্তান্ত। অরিজিন্যালি হোম্‌স্‌ তোদের এই কোঁচা-দোলানো ভেতো বাঙ্গালীই, বুঝলি সুনীল। বেশি তড়পাসনি।"

একাদশ গল্প

"আরে রাখুন মশাই দীঘা," সুনীল টাইপ রাইটারের ফুলিস্টপের চাবিতে ঠকাস করে এক গুঁতো মারল, হ্যাঁচকা টানে টাইপ-করা কাগজটা খুলে নিল। বেয়ারাকে হাঁক পাড়ল, "ভানু, পিন লাগিয়ে রিপোর্টটা বড়দার হাতে দিয়ে দে। এক গ্লাস জল দিস। ওফ্।"

"কিন্তু দীঘার খুব পসিবিলিটি আছে। সমুদ্রের ধারে এত কাছে একটা হেলথ রিসর্ট, বুঝলেন না—" সুনীত বিপন্নভাবে আবেদন জানাল।

"ঐ আপনাদের এক কথা মশাই, হেলথ। কথায় কথায় হেলথ নিয়ে টানাটানি করেন কেন, বলুন তো! রাবিশ।" সুনীল কটর কটর শব্দ করে মেশিনে নতুন কাগজ পরাতে লাগল।

সুনীত বলল, "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। বুঝলেন। এই দেখুন না, আমার পেটের ট্রাবলটা যদি না থাকত, তবে কি আমি এই এখানে পড়ে থাকতাম। মিলিটারিতে জয়েন করতাম মশাই। আর্মি কি নেভি কি এয়ারফোর্সে। কিংবা হয়ত দেখতেন, মহাকাশ যানের পাইলট হয়ে এতদিন গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে গোঁত্তা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"থামুন মশাই," সুনীল খেঁকিয়ে উঠল, "বাঙ্গালী হয়ে চাঁদে হাত! বাঙ্গালীদের মহাশূন্যের দৌড় কতদূর পর্যন্ত জানেন?"

একটু দম নিয়ে সুনীল বলল, "ঐ তের-তলা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসের চিলেকোঠা। অর্থাৎ নিউ সেক্রেটারিয়েটের যিনি কেয়ারটেকার, তিনিই আমাদের গাগারিন। একমাত্র বাঙ্গালী মহাকাশচারী।"

"তোদের নিউ সেক্রেটারিয়েটের কেয়ারটেকার কে, তা আমি জানিনে! তবে এটা হলপ করে বলতে পারি, একমাত্র বাঙ্গালী ব্যোমচারী তিনি নন।"

চেয়ে দেখি ব্রজদা।

"ব্রজরাজ কারফর্মাই পৃথিবীর প্রথম অ্যাস্ট্রোনাট, তিনিই আদিম এবং অকৃত্রিম ব্যোমবাজ।" ব্রজদা বললেন, "অবিশ্যি মুনি-ঋষিদের কথা আমি ধরছিনে। আমি আধুনিক যুগের কথাই বলছি।"

"আপনিই প্রথম স্পেস ট্রাভেল করেছেন!" (সুনীত ঘোষের চোখ দুটো

ভাঁটার মত গোল হয়ে উঠল) "গাগারিনেরও আগে!" (চোখ দুটো কপালে গিয়ে ঠকাস করে ঠোক্কর খেল) "ই হ্‌হ্‌ হ্‌!" (একটা হেঁচকি তুলেই সুনীত সিঁটিয়ে গেল)

"কি হল, খাবি খাচ্ছিস কেন?" ব্রজদা শীতল কণ্ঠে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না না-কি?"

"না না ব্রজদা, অবিশ্বাস নয়," আর্তকণ্ঠে সুনীত বলে উঠল, "অ্যামিবাইসিস। একটু উত্তেজনা হলেই খামচি মেরে ওঠে।"

ব্রজদা ধাতস্থ হলেন। সস্নেহে বললেন, "খুবই ছ্যাঁচড়া রোগ নিতু, অল্পে অল্পেই সারিয়ে ফেল। ওটা শুচিবাইসিসে দাঁড়িয়ে গেলেই মরেছ। ডাক্তার বেটে খেলেও তখন আর নিস্তার পাবে না। হুম্‌।"

সুনীল জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ব্রজদা?"

ব্রজদা যেন সাংবাদিক বৈঠকে জবাব দিচ্ছেন : "প্রথমবার ইউরেনাস, দ্বিতীয়বার নেপচুন, তৃতীয়বার প্লুটো।"

"তিন তিন বার! গুড হেভেনস্‌।" সুনীল আর আওয়াজ করল না।

সুনীত জিজ্ঞাসা করল, "কিভাবে গিয়েছিলেন?"

"খাঁটি ভারতীয় পদ্ধতিতে। মুনি-ঋষিরা যে পদ্ধতিতে হামেশাই স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ঘুর ঘুর করে বেড়াতেন।"

"বুঝেছি," সুনীত বলে উঠল, "পুষ্পক রথে—"

"জেনেছিস তো ঐ এক পুষ্পক রথ," ব্রজদা বিরক্ত হলেন। "সাধে কি আর অল্প বিদ্যে ভয়ংকরী বলে। মুখ খোলার আগে প্রাচীন ভারতের হিস্ট্রিটা একটু উল্টে দেখিস। পুষ্পক রথ হল গে তোর ভাইকাউণ্ট বিমান। ওগুলো ইণ্টারন্যাল সার্ভিসেই ব্যবহার করা হত। ব্যোমবাজিতে ভারতীয় সাধকেরা আরও হাইয়ার টেকনিক গ্রহণ করেছিলেন। সেসব অতি সূক্ষ্ম কারিকুরি। তোদের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। আমিও সেই পদ্ধতিতেই ভ্রমণ করেছি।"

একটু থেমে ব্রজদা বললেন, "তোদের পাশ্চাত্ত্যের মুরোদ তো দেখছি। যেমন তোর রাশিয়া, তেমনি তোর আমেরিকা। একটা কানা আর একটা চোখে দেখে না। কোটি কোটি টাকার ছেরাদ্দ করে হাউই উড়িয়ে দরজার কাছে ল্যাজ নাড়ছে। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর মায়াই কাটাতে পারলে না। আবার তারই রোয়াব কত! তোদের পাশ্চাত্ত্যের যা হাইয়ার টেকনিক, ও তো আমাদের মুনি-ঋষিদের আশ্রমের বুনিয়াদী কেলাসের প্রাইমারি কোর্স রে। কারা বড় কারা ছোট তা বোঝা যায় দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য দেখে। সাহেবরা যে হাউই নিয়ে বিজ্ঞানের বড়াই করছে, সেই হাউই আমাদের ছেলেদের হাতের খেলনা, তার বেশি কিছু নয়। আমাদের নাগাল পেতে পাশ্চাত্ত্যের এখনও অনেক দেরি।"



সেরেফ যোগবলে

"আপনি নেপচুনে গিয়েছিলেন কিভাবে?"

"যেভাবে প্রথমবার ইউরেনাসে গিয়েছিলাম, সেইভাবে।" ব্রজদার শান্ত জবাবে সুনীল থতমত খেয়ে গেল।

ব্রজদা পরক্ষণেই বললেন, "সেরেফ যোগবলে। মুনি-ঋষিরা এইভাবেই ঊর্ধ্ব মার্গে বিচরণ করতেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। পরের চাকরি তো আর করতে হত না, তাই ছুটি ফুরিয়ে গেলে মাইনে কাটা যাবার ভয় তাঁদের ছিল না। সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল-ফুলের ধারও ধারতেন না। তাই নিম্নমার্গে অবতরণের জন্য কোনও মাথা-ব্যথাও ছিল না। তার কোন পথ বাতলাবার কথাও তাঁরা ভাবেননি। ওঁদের ছিল ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক—ঊর্ধ্ব থেকে তদূর্ধ্ব মার্গে ওঠা। কিন্তু আমি বাবা ছা-পোষা মানুষ। তদুপরি তোদের বউদি আছেন। কাজেই আমাকে তো বাবা ঐ ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আমাকে উঠতেও হবে, নামতেও হবে। এই দুটো সাইডের সমস্যা নিয়েই আমাকে ভাবতে হয়েছে। তার সমাধানও বের করতে হয়েছে।

"দীর্ঘদিন ধরে রিসার্চ করে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত সাধনার ছিন্ন সূত্রগুলি এক এক করে আবিষ্কার করে, সেগুলো যাচাই বাছাই করে, নূতন করে জুড়ে যোগ-সাধনার পূর্ণ অবয়বটা প্রথমে তৈরি করে ফেললাম। আমি তো আহ্লাদে আটখানা। আর কি, মার দিয়া, এখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তো আমার হাতের মুঠোয়। পা বাড়ালেই হয়।

"তারপর একদিন পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে গুরুর নাম স্মরণ করে লোটা-কম্বল নিয়ে ব্যোমযাত্রায় বেরুতে যাব, এমন সময় তোর বউদি বললে, হ্যাঁগা, বেরুচ্ছ তো, ফিরবে কবে? এক একটা কথা, এক এক সময় এমনভাবে মনে এসে লাগে যে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়। জানিস তো 'বেলা যায়' কথাটায় কি কাণ্ডই না ঘটে গেল। লালাবাবুকে স্রেফ বিবাগী করে ছেড়ে দিলে। ঠিক তেমনি তোর বউদির ঐ ছোট্ট একটা কথা 'ফিরবে কবে' আমার বুকে গদাম করে এসে ধাক্কা মারল। সেই প্রথম মনে হল, আরে তাইতো, ফেরার কথাটা তো ভেবে দেখিনি। সর্বনাশ, অফিসে কুল্লে বারো দিন মেডিকেল লীভ্ পাওনা। না ফিরলে তো উইদাউট পে হয়ে যাব।

"কী নিদারুণ সমস্যা দেখা দিল, বুঝে দ্যাখ। এতদিন সব কথা ভুলে শুধু যোগ-সাধনাই করেছি, ঊর্ধ্ব মার্গের কথাটাই তখন মনে ছিল শুধু। ফিরতে যে হবে, সে খেয়ালই ছিল না।

"তোর বউদি চোখ খুলে দেওয়াতে বুঝলাম, সাধনা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। এখনও ফেরার সাধনা বাকি আছে। যা হোক, এতদূর যখন এগিয়েছি তখন তো আর পিছু হটা যায় না। আর, কোনও কাজ আরম্ভ করে, শেষ না

করা কারফর্মাদের ধাতে যে নেই, তা বোধ হয় জানিস।

"ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করে মেডিকেল লীভ পুরো নিয়ে নিলাম। তারপর একাগ্রচিত্তে সাধনার জন্য কাছে-পিঠের এক বনে চলে গেলাম।"

ব্রজদা একটু থামতেই সুনীল বললে, "দার্জিলিং গেলেন বুঝি!"

"দূর", ব্রজদা হাসলেন, "অত দূরে যাব, পয়সা কই। ধুবুলের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট যে বনটা তৈরি করছে, ওরই একটা কচি গাছের তলায় আসন নিয়ে পঞ্চতপা হয়ে বসলাম। ব্যস, সাতদিনের মধ্যেই ফিরে আসার সাধনা রপ্ত হয়ে গেল, বেশ করে ট্রায়াল-ফ্রায়াল দিয়ে ভুল-ভ্রান্তিগুলো দূর-টুর করে, আটদিনের মাথায় যোগবলে যাত্রা করলাম ইউরেনাসের দিকে; সেখানে পেঁাছে, একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই ছুটলাম নেপচুনে, তারপর প্লুটোয়। তারপর সেখান থেকে সটান নেমে এলাম ধুবুলের কচি ফরেস্টটায়, সেখান থেকে ট্রেনে করে বাড়ি। তোদের বলব কি, প্লুটোয় গিয়ে ফিরে আসতে আমার যে টাইম লেগেছে, তার চতুর্গুণ টাইম লেগেছে ধুবুলে থেকে বাড়ি ফিরতে। স্বাধীন ভারতে ট্রেনে চড়ার ধকলটা যে কী, তা তো তোরা জানিসই। রেল কোম্পানীর কী কেরামতি মাইরি! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট সফল হতে ভেবেছিলাম, যাক, ছোটখাট ছুটি-ছাটায় চেঞ্জে চলে যাব ইউরেনাস, নেপচুন কি প্লুটোয়; কিন্তু ধুবুলে পর্যন্ত ট্রেন-জার্নির কথা মনে পড়তেই সব উৎসাহ জল হয়ে যায়, তাই আর ও পথে পা মাড়াইনি।"

ব্রজদা উঠে পড়লেন।

সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ব্রজদা, যোগবলে তো উঠলেন, আর নামার কথাটা তো বললেন না। পৃথিবীতে নামলেন কি করে? কোন সাধনায়?"

ব্রজদা অতিশয় শান্তভাবে বলে উঠলেন, "কেন? বিয়োগবলে। যোগবলে যে ঊর্ধ্বমার্গে ওঠে, সে বিয়োগবলেই নিচে নামে। এই সাদা কথাটা বুঝতে পারলিনে। মুনি-ঋষিরা যোগ শিক্ষা দিয়েছেন, আর ব্রজ দিয়েছে বিয়োগ শিক্ষা। ভারতীয় সাধনায় এটাই তোদের ব্রজদার অবিনশ্বর কীর্তি।"

দ্বাদশ গল্প

সুনীতের স্বভাবটি অতি শান্ত। হৈ চৈ করতে তাকে কখনও দেখাই যায় না। এবং তা অকারণেও নয়। আমাদের অবয়বের ভূগোলে উদর নামক যে স্বাধীন রাজ্যটি আছে, তার আভ্যন্তরীণ গোলযোগে সুনীত সর্বদাই বিব্রত। অফিসের কাজটুকু সারার পর একদিনের জীবনে যতগুলো মুহূর্ত বর্তমান থাকে, তার প্রতিটি মুহূর্ত সুনীতকে ব্যয় করতে হয় এই আভ্যন্তরীণ সংকটে হস্তক্ষেপের জন্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেলের যেমন কঙ্গো, সুনীতের তেমন এই প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ পেট—আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির জটিলতায় কেউ কারোর চাইতে কম যায় না। আর সমাধানের উপায় যে কি তার চেহারা কেউ জানে না।

সেই কারণে সুনীত যে চিন্তিত, ভাবিত, পীড়িত, জর্জরিত তা আমরা জানতাম। কিন্তু আজ সুনীতকে দেখে মনে হল, সে চিন্তা-ভাবনার সব স্তর পার হয়ে বিমর্ষতার অতল খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। উঠবার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না। ওর মুখ চোখ অন্ধকার। ওর টাইপরাইটার হোঁচট খেতে খেতে এগুচ্ছে। এমন কি ওর সহকর্মী সুনীল যে নতুন এক টেরিলিন-টাচ্ড্ রেনওয়াটার পাইপ ট্রাউজার পরে এসেছে, পাশে বসে ঘন ঘন তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, সে সম্পর্কেও সুনীতের কোন কৌতূহল নেই। সে ভ্রূক্ষেপও করছে না।

সুনীলও খুব অবাক হল। সিগারেটে চাপা টান দিল।

"কি মশাই, হল কি আপনার? সকাল থেকে কথা নেই মুখে। চুপচাপ বসে আছেন? ব্যাপার কি?"

"আর কথা!" সুনীত হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। "এই কথাই আমাকে পাগলা করে ছেড়ে দেবে।" আবার এক দীর্ঘশ্বাস—ফোঁ ও ও ও স্। "আঃ, মানুষ যদি কথা বলতে না শিখত।"

"আরে বাপস্!" সুনীল এক সঙ্গে কথা আর ধোঁয়া ছাড়ল। "খুব ডীপ্ ব্যাপার মনে হচ্ছে। শুধু মাত্র পেটের ট্রাবলে তো এমন সংলাপ বের হবার কথা নয়। কি বলেন, যদুদা।"

যদুবাবু ঘাড় গুঁজে কলম চালাচ্ছিলেন। মুখ তুলে সুনীতের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে থাকলেন। তারপর নীরবে একটি সিগারেট ধরালেন।

আমি বললাম, "আমার সন্দেহ হচ্ছে এ গোলমাল ঠিক অন্ত্রের নয়, যেন হৃদ্‌যন্ত্রের।"

সুনীত বলল, "ঠিক ধরেছেন। আমি এবার গেলাম। গিয়েছি। আর আশা নেই। কথা, কথা, কথাই আমাকে খেয়েছে।" সুনীত একেবারে ভেঙেই পড়ছিল। টাইপরাইটার সামনে থাকায় এ যাত্রা সামলে গেল।

যদুদা ধীরভাবে বললেন, "যদি আপত্তি না থাকে, ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন।"

কেসটা দেখা গেল সত্যিই সিরিয়াস। এতই সিরিয়াস যে, কোন রকম ভণিতা করার প্রয়োজনও সুনীতের মত লাজুক ছেলে বোধ করল না। সুনীতের স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানা গেল ও কিছুকাল যাবৎ একটি পরমাসুন্দরী এবং শিক্ষিতা তরুণীর প্রেমে পড়েছে। এবং সে প্রেম যে একতরফা নয় তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সুনীতের নোটবুক। সুনীত নোটবুক খুলে দেখিয়ে দিল, এ পর্যন্ত সাঁইত্রিশবার তাদের দুজনের সাক্ষাৎকার ঘটেছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে, বেলুড় মঠে, বালির পুলে, চীনে রেস্তোরাঁয়, স্ট্র্যাণ্ডে, ইডেন গার্ডেনে, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে, পার্সি ল্যাংকাস্টারের ফুলবাগানে, জাতীয় গ্রন্থাগারে, লেকে, কফি হাউসে, আর্কেডিয়ায়, চিড়িয়াখানায়, রাজভবনে—

"রাজভবনে!" সুনীলের চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। "বলেন কি মশাই, আপনাদের বুকের পাটা আছে তো।"

"অফিস পিরিয়ডে রাজভবনের চত্বরটাই তরুণ-তরুণীদের কাছে সব থেকে সেফ্ জায়গা। গুন্ডার ভয় নেই। গার্জেয়ানও নাগাল পায় না।" সুনীত শান্তভাবে বলল। "কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মাটি হয়ে গেল।"

"কেন, কেন?"

"আমার জন্য। এই সাঁইত্রিশটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট বেকার হয়ে গেল! কি একটা অদ্ভুত ব্যাধি যে আমার উপর ভর করল, কি বলব, একদিনও মেয়েটির সামনে মুখ খুলতে পারলাম না। একটা কথা বলতে পারলাম না। নট্ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড। অথচ ইম্প্রেস করব বলে কত কোটেশন, কত সব ভাল ভাল প্যাসেজ মুখস্থ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি হল জানেন, যখনই কথা বলার চেষ্টা করি, তখনই বুঝতে পারি, স্বরযন্ত্রটি আমাকে বেইজ্জৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আমি তোৎলাচ্ছি। হ্যাঁ মশাই, আমার একটা কথাও সোজা হয়ে বের হতে চাইছে না। তো তো তো তো করতে লেগেছে। মধুর মুহূর্তগুলি না ফুটতেই ঝরে ঝরে পড়ে গিয়েছে। আমাকে একেবারে ইমপোটেণ্ট করে ছেড়ে দিয়েছে। এই তোৎলামির হাত এড়াতে না পারলে প্রেম আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। যাবে আর বলছি কেন, এতক্ষণ হয়ে



বোটানিক্যাল গার্ডেনে, বেলুড় মঠে, বালির পুলে.

গিয়েছে।" সুনীত গুম মেরে বসে রইল। তারপর ফোঁস করে বুক থেকে অনেকখানি গরম হাওয়া বের করে দিয়ে বলল, "মেয়েরা, বুকের ভাষা নয়, মুখের ভাষাই শুনতে চায়। কাল থেকে এক বাক্যিবাগীশ ছোকরা তাই তাকে বগলদাবা করেছে। আমার বারোটা বেজে গেল। তোৎলামি এড়াই কি করে বলতে পারেন?"

"কেন, গান গেয়ে।" হঠাৎ ব্রজদার আওয়াজ পেয়ে আমরা চমকে উঠলাম। রেশন-ব্যাগটা চেয়ারের উপর ধপাস করে রেখে ব্রজদা বললেন, "আমার এক ভাইপো তোর অবস্থায় পড়েছিল, বুঝলি। স্রেফ্ গান গেয়ে পার পেয়ে গেল। যদো?"

আওয়াজ শুনেই যদুদা একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলেন। ব্রজদা আসন নিলেন।

সুনীল বলল, "গান দিয়ে কি হবে, হচ্ছে স্ট্যামারিং-এর কথা—" (পাছে সুনীত দুঃখ পায়, তাই সে কথাটা ইংরাজিতে বলল)।

"হ্যাঁ বাপু, হ্যাঁ", ব্রজদা বিরক্ত হলেন। "ঐতেই তোৎলামি সারবে। এ হচ্ছে বিলাত-ফেরত এক স্পেশালিস্টের প্রেস্‌ক্রিপশন। চৌষট্টি টাকা ভিজিট দিয়ে আমার ভাইপোকে এটা যোগাড় করতে হয়েছে। নিতের তো তবু মেয়েদের সামনে তোৎলামি, আর আমার সেই ভাইপোর মুখে কারোর সামনেই কথা ফুটত না। কিন্তু সেই প্রেসক্রিপশনের গুণে এখন সে পারফেকটলি অলরাইট। দেশ-বিদেশে বক্তৃতা দিতে তার কল আসছে। এখন ম্যানিলায় গেছে। বিরোধী পক্ষের হয়ে ইলেকশন প্রোপাগাণ্ডা করতে। কারফর্মা ফ্যামিলির ছেলে তো, সহজাত প্রতিভা নিয়েই জন্মেছে। ধর্মদাস কারফর্মার নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। এই তো সেদিন যে হাইড পার্কে কেরাসিন কাঠের বাক্সোয় ঝাড়া বাহাত্তর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ঝেড়ে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ব্রেক করলে। আমি সেই ছোকরার কথাই বলছি।"

"কিন্তু ব্রজদা", সুনীল বাধা দিলে, "কোথায় যেন দেখেছি, একটানা চুরাশি ঘণ্টা বক্তৃতাবাজির রেকর্ড আছে।"

"ঠিকই দেখেছিস।" ব্রজদা একটু থামলেন। "সেটা নন্-অফিসিয়াল রেকর্ড। উনিশ শ' একুশে আমিই দিয়েছিলাম, এই টাউন হলে, স্বরাজ্য পার্টির অধিবেশনে। পার্টির নামটা আমার দেওয়া তা জানিস তো। চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল যখন ঠিক করলে একটা আলাদা পার্টি খুলবে, তখন ওরা সমস্যায় পড়ল, কি নাম দেওয়া যায়! ছ মাস ধরে হাত বুলনোর পরও যখন দুটো ঝানু ব্যারিস্টারের মাথা ফেল করল, তখন ওরা আমার কাছে দৌড়ল। মতিলাল চিত্তকে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম করলে, 'আস্ক্ ব্রজদা।' দিয়ে দিলুম নাম, এক সেকেণ্ডে। ওরা খুশি হয়ে নামটা অ্যাকসেপ্ট্ করলে। তবে অনুরোধ

করলে ওদের কনফারেন্সে এই নামের তাৎপর্য কি, তা বুঝিয়ে বলতে হবে। বললুম। শুক্রবার সন্ধ্যে ছয়টায় উঠলুম আর মঙ্গলবার ভোর ছয়টায় ডায়াস থেকে নেমে বাবুঘাট থেকে গঙ্গা নেয়ে বাসায় ফিরলুম। চুরাশিটে ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলুম না। একেবারে বেদ উপনিষদ থেকে আরম্ভ করেছিলুম কি না। এদেশে পলিটিক্যাল বক্তৃতা দেবার যে স্ট্যান্ডার্ড সেট্ করে দিয়েছি না, তাই ভাঙিয়েই এখন সবাই খাচ্ছে। তোদের এই নেহরুর তালিমও এই শর্মার হাতে। তোরা বোধহয় এ খবরটাও জানিসনে, স্বামিজীর আমেরিকার লেকচারের তালিমও এই ব্রজরাজ কারফর্মার কাছ থেকেই নেওয়া। যাক গে যাক, আমার কথা ছেড়ে আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রি শোন!"

হ্যাঁ, ধেমোর কথা যা বলছিলুম, কারফর্মা যখন, তখন যে সে ব্রিলিয়াণ্ট বা ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন হবে সে কথা বলাই বাহুল্য! বললে বিশ্বাস করবিনে, আমাদের ফ্যামিলির পোষা গাধাটিও গাধামিতে ওয়ার্লড্‌স্ নাম্বার ওয়ান। কাজেই ধেমো সেই বাড়ির ছেলে হয়ে যে তোৎলামিতে তোৎলা-শ্রী হবে, এ আর বেশী কথা কি। অবিশ্যি আমাদের ফ্যামিলির সবাই ওর কথা সহজেই বুঝতে পারত। না-বুঝবই বা কেন? ওর মুখ থেকে তো আর কথা বের হত না, বেরুত দুই প্রকার শব্দ। এক বেরুত হিক্কা—ফাফ্ ফাফ্ ফাফ্ ফাফ্, আর বেরুত গার্গল করার ধ্বনি—গ্ গ্ গ্ গ্ গ্। কথা নয়, তবে কথার প্রতীক।

ধেমো যখন গার্গল করত তখন বুঝতাম ও ইমোশন—অর্থাৎ হর্ষ শোক আনন্দ বেদনা প্রকাশ করতে চাইছে। আর ওর হিক্কা ছিল ওর ইণ্টেলেক্টের প্রকাশ। ধেমোর প্রকাশভঙ্গীর প্রতীকীরূপের নিজস্বতার জন্য ইস্কুল কলেজে যে ওর আটকায়নি, তার কারণ ওর মুখের অক্ষমতার শোধ ও কলমের মুখ দিয়ে ষোল আনা তুলে নিত।

বেশ চলছিল। এমন সময় সুনীতের যা হয়েছে, ধেমোরও তাই হল। সে পাড়ারই এক অধ্যাপকের পরমাসুন্দরী এবং বিদুষী মেয়ের প্রেমে পড়ল। কারফর্মা বলেও সে রেহাই পেল না। আর পটাসিয়াম সায়েনায়েড খেলে যেমন মৃত্যুর মুখোমুখি হতেই হবে, এ নিয়তি কেউ ঠেকাতে পারে না, তেমনি এ কথাই বা কে না জানে যে, প্রেমে পড়লেই একদিন না একদিন নায়িকার মুখোমুখিও হতেই হবে।

সুনীতের মতই ধেমোর প্রেমও একতরফা ছিল না। আর ধেমোও যতদিন মেঘনাদের মত অন্তরালে থাকতে পেরেছিল, ততদিন কলমের মুখে একেবারে

চৌঘুড়ি ছুটিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু প্রেমকে তো শুধুমাত্র কলমের মুখে আটকে রাখা যায় না। একদিন দুজনে দেখা হল এবং ধেমো সেই প্রথম অনুধাবন করল, গার্গলের প্রতীকী প্রকাশ এখানে লাট খেয়ে যাবে। সে মুখ বুঁজে সেই সন্ধ্যাটি কাটিয়ে দিলে। জ্যোৎস্নায় যে তারাগুলো লেকের জলের ভিতর দিয়ে ওদের নাগাল ধরার চেষ্টা করছিল, ধেমোর চোখে সেগুলো সরষের ফুলরূপে ফুটে উঠল। ধেমোর মনে কত কাব্য, কত মনোহর ললিত গদ্য লেখা হতে লাগল, ছাপার অক্ষরে সেগুলো পড়াতে পারলে, ধেমো ট্রয়ের হেলেনকেও হেলিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কী দুর্দৈব, ভাইভা ভোসিতে সে রান না করেই আউট।

মেয়েটি ক্রমশ যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ধেমো ততই সরে সরে যায়, তারপর পত্রাঘাতে মেয়েটিকে জর্জরিত করে দেয়। তবুও ধেমো বুঝতে পারল, মুখ তাকে একদিন খুলতেই হবে। এবং সেই ভয়ংকর দিনটি মেল ট্রেনের গতিতে দ্রুত ছুটে আসছে। তখন সে ঠিক করল, ডাক্তার দেখাবে।

ওরা তখন বেলঘরেতে থাকত। সে আমলে স্টেট বাস জন্মায়নি। দেশ স্বাধীন হয়নি। যুদ্ধ বাধব-বাধব করছে। ধেমো খবর পেয়েছিল, গোরাবাজারে একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তার আছে, তোৎলাদের ধন্বন্তরি। চৌষট্টি টাকা ভিজিট দিয়ে একদিন সকালে ধেমো তার চেম্বারে ঢুকলে।

"কষ্টটা কি?" পুরু পরকলার ভিতর দিয়ে ডাক্তারবাবু ওর দিকে চেয়ে রইলেন।

ধেমো প্রাণ খুলে গার্গল করতে লাগল।

"গ্ গ্ গ্ গ্ গ্ গ্—"

"গদ্যে বলতে অসুবিধে হয়, পদ্যে বলুন।"

"অগ্ অগ্ অগ্ অগ্ অগ্—"

"হুঁ, গলায় সুর আছে। রেওয়াজও তো দেখছি ক্ল্যাসিক্যাল। তেরেনা জমবে ভাল। বেশ তো তবে গান গেয়েই আপনার বক্তব্য পেশ করুন। কবি-গুরুর সেই বিখ্যাত কলিটি মনে আছে তো, গানের ভিতর দিয়ে আমি দেখি ভুবনখানি। তা গোটা ভুবন যার ভিতর দিয়ে দেখা যায়, তার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখতে আমার খুব অসুবিধে হবে না। আর আমাকে দেখাতেই যখন আপনার আসা।"

পরকলার ফোকাস ধেমোর মুখে স্থির হয়ে পড়ল। গান! আইডিয়াটা ধেমোর ভালই লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ধেমোর মনে গানের আস্ত আসর বসে গেল। আর আশ্চর্য হয়ে সে দেখল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথাটা গান হয়ে অনায়াসে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। আর কী আশ্চর্য, সবই রবীন্দ্র-সঙ্গীত!

"বাণী মোর নাহি—"

ডাক্তারবাবু বাধা দিলেন, "বোঝা গেল। তা এতদিন পরে হঠাৎ বাণী নিয়ে টানাটানি শুরু হচ্ছে কেন?"

"অভ্ অভ্ অভ্ অভ্ অভ্—"

"গানে চলে যান, গানে চলে যান, বেশ তো হচ্ছিল। আবার বিপথে গেলেন কেন।" ডাক্তারবাবুর আর্তস্বর।

ধেমো ভুলটা চট করে শুধরে নিল।

"ভালবাসি ভালবাসি

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি—"

"বাঃ বাঃ", ডাক্তারবাবু খুশি হলেন।

"ব্যাপারটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ভেরি গুড। তা এখন ট্রাবল কোথায়। বাঁশি যখন বাজছেই—"

ধেমো কালবিলম্ব না করে ধরে দিল,

"বেদনা কী ভাষায়—"

"যে প্রকাশ করবেন, তা খুঁজে পান না। কিংবা খুঁজে পেলেও মুখে ফুটে উঠছে না, এই তো!" ডাক্তারবাবু ধেমোকে সাহায্য করতে লাগলেন। "ফলে—"

"তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন—"

"আপনি সেটা দিতে পারছেন না। খুবই অসুবিধায় পড়েছেন সন্দেহ নেই। এবং সেই অসুবিধা দূর করার জন্যই আমার কাছে এসেছেন। হুঁ।"

ডাক্তারবাবু থামতেই ধেমোর ঠোঁট দুটো নিসপিস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

ব্যস ব্যস, আর নয়। আর নয়। রোগ নির্ণয় যখন হয়ে গেছে তখন কবিগুরুকে ডিস্টার্ব করা আর উচিত হবে না। আপনি এখন মুখ বন্ধ করুন।"

"দেখুন", একটু থেমে ডাক্তারবাবু বললেন, "আসলে আপনি বড় লাজুক। আপনার জড়তাই হচ্ছে আপনার তোৎলামির কারণ। আপনি নিয়ম করে রোজ তিনজন অচেনা লোকের সঙ্গে যেচে আলাপ করুন, তেড়ে গিয়ে কথা বলুন। এক মাসের মধ্যে আপনার রোগ সেরে যাবে। দেখবেন, আর পাঁচজনের মতই তখন আপনার বেদনা স্পষ্ট বাংলা ভাষায় জানাতে পারবেন। নাউ, উইশ ইউ গুড লাক।"

ধেমো যখন গোরাবাজার স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন দুপুর। একটু মেঘলা মেঘলা করেছে। ওর মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। সিগন্যাল পড়ল। ট্রেন এল। ধেমো যে কামরাটায় উঠল তাতে খুব বেশী লোক নেই। ও একটা ষণ্ডামার্কা লোকের পাশে গিয়ে বসল। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি

চওড়া। চোখ দুটো ভাঁটার মত। যাক, তবু তো অপরিচিত লোক। ডাক্তার-বাবুর প্রেসক্রিপসনের পক্ষে মানানসই। ভাবল, ওর সঙ্গে বাক্যালাপের মধ্য দিয়েই ওর জড়তা ভাঙ্গার চেষ্টা করবে। কি বলবে আর কেমন করে বলবে, ধেমোর সমস্যা হল তাই। ও যখন মনে মনে চরম পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে, সেই সময় লোকটি ওর দিকে চাইল। ধেমো হাসল। লোকটির চাকাপানা মুখেও যেন এক ফালি হাসি ফুটে উঠল। ধেমো সাহস পেল। এইবার 'নমস্কার দাদা' কথাটা ঠেলে-ঠুলে বলে ফেললেই ওর বউনিটা হয়ে যায়।

কিন্তু ধেমো হাঁ করার আগেই সেই লোকটি মুখ খুলল।

"বেজ্ বেজ্ বেজ্ জ্জায় গ্গ্গ্ উমোট? ত ত্ ত ত্ তাই না?"

ধেমো যেন বাঘ দেখল। ওর গলা দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় এতক্ষণ ধরে ও যে কথাটা বের করে আনবার চেষ্টায় ছিল, মুহূর্তমাত্র দেরী না করে, এক ঢোঁকে সে সেই কথাটা গিলে ফেলল। লোকটা তার কথার জবাব না পেয়ে বেজায় অপমান বোধ করল। ওর ভাঁটার মত চোখ থেকে আগুন বেরুতে লাগল। খপ করে দু হাতে ধেমোর হাত দুটো ধরে ওকে সামনে টেনে আনল। বিরাট গর্জন উঠল।

"বেজ্ এজ্ এজ্ এজ্ জায় গুম্ উম্ উম্ম্ ম্ ম্ মোট, তাত্ তাত্ তাই না?"

"কারফর্মাদের উপস্থিত বুদ্ধিটা খুব প্রখর, বুঝলি।" ব্রজদা এতক্ষণে একটু হাঁপ নেবার জন্য থামলেন। "ভয়ংকর ভয়ংকর সব বিপদ থেকে আমরা কতবার যে রক্ষে পেয়েছি সেরেফ উপস্থিত বুদ্ধির জোরে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। সে কথা আরেকদিন বলব। এখন ধেমোর কথাই শোন।"

একটা কেঁদো বাঘ ইঁদুরের বাচ্চাকে থাবার মধ্যে পুরলে সে বেচারির যে অবস্থা হয়, ঐ লোকটার খপ্পরে পড়ে ধেমোরও অবিকল সেই অবস্থা হল। ধেমোকে তোল্লা করে গোটা চারেক ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটা আবার গর্জে উঠল।

"বেজ্ বেজ্ জ্ জ্ জ্—"

ধেমো হঠাৎ প্রকাণ্ড হাঁ করে টাকরার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে 'ঙা ঙা ঙা' করে গুঙিয়ে উঠল। সে যে গোঙা সে-কথা লোকটা বুঝতে পেরে বেজায় লজ্জা পেল। ধেমোকে যত্ন করে বসিয়ে দিয়ে ক্ষমা-টমা চেয়ে নিলে। বউনিটা এভাবে চটে যেতে ধেমো বড্ড মনমরা হয়ে গেল। তবে ভবিষ্যতের বিপত্তি এড়াবার জন্য সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, তোৎলা নয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত শত অপরিচিত হলেও সে কারো সামনে আর মুখ খোলার

চেষ্টা করবে না।

দমদম জংশনে এসে গাড়ি থামতেই ধেমো নেমে পড়ল। বেশ আলো কমে গিয়েছে। বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি ওভারব্রিজটা পার হয়ে ওদিকের প্ল্যাটফর্মে সে সবে পা দিয়েছে, অমনি পিছন থেকে গম্ভীর স্বরে কে বলে উঠল. "কস্তং?"

ধেমো চমকে ফিরে দেখল অদ্ভুত ধরনের একটা লোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটির পোশাক পরিচ্ছদ দেখে ধেমো একেবারে হাঁ হয়ে গেল। পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার, গায়ে শার্ট, কোট, গলায় টাই, পায়ে খেলোয়াড়ি হোস, হাঁটুতে নি-ক্যাপ। খড়ম পায়ে খটাস খট.স হাঁটছে।

"আমাকে চিনতে পারলে না তো!" লোকটি অন্তরঙ্গভাবে বললে।

ধেমো লোকটির বেশভূষা দেখে যেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল তার অমায়িক কথাবার্তা শুনে তেমনি ধাতস্থ হল। লোকটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত অথচ তোৎলা নয়, এতে ধেমো বরং খুশীই হল। একে দিয়েই তো বউনি করা যেতে পারে।

"কী হে. চিনতে পারনি তো?"

লোকটি নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় ধেমোর কাছে ঘনিয়ে এল। তার এই অন্তরঙ্গ আচরণে ধেমোর সঙ্কোচ ভেঙ্গে গেল। তার জড়তা কেটে গেল। তার সাহস ফিরে এল। ভাবল. সে আর তোৎলা নেই, কখনো ছিল না। কখনো না। আর আশ্চর্য. এই কথা ভাবতে ভাবতে সত্যিই সে অনায়াসে, জীবনে এই প্রথম. স্পষ্ট করে কথা বলতে পারল।

"কই. চিনতে পারলাম না তো?"

এ কথায় লোকটি বেজায় খুশী হয়ে উঠল।

"ঠিক বলছ? চিনতে পারছ না? ঠিক তো?"

"ঠিকই বলছি।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"ব্যস," লোকটা যেন খুশীতে ফেটে পড়ল। "তিন সত্যি করলে কিন্তু। যদি মিথ্যে কথা বলে থাকো, তবে কিন্তু বেঘোরে মরবে। তবে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি লোকটি সাচ্চা আছ। তোমার মত একটা সাচ্চা লোকই আমি খুঁজছিলাম, আমাকে সত্যিই চেনা যায় কি না, সেটা পরখ করতে। যাক.



কী হে, চিনতে পারনি তো?

তোমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

লোকটি চট করে আরও কাছে সরে এল। কানে কানে ফিসফিস করে বললে, "চিনবে কি করে হে, এটা যে আমার ছদ্মবেশ। এ পোশাকে যে আমাকে দেখবে, সেই ভাববে আমি নাদির শা। আমার আসল আমিকে কেউ চিনতে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ। এই তো তুমিও পারনি। সত্যি সত্যিই আমি কিন্তু নাদির শা নই।"

"আপনি তবে কে?" ধেমোর কথাবার্তা শুনে সে নিজেই অবাক হচ্ছে। কেমন স্পষ্ট সে বলছে কথাগুলো। ডাক্তারবাবু একমাস সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু সে একদিনেই ভাল হয়ে গেল। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব কিন্তু এই অমায়িক ভদ্রলোকটির। ধেমোর ইচ্ছে করছিল, ওর পায়ের ধুলো কপালে ছোঁয়ায়।

"আমি?" লোকটি তেমনি ফিসফিস করে যেন গোপন কথা ফাঁস করছেন। "আচ্ছা, তুমি কপালকুণ্ডলাকে চেন?"

কপালকুণ্ডলা! ধেমো অবাক হল। চিনতে পারছে না, অথচ নামটা চেনা চেনা। হঠাৎ তার মনে পড়ল, হ্যাঁ, বাবার আলমারিতে এই নামে একখানা বই দেখেছে বটে। কার যেন লেখা। হ্যাঁ, আর একবার সিনেমার পোস্টারেও যেন নামটা দেখেছিল।

বলল, "চিনি না, তবে নাম শুনেছি।"

"বটে! আমার সঙ্গে চালাকি।" লোকটির সেই অন্তরঙ্গ ভাবটি মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল।

"বাপু হে, তুমি আমাকে না চিনলেও, আমি যে তোমাকে চিনেছি। হাঃ হাঃ হাঃ। নবকুমার, পাপিষ্ঠ, তবে শোন, আমি সেই কাপালিক। বঙ্কিমকে ঘুষ দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলে যে তোমরা জলে পড়ে ডুবে গেছ। ভেবেছ, আমি তা বিশ্বাস করেছি। তোমাকে ধরবার জন্যই ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই ধরিলাম, আর তোর পরিত্রাণ নাই।"

কাপালিক খপ করে ধেমোর হাতটা ধরে ফেললে। একেবারে যাকে বজ্র-মুষ্টির বাঁধন বলে, তাইতে ধেমো আচমকা বাঁধা পড়ে গেল। চারিদিকে চেয়ে দেখল, প্ল্যাটফরম ফাঁকা। ধারে কাছে জনমনিষ্যি আছে, ওর এমন মনে হল না। ধেমো বেজায় ভয় পেয়ে গেল। কি করবে, বুঝে উঠতে পারল না।

হঠাৎ কাপালিক চীৎকার করে উঠল, "নবকুমারকে পাইয়াছি, কপালকুণ্ডলে, তোরও নিস্তার নাই।"

তারপর ধেমোর চোখে চোখে কটমট করে চেয়ে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, "মামনুসর।"

কথাটা ধেমো ভাল বুঝতে পারল না।

"মামনুসর।"

ধেমো তবুও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে দেখে কাপালিক বিরক্ত হল। ধেমোকে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বললে, "থাক আর ন্যাকা সাজতে হবে না, আমাকে ফলো কর।"

কাপালিক হিড় হিড় করে ধেমোকে টানতে লাগল। ধেমোর ততক্ষণে আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে।

তবু সাহস না হারিয়ে ধেমো আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলে, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"মশানে।"

"কোথায়?" ধেমোর হৃৎপিণ্ড তড়াক করে এক পেল্লায় লাফ মারলে।

"মশানে।" কাপালিক আবার বললে। "যেখানে নরবলি হয়। যেখানকার হাড়িকাঠ থেকে তুমি পলায়ন করেছিলে। পকেটে ছুরি আছে?"

"ছুরি!" ধেমো আঁৎকে উঠল।

"হ্যাঁ ছুরি। ছোট হোক বড় হোক, পুচিয়ে পুচিয়ে কাটবার মত যা হোক একটা হলেই হল। আমার কাছে ছোট-বড়র বাছবিচার নেই। শুধু হাতে তো আর গলা কাটা যায় না, তাই। আছে পকেটে?"

"না। নেই।"

"আঃ জ্বালালে। এখন ছুরি পাই কোথায়। অনেক দিন পরে অক্ষত একটা লোক যদিও বা পাওয়া গেল, এখন ছুরির অভাবে বুঝি বলিটাই বন্ধ রাখতে হয়।" কাপালিক আফশোষ করতে লাগল। "আমার মেয়াদ কতক্ষণ, তা তো জানিনে। আর তোমার মত সুলক্ষণযুক্ত লোক আর পাব কিনা তাই বা কে জানে! এই দ্যাখো না, তোমার আগে তিন তিনটে লোককে পাকড়েছিলাম। প্রত্যেকেই খুঁতো। দুটো ভিখিরি—একটা কানা, একটা খোঁড়া। তৃতীয়জন অবিশ্যি ভদ্রলোকই ছিল। হাত-পাও আস্তই ছিল তার। অনেক আশা করেছিলাম তার উপর। কিন্তু ও ব্বাবা, কথা কইতেই দেখলাম, ক্ ক্ ক্ ক্ করে উঠল। তোৎলা বলি আবার মা নেন না।"

"তাই নাকি," ধেমো হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণে ওর ধড়ে প্রাণ এল। কপাল থেকে কাল ঘাম মুছে ধেমো বলে উঠল, "যাক বাবা, আমিও তো তোৎ—'

হঠাৎ ধেমোর মনে হল, তাই তো, ধেমো তো আর একটুও তোৎলাচ্ছে না। কাপালিকের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে, সে তো একবারও তোৎলায়নি। এতক্ষণ তো বেশ স্পষ্ট করেই কথা বলেছে। সর্বনাশ! এতক্ষণ ধেমো নিজের পায়েই কুড়ুল মেরেছে।

"কি বললে!"

ধেমো বলল, "আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন, আমি ভয়ঙ্কর তোৎলা, পেট থেকে

পড়ে ইস্তক তোৎলাচ্ছি।”

“হুঁ।” কাপালিক গম্ভীর স্বরে বললে, “সে তো দেখতেই পাচ্ছি।”

ধেমো বুঝল, কাপালিক ওর কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করছে না। ধেমো এখন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে, ও একদিন, এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও বিলক্ষণ তোৎলা ছিল।

“মা কালীর দিব্যি, মাইরি বলছি, আমি সত্যি সত্যিই তোৎলা, জাত তোৎলা।” ধেমো মরীয়া হয়ে উঠেছে। “আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তবে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখালে বিশ্বাস করবেন তো।”

“বেশ, দেখাও।”

আশান্বিত হয়ে ধেমো তাড়াতাড়ি ডাক্তারী প্রেসক্রিপসনখানা বের করে কাপালিকের হাতে দেওয়া মাত্র সে সেখানা খপ করে মুখে পুরে কোঁৎ করে গিলে ফেললে।

তারপর মাইডিয়ারি মুখ করে বললে, “এবার প্রমাণ কর তুমি তোৎলা।”

ধেমো দেখল আর নিস্তার নেই। সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিল।

কাপালিক বললে, “আচ্ছা, আমি নিজেই তোমার ওরাল পরীক্ষা নিচ্ছি, পাশ করতে পারলে ছেড়ে দেব। তিনটে ছড়া বলছি, তুমি আবৃত্তি কর। প্রথমে বল তো, হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম।”

ধেমো মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ছেষট্টি কোটি পাঁঠা মানত করল, হে বাবারা, হে মায়েরা, আমার তোৎলামি যেন ফিরে আসে। তারপর আবৃত্তি করে গেল অনায়াসে, স্বচ্ছন্দে, একেবারে পরিষ্কার।

“হাট্টিমা টিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম।”

“ফেল।” কাপালিক হুঙ্কার দিয়ে উঠল। ধেমোর চোখে অন্ধকার।

“এবারে দু নম্বর ছড়া। বল, রিষড়ের আড়পার খড়দর ডান ধার, ছাদনাতলায় হোঁৎকা হোঁদল।”

ধেমো বুঝতে পারছে, কী সাবলীল গতিতে ওর সর্বনাশ এগিয়ে আসছে। গড়গড় করে ও বলে গেল, “রিষড়ের আড়পার খড়দর ডান ধার, ছাদনাতলায় হোঁৎকা হোঁদল।” কোথাও থামল না। যেন ননস্টপ ভেস্টিবিউল বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে ধেমোর হার্টে প্যালপিটিশন শুরু হল। হাত পা থরথর করে কাঁপতে লেগেছে।

“ফেল ফেল”—কাপালিক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। “আর একটা। এই শেষ। হ্যাঁ বল, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, চাঁছা চটাই চাঁছা না আচাঁছা চটা চাঁছা।”

ধেমোর মুখে এটাও বাধল না। একটুও না।

“চাচা আপন প্রাণ বাঁচা
চাঁছা চটাই চাঁছা না আচাঁছা চটা চাঁছা।”

ব্রজদা সিগারেটে লম্বা এক টান দিয়ে বললেন, "ধেমোর অবস্থাটা একবার বুঝে দ্যাখ। যে তোৎলামি সারাবার জন্য বেচারা এত কাঠখড় পোড়ালে, এখন সেই নন-তোৎলামিই তার প্রাণ সংশয় করে দিলে। কী গেরো!"

"তবে কি জানিস," দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "কারফর্মা ফ্যামিলির ছেলেরা অত সহজে মরার লোক নয়। জীবনে আমরা কখনো ওয়াক-ওভার দিইনি।"

ধেমো যখন ধরেই নিল তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় টং টং করে প্ল্যাটফরমের ঘণ্টা জানিয়ে দিলে, ট্রেন আসছে। ঘণ্টার আওয়াজে কাপালিককেও কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে উঠতে দেখা গেল।

ধেমোকে বার দুয়েক বেশ করে ঝাঁকানি দিয়ে কাপালিক বললে, "দেখ বাপু, তুমি আমার বন্দী। এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি। দেখি কোথাও একটা ছুরি কি রামদা যোগাড় করতে পারি কিনা। ভদ্দরলোকের ছেলে, চুক্তির খেলাপ করো না কিন্তু। তোমাকে বিশ্বাস করে এখানে রেখে যাচ্ছি। ক্যাসাবিয়াঙ্কার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এক পা-ও নড়বে না, খবরদার!"

কাপালিক অপসৃত হতে না হতেই ট্রেনখানা এসে পড়ল। আর এক্ষেত্রে কারফর্মারা যা করে থাকে, যঃ পলায়তে—ধেমো তা করতে মুহূর্তমাত্র দেরী করল না। সামনে যে কামরাটা পেল, এক লাফে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভাগ্যক্রমে সেটা আবার লেডিজ ফার্স্ট ক্লাস। তবে প্যাসেঞ্জার কেউ ছিল না। সেফ সাইডে থাকবার জন্য ধেমো একেবারে গদীর নিচে সেঁধিয়ে গেল।

দু মিনিটের বেশী সেখানে গাড়ি দাঁড়াবার কথা নয়। তবু ধেমোর মনে হতে লাগল, গাড়ি বোধ হয় আর ছাড়বেই না কখনও। আর কাপালিক তার আগেই শাণিত খড়্গ যোগাড় করে ফিরে আসবে, তারপর তাকে গদীর নিচ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করবে। তারপর—উঃ! তারপরের কথা চিন্তা করতেই ধেমোর মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরে গেল। এমন সময় হঠাৎ ক্যাঁ ও চ্—

ধেমো চমকে উঠে দেখল প্ল্যাটফরমের দিকের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। ধেমোর বুকে ধক ধক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একখানা পা দরজার ফাঁকে ঢুকে পড়ল। ধেমো দেখল, সে পায়ে খড়ম নেই, লেডিস সু। তবু ভাল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"যাক, ফাঁক'ই আছে।" সুমধুর স্বরটা ধেমোর কানে ঢুকল।

"কি রে দিদি, পারবি তো একা যেতে?"

"যা ফাজিল কোথাকার। এইটুকুন তো রাস্তা, তার আবার ভাবনা। তবু দেখিস, মাসিমা না, কেমন অবাক হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, তা হবে। মা পারলে আমার সঙ্গেই পাহারা দিতে ছাড়ে না, আর এ তো তুই। দেখিস মজাটা কি হয়।"

হি হি হি হি। একরাশ মিহি হাসি ফোয়ারার মত কামরাটায় ছড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ রে পীতু, প্ল্যাটফরমের ওধারে এত হৈ চৈ কিসের রে।"

"এদিকে একটা পাগলা গারদ আছে না, তার থেকে একটা পাগল পালিয়েছে। ওরা সব খুঁজতে বেরিয়েছে।"

"ও। এই, ট্রেন ছেড়ে দিল। সরে যা তুই।"

"দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বস দিদি।"

"জানি জানি, তোর আর সর্দারি করতে হবে না। টা টা।"

ধেমো দেখল, ওর সামনের বেঞ্চে লেডিজ সুয়ের মালিক বসল। খানিকক্ষণ পা দুটো নাচাল। আবার উঠল। পাখা খুলে দিল। আবার বসল। ট্রেন ধীরে ধীরে স্পীড দিয়েছে ততক্ষণে। ধেমো ভাবছিল, ঠিক কেমন করে এখন বেরুনো যায়। মেয়েটা আবার আচমকা ভয় না পেয়ে বসে। মেয়েরা যা নার্ভাস। এমন সময় ঈশ্বরই একটা উপায় করে দিলেন। মেয়েটি টয়লেটে ঢুকতেই ধেমো চট করে বেরিয়ে ভদ্রস্থ হয়ে গদীর উপর বসে পড়ল। এবং মেয়েটি ওকে দেখে যখন অবাক হবে, তখন সে কি কি বলবে, এমতাবস্থায় কি বললে শোভা পাবে, সে সেই চিন্তাতেই মন দিল। মনে মনে তালিম দিতে লাগল। মেয়েটি প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে, কে আপনি? তার জবাবে ধেমো বলবে, আম্ ম্মাম্ ম্মাম্ ম্মাম্ একী! ধেমো আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করল, সে আবার অরিজিন্যাল ফর্মে ফিরে গিয়েছে। মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হচ্ছে না। সেরেছে! সে তাড়াতাড়ি ছড়া বলতে গেল, কিন্তু হাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ছাড়া আর বেশী দূর এগুতে পারল না। কী দুর্দৈব! অথচ এই তো একটু আগেই, যখন আদৌ প্রয়োজন ছিল না, কাপালিকের খপ্পরে পড়ে যখন প্রাণ সংশয় হয়ে উঠেছিল, তখন কেমন গড়গড় করে পরিষ্কার উচ্চারণে ছড়াটা আবৃত্তি করেছে। আর এখন? আবার ধেমো তার আয়ত্তে যত ক্ষমতা ছিল সব জড় করে তার স্বরযন্ত্রকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হল। কিন্তু ফল সেই হাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্ ট্টাট্—যেন টমি গানের ফায়ারিং হচ্ছে। ধেমো নিজের স্বরযন্ত্র রিপেয়ার করতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ও বুঝতে পারছে কি মারাত্মক পরিণতির দিকে সময় তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওর আকস্মিক আবির্ভাবের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ ও যদি দিতে না পারে এই যাত্রীটির কাছে, তাহলে কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি থাকবে না। ও বুঝতে পারছে সবই। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি?

অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ শুনে ধেমো চমকে চেয়ে দেখল, টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখেই মেয়েটি ভয়ে শিঁটিয়ে গিয়েছে। এখনই বুঝি মূর্ছা যায়। ধেমো বুঝল আর দেরী করা নয়, এখনই কিছু বলা দরকার,



এখনই বুঝি মূর্ছা যায়

ওকে আশ্বাস দেওয়া উচিত। কিন্তু কি ভাবে? কোন উপায়ে? চট করে ওর ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়ল। এমনি বলতে না পারলে, গান গাইতে বলেছেন।

কালবিলম্ব না করে ধেমো গেয়ে উঠল,

"তুমি ভুল কর না পথিক—"

ধেমো দেখল মেয়েটির মুখ ক্রমশ আনকোরা ব্লটিং কাগজের মত সাদা হয়ে উঠছে, চোখ দুটো বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধেমো পদ পালটে দিলে।

"আমি নই চোর, আমি নই চো—"

কলিটি শেষ হবার আগেই ধেমো অসহায়ভাবে চেয়ে দেখল, একটি রমণীয় রকেট টয়লেটের দরজার কাছ থেকে প্রচণ্ডবেগে উৎক্ষিপ্ত হল এবং শূন্যে প্যারাবোলা কেটে নিপুণ লক্ষ্যে অ্যালার্ম চেনের উপরে গিয়ে পড়ল।

"তারপর ধেমো কি করল," ব্রজদা সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, "আশা করি আর বলতে হবে না। তবে এইটুকু শুনে রাখ, সেদিন পাঁচ মাইলের সেই অবস্টাকল্ রেসে খানা খন্দ চষা মাঠ পচা ডোবা ডিঙিয়ে শ পাঁচেক হিংস্র ক্ষিপ্ত লোককে কয়েক ফার্লং পিছনে ফেলে যে রেকর্ড ধেমো সৃষ্টি করেছে, মানুষের ইতিহাসে কেউ যদি কখনো তা ভাঙতে পারে তবে তাকে কারফর্মা ফ্যামিলির পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে আমরা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে জানিয়ে দিয়েছি। আজ পর্যন্ত সে টাকা আসল আমাদের ঘরে আছে।"

ব্রজদা উঠে পড়লেন। সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বাঃ, আসল প্রবলেমটার কি হল?"

ব্রজদা তাচ্ছিল্যভরে বললেন, "অটোমেটিক্যালি সল্ভ্ড্ হয়ে গেল। ঐ ধকলের পর কোন রকম জড়তা কি আর কারও ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে? একদিন সকালে ধেমো সটান সেই অধ্যাপকের বাড়িতে চলে গেল, তারপর মেয়েটার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে পিওর অ্যান্ড সিম্প্ল গদ্যে বলে ফেলল, আই লাভ ইউ।"

ত্রয়োদশ গল্প

ব্রজদা বললেন, "থাম থাম, ইডিয়েটের মত কথা বলিসনে। বাঙালীর গর্ব করার মত এখন আর ঐ মনুমেণ্ট ছাড়া আছে কি? বাঙালী এককালে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, ইতিহাসে পড়িসনি, বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেছে তার শৌর্যের পরিচয়। বিজয়সিংহের আদি নিবাস কোথায় জানিস?"

সুনীত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ব্রজদার আচমকা প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। মেক-আপ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "জানি বৈকি? দু'তিনবার গিয়েছিও। ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে কুমার সিং হলের দিকে যেতে—"

"কার কথা বলছেন মশাই?" সুনীল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"বিজয় সিং নাহারের কথা।"

"আরে দূর মশাই, কোথায় সিংহল আর কোথায় কুমার সিং হল! হচ্ছে কোন্ কথা আর আপনি বলছেন কি?"

"খুব একটা আবোল-তাবোল বলেনি, বুঝলি।" ব্রজদা সুনীতের দিকে সস্নেহে চাইলেন। "আসলে সিলোনটা একটা সিং হলই। এটা কুমার সিং-এর হল আর সেটা বিজয়ের সিংহল, এই যা তফাৎ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বিজয় সিংহের মানে সিংহলবিজয়ী বিজয় সিংহের আদি নিবাস হল তোদের শান্তিনিকেতনের কাছে, সুরুলে। ও হচ্ছে লর্ড সিন্‌হা ফ্যামিলিরই ছেলে।"

"আপনার সঙ্গে ওর—"

সুনীতের কথায় বাধা দিয়ে ব্রজদা বললেন, "অনেক দিনের জানাশোনা। বিজয় সিংহের বাপের নাম সিংহবাহু। সিংহবাহুর প্রথম পক্ষের ছেলে বিজয়। সৎ-মা দু চোখে দেখতে পারত না ছেলেটাকে। বিজয় সিংহ সে আমলের একজন নামকরা উঠতি গুণ্ডা ছিল। ব্রজ ওদের ফ্যামিলির বিলকুল হিস্ট্রি জানে, বাবা। শুধু কানে শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখা।"

"বলেন কি?" সুনীতের চোখ কপালে উঠল।

সুনীল সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা বুঝি পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতেন?"

ব্রজদা বললেন, "তুই সুনীল একটি চিরকেলে গবেট। তোর খুলির ভিতরে সার পদার্থ যে নেই, তার প্রমাণ তোর টাকই দিচ্ছে। বিজয় সিংহ কি আজকের

লোক! যীশুখৃস্টেরও আগে তার জন্ম। তখন ফ্ল্যাটবাড়ি কোথায়?"

"তাহলে", সুনীত আমতা আমতা করে বললে, "তাহলে আপনি, মানে ওকে, ওকে কোথায় দেখলেন?"

"কেন," ব্রজদা অতি সহজভাবে বললেন, "থিয়েটারে। আর্ট থিয়েটার যেবার সিংহল বিজয় নামালে, আমাকে ওপেনিং নাইটেই একখানা ফ্যামিলি পাশ দিয়েছিল। সেই থেকেই তো জানলাম, বাঙালী একদিন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। বাঙালীর ইতিহাস পাথরের গায়ে পাবিনে, পোয়েটিক জাত তো, নাটকে নভেলে তার হিস্ট্রি ছড়িয়ে আছে। বাঙালী কি যে-সে চীজ!" ব্রজদা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

"শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারই বা বলি কেন? ব্যবসা-বাণিজ্যেও কি কম ছিল? সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সাধুরা কোথায় না মাল নিয়ে ছুটেছে! চাঁদ সওদাগর সিনেমা দেখেছিস? দেখলে বুঝতিস, কত পেল্লায় পেল্লায় জাহাজ বাঙালীদের ছিল। এইসব সিনেমা-থিয়েটারই তো বাঙালীর রিয়েল ইতিহাস ধরে রেখেছে।"

একটু দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "আর আজ? কিছুই নেই সে সব। সবাই মিলে কন্সপিরেসি করে বাঙালীকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। ভারতে এত জায়গা থাকতে ইংরেজরা প্রথমে বাংলা দেশেই বা ষড়যন্ত্র করে রাজদণ্ড হাতে তুলে নিল কেন? এসব তাৎপর্য বুঝতে হবে, বুঝেছ। রাজ্য বাণিজ্য তো গেছেই, এখন অন্য যে সব ফিল্ডে বাঙালীরা করে খাচ্ছিল, সেখানেও টান দিতে শুরু করেছে সবাই। ষড়যন্ত্র কত গভীরে ঢুকেছে, একবার বুঝে দেখ। এখন অন্যান্য প্রদেশের লোক, যারা চিরকাল গোমুখ্যু ছিল, বাঙালী বাবুদের বাড়ি চাকর দারোয়ানের কাজ করে এসেছে, মুটেগিরি করেছে, এখন সে ব্যাটারাও লেখাপড়া শিখছে, উকীল হচ্ছে, ডাক্তার হচ্ছে, ইস্কুল কলেজে পড়াচ্ছে, ইস্তক কেরাণীগিরি করছে। তাহলে বাঙালীর আর থাকল কি?"

আবার একটু দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "বাঙালী কালচার করত, ফাংশান করত, মারোয়াড়িবাবুরা সেটাকেও ট্যাঁকে পুরেছেন। এখন বাঙালী বলে পরিচয় দেবার মত শিবরাত্রির সল্‌তে ঐ এক মুভমেণ্টটুকুই বজায় আছে। বাঙালী যদি এখনই তার পেটেণ্ট নিয়ে না রাখে তবে সেটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে, এই আমি ওয়ার্ণিং দিয়ে রাখলুম।"

"এখনও সময় আছে। বাংলার ইয়ং জেনারেশানের উপর আমার ভরসা আছে। তারা এখনও পিছু হঠতে শেখেনি। বিশ্বাস না হয়, বাদুড়-ঝোলা বাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখিস, সামনের দরজায় এখনও বাঙালীর ছেলেরা গুঁতোগুঁতি করে হাত পা ভাঙবে, তবু ব্যাকডোর দিয়ে বাসে ঢুকবে না।

কী স্পিরিট! আর তোরা এটাকেই ড্যাম্প করে দিতে চাইছিস। তোরা কি বাঙগালী!”

ব্রজদার ধিক্কারে সুনীলের মাথাটা টাইপ-রাইটারের উপর নুয়ে পড়ল তাই, নইলে মাটিতেই মিশে যেত।

“আমি লাইফে একবার ছাড়া কখনও পিছু হটিনি। একটা ঘটনা বলি শোন। সেদিন, মানে রায়টের সময়কার কথা বলছি, ট্রেন লেট ছিল। অফিসে দেরি হয়ে গিয়েছে। তাই শেয়ালদায় নেমে আর কোনদিকে খেয়াল না করে হ্যারিসন রোডের দিকে পা বাড়িয়েছি। পাঁচ হাজার লোক ইস্টিশানের কম্পাউন্ড থেকে হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ব্রজদা, যাবেন না, যাবেন না, গুলি চলছে। মিলিটারির গুলি, রাস্তায় ১৪৪ ধারা।’ ওদের অবস্থা দেখে আমার করুণা হল। আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। গুলি চলছে বলে অফিস কামাই করব! রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম মিলিটারির গুলি খেয়ে একটা বুড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আমি একলাফে এগিয়ে গিয়ে গোরা সোলজারটার রাইফেলের মুখটা চেপে ধরলাম। নে, ছোড় এখন গুলি! তারপর চোখের পলক না ফেলতেই মেওয়ালাল যেমন করে ব্যাকফুটে শট মেরে গোলে বল ঢুকিয়ে দিত, আমিও তেমনি এক শট মারলাম গোরাটার পিছনে। ব্যাটা টাওয়ার লজের তিনতলায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। আমি তখন একহাতে উদ্যত রাইফেল আর কাঁধে সেই আহত বুড়িকে নিয়ে সতী-কাঁধে-শিবের মত তফাৎ যাও তফাৎ যাও করতে করতে মেডিকেল কলেজে ছুটলাম। তারপর বুড়িকে ইমারজেন্সির খাটে শুইয়ে রাইফেলটাকে কলুটোলার মোড়ে এক ট্রাফিক পুলিশের হাতে জমা দিয়ে অফিসে চলে গেলাম। দেখ, বাংলাদেশে জন্মালেই বাঙগালী হওয়া যায় না। বাঙগালীর স্পিরিট, সেটা আয়ত্ত করতে হয়।”

ব্রজদা উঠে পড়বার আগেই সুনীল বলে ফেলল, “আপনিও পশ্চাদপসরণ করেছেন, এ তো কখনও শুনিনি ব্রজদা।”

“একবার করতে হয়েছিল,” ব্রজদা শান্তভাবে বললেন, “নেফায়।”

“নেফায়!” সুনীত ব্যোমকে গেল।

“ও বুঝেছি, যেবার নাগাদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন?”

সুনীলের কথার জবাবে ব্রজদা বললেন, “লড়াই করতে যাইনি। একটা চার্টার্ড প্লেনের পাইলটের গেস্ট হয়ে ফুড ড্রপ করা দেখতে গিয়েছিলাম। ওঃ, সে এক মারাত্মক অপারেশন। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি চলে গিয়েছে। নদীর কোর্স ফলো করা ছাড়া আর দ্বিতীয় রাস্তা নেই। বাতাসের চাপ ক্ষণে



সতী-কাঁধে-শিবের মত

ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। কুয়াশা এসে দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে; পাইলটের পক্ষে মাথা ঠিক রাখাই মুস্কিল।"

"আমাদের আগে আগে ক্যাপ্টেন দুর্জয় সিং-এর প্লেনখানা চলেছে। নদীর খাড়ি ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। এমন সরু যে, একটু অসতর্ক হলেই পাহাড়ে পাখা ঠেকে যাবে। আমি কো-পাইলটের ককপিটে বসে দেখছি। পুরনো অভ্যাসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। অনেকদিন তো আর জয়স্টিকে হাত দেইনি। হঠাৎ একটা শার্প বেন্ড। দেখি সর্বনাশ—পথ নেই, দুর্জয় সিং-এর প্লেনের ডানা চুরমার হয়ে গিয়েছে, পাহাড়ে লেগে সেখানা আমাদের চোখের সামনেই গোঁত্তা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। আমাদেরটাও গেল-গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনখানা কাত করে ফেলে, আমার বন্ধুটিকে চুপ করে বসে থাকতে বললাম। আমি নিজেই প্লেনের দায়িত্ব নিয়ে নিলাম। সামনে পাহাড়। এগোলেই মৃত্যু অনিবার্য। তাই সেবার পিছু হটতে হয়েছিল। প্লেনখানাকে সেফ্‌লি বের করে এনে পাইলটের হাতে তুলে দিলাম।"

"কী ভাবে বের করে আনলেন, ব্রজদা?" সুনীত রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

ব্রজদা এক-পা দরজার বাইরে দিয়ে অম্লানবদনে বলে গেলেন, "কেন, ব্যাক গিয়ার দিয়ে।"

"ব্যাক গিয়ার দিয়ে!!!" সুনীলের গলায় যেন টাই-এর ফাঁস লেগে গিয়েছে, "মাই গড্‌!"

ব্রজদা দ্বিতীয় পা-খানা দরজার বাইরে দেবার আগে বললেন, "অনেক বাঘা বাঘা পাইলটও এ-কথা শুনে তোর মত খাবি খেয়েছে। ব্যাক-গিয়ারে প্লেন চালানো যার তার কর্ম নয়, বুঝলি। ওয়ার্লডের মধ্যে এ কম্ম একমাত্র তোদের ব্রজদাই পারে।"

চতুর্দশ গল্প

"তোদের নেতারা যদি চোখ খুলে না দেখে, তা আমি করব কি?" ব্রজদার চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। "কথায় কথায় ওদের এখন বিদেশ থেকে এক্‌স্‌পার্ট আনানো চাই। এই স্লেভ্‌ মেণ্টালিটি তোদের আর গেল না সুনীল।"

"না, মানে," কিভাবে কথাটা পাড়লে ব্রজদা সেটা গ্রহণ করবেন, সুনীল তাই ভাবতে ভাবতে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল।

সুনীত ফস্‌ করে বলে ফেলল, "ব্রজদার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এর আর মানে-ফানে নেই মশাই।"

সুনীল অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করল। বলল, "দেখুন, এক একটা জিনিসকে, বিশেষ করে যেসব কাজের সংগে জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ওতপ্রোত জড়িত, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তবে বিচার করতে হয়। ফট্‌ করে রায় দেওয়াটা গোঁড়ামির পর্যায়ে পড়ে না কি?"

"আপনারা কথায় কথায় আনাচ্ছেন না এক্‌স্‌পার্ট?"

"আপনারা মানে?"

সুনীলের রিটার্ণ প্রশ্নে সুনীত হঠাৎ থমকে গেল। "আপনারা বলতে আমি দিল্লি 'মীন্‌' করেছি। আপনি কথায় কথায় দিল্লি দিল্লি করেন তো, তাই।"

"আমি আপনাদের মত ট্রাইবাল নই মশাই। আমি সভ্যতায় বিশ্বাসী। আমি কস্‌মোপলিটান। আমি ইণ্ডিয়ান। বাঙ্গালী নই। বুঝলেন। আমি আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। দিল্লি এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু। তাই আমি বার বার দিল্লির কথা বলি।"

সুনীত বলল, "আপনাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কী বস্তু আমার জানা আছে। এই সহযোগিতার নামে আপনারা মগজ বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। আর জাপানী চাষী এসে আপনাকে চাষ করা শেখাচ্ছে। জার্মান কারিগর এসে আপনাকে বাস করা শেখাচ্ছে। এর পর আর কেউ এসে আপনাকে শেখাতে শুরু করবে, কী করে ভাতের গেরাস মুখে তুলতে হয়। আর আপনারা এয়ার-কণ্ডিশন ঘরে বসে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মারাচ্ছেন।"

ব্রজদা সশব্দে একবার কেশে উঠলেন।

সুনীল বলল, "যদি আমাদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেবার টেকনিক কেউ শিখিয়ে দিতে পারে, তবে তার শ্বারস্থ হতে বাধা কি? আপনি কি বলতে চান, কারোর কাছ থেকে আমাদের শেখবার কিছু নেই?"

"আপনি যে প্রাইম মিনিস্টারের মত সংলাপ ছাড়তে শুরু করলেন মশাই, অ্যাঁ।"

"থাম থাম। আর কপচাসনে। ঢের হয়েছে। বাঙালীকে শেখাবে এমন লোক ওয়ার্ল্ডে কোথায় আছে দেখা তো?" আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই ব্রজদা সিগারেটের গোড়াটা সজোরে ছুঁড়ে দিলেন। "বিদেশের দিকে চোখ রেখেই তোরা ডুবলি। না হলে এদেশে অভাবটা কি ছিল? ধান চাষ উন্নয়নের জন্য জাপানী প্রথা চালু করছ। কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখেছ কি, এদেশেরই এক কৃষি পণ্ডিত দারুন দারুন সব আবিষ্কার করে বসে আছে?"

সুনীল যুগপৎ আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে কার মহড়া নেবে, ভাবতে সময় নিচ্ছিল।

ব্রজদা একটা পেল্লায় ধাক্কা মারলেন, "বলি ব্রজশালের নাম শুনেছিস কখনও?"

"ব্র-জ-শা-ল!" সুনীত বেশ করে ভাবল। "না, ব্রজশালের নাম শুনিনি তো। আমরা বরিশালের লোক। গাভা। আহা গাভার তুল্য গ্রাম নেই মশাই। ফাঁকা রাস্তায় লাঠি ঠুকলে পাঁচটা গ্রাজুয়েট ইনজিওর্‌ড্‌ হয়ে হাসপাতালে যায়! আমার কথা বিশ্বাস না হয়, সাহেবী পত্রিকার রিপোর্টার লর্ড মোরলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। উনিও একজন গাভানীজ কিনা। গাভার—"

"অনেক গাবিয়েছেন, এবারে থামুন তো।" সুনীল বিরক্ত হয়ে উঠল। "হচ্ছে ব্রজশালের কথা। উনি এখন গাভাতে বসলেন। আমার তো মনে হয় ওটা কাশ্মীরের কোন একটা জায়গা। শাল তো কাশ্মীরেরই ফেমাস।"

"আজ্ঞে না," ব্রজদা ওকে থামিয়ে দিলেন। "দিল্লি কাশ্মীর ছাড়া তোমার চোখে আর তো কিছু রোচে না আজকাল। ব্রজশাল হচ্ছে এক রকম চাল, খাস পশ্চিমবঙ্গীয় প্রোডাক্‌ট্‌।"

"আতপ না সিদ্ধ?"

ব্রজদা বললেন, "বলাই বাহুল্য, সিদ্ধ। আতপ আর বাংলাদেশে ক'জন খায়?"

সুনীত বলল, "বিধবারা খান আর শ্রাদ্ধের পিণ্ড, দেবতার ভোগ, পুজোর নৈবেদ্য, পরমান্ন প্রস্তুত প্রভৃতি কার্যে প্রয়োজন হয়। আমার আবার আতপ মোটে সয় না। কন্‌স্টিপেশনের ধাৎ কিনা। তা ব্রজদা, ব্রজশাল কি ন্যায্য মূল্যের দোকানে এসে গিয়েছে? কত করে কিলো? তাহলে এবার এটাই না-হয় ট্রাই করে দেখব।"

"দেখবি কি করে!" ব্রজদা হতাশ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। "দেশের লোক কি মদৎ দিল! তারা তো সব বিদেশী এক্‌স্‌পার্টের দিকে চেয়ে আছে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। "আইডিয়া করতে পারবিনে, কী একখানা আবিষ্কার করেছিলাম! খাদ্য উৎপাদনে একেবারে বিপ্লব হয়ে যেত। হা অন্ন হা অন্ন করে দেশ অস্থির হয়ে উঠেছে। মিনিস্টাররা ভাত খাওয়া ছেড়ে লাঞ্চ ডিনার খেয়েও চালের স্টক বাড়াতে পারছেন না। হাজার চেষ্টা করেও সংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীকে ভাত ছাড়িয়ে মাছ, মাংস, ডিম, আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি পুষ্টিকর জিনিস খাওয়া অভ্যাস করাতে সরকার নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। ব্রজশাল পেলে ঘরের ভাত খেয়ে খেয়ে বাঙ্গালী ভ্যাতভ্যাতে হয়ে উঠত। বুঝেছিস।

"টবে কেমিকেল সার দিয়ে একবার বীজ পুঁতে দিলাম। পরদিনই গাছ গজিয়ে টব ভর্তি হয়ে গেল। ব্যস্‌, টবের পরমায়ু যত, সেই গাছেরও তত। যত ছাঁট ততই গজায়। চুলের মত আর কি! আর সেই গাছ থেকে পাচ্ছ ব্রজশাল। না, ধান নয়। ডিরেক্‌ট্‌ চাল। একেবারে ঢেঁকি-ছাটা সেদ্ধ চাল। ভিটামিনে ভর্তি। গন্ধ ভুর-ভুর করছে। মোটে কাঁকর নেই। গাছ থেকে তোল আর হাঁড়িতে ফেল।"

"মানে, চালের গাছ! মাই গ—।" কোটর থেকে সুনীলের অক্ষিগোলক হাইজাম্‌প্‌ মেরে যেন বেরিয়ে পড়বে।

"হাঁ, চালের গাছ। চাল ফ্রম্‌ গাছ। এই চালিয়াৎ গাছই উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তোদের ব্রজদার আশ্চর্য আবিষ্কার। অবদানও বলতে পারিস। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় "ব্রজশাল জনতা" মানে আউসটা সেণ্ট পার্সেণ্ট সাক্‌সেস্‌ফুল। এবারে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করছি "ব্রজশাল নেতা" ভ্যারাইটি নিয়ে। এই ফাইন ভ্যারাইটি-টা আমন থেকে পাব বলেই আশা করছি। ফাইন না হলে নেতাদের পক্ষে আবার হজম করা মুস্কিল তো।"

"কি রে সুনীল," ব্রজদা ওর দিকে টেরিয়ে চাইলেন। "এ জিনিস কন্‌সিভ্‌ করতে মানে মাথায় আনতে জাপানীদের চৌদ্দ পুরুষে পারত?"

সুনীত ব্রজদার আড়াল থেকে সগর্বে সুনীলের দিকে চাইল। সুনীলের প্রতিরোধ ততক্ষণে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

শুকনো গলায় সে বলে উঠল, "ইম্‌পসিবল্‌, আই মীন অসম্ভব। ভানু, এক গ্লাস জল!"

"আচ্ছা ব্রজদা," অতি বিনীত ভাবে সুনীত আর্জি পেশ করল, "এই মানে বালাম চাল নিয়ে ঐ রকম একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করা যায় না! মানে



ডিরেক্‌ট্‌ চাল ফ্রম গাছ

ওটা আবার রোগীর পথ্য কি না। অন্নপথ্যে বালাম চাল আর মাগুর মাছের ঝোল, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে—এর আর জুড়ি নেই। বরিশাল ওয়ার্লডকে দুটি জিনিস দিয়েছে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত আর বালাম চাল। যদি এই ব্যাপারে—"

"নো, নেভার!" ব্রজদা গর্জন করে উঠলেন। "নো কানেক্শন উইথ পাকিস্তান। তোর আর বুদ্ধিশুদ্ধি জীবনেও হবে না নিতে। পাকিস্তানের সঙ্গে এখন চীনের আঁতাত। যদি বালামের মারফৎ সিক্রেটটা চীনে চলে যায়!"

সুনীত তৎক্ষণাৎ জিভ কেটে বললে, "ওঃ সরি! কথাটা আমার মনে ছিল না।"

"তোদের ব্রজদা চারদিকে চোখ রেখে চলে বলেই দেশটা এখনও টিকে আছে। তোদের মত কাছাখোলাদের হাতে থাকলেই গিয়েছিল আর কি? দেশের কথা ভাবতে ভাবতেই তো জীবনটা কেটে গেল।"

ব্রজদা আরেকটা সিগারেট ধরালেন।

"বুঝলি নিতু, (মোলায়েম ভাবে ধোঁয়া ছেড়ে ব্রজদা সুনীতের দিকে চাইলেন) যতদিন দেশ পরাধীন ছিল ততদিন দেশ স্বাধীন করার জন্য ছটফট করেছি। একদিন কাঁঠালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কাদাকে বললুম, দাদা, একটা লাগসই গান লিখে দিন তো, যাতে দেশ একেবারে মেতে ওঠে। ঋষি বঙ্কিম কি গানই লিখলে মাইরি। মরি মরি মরি। গান মানে গানের কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে দেশমল্লারে সুর করে বঙ্কাদার উঠোনে দাঁড়িয়েই গেয়ে শুনিয়ে দিলুম: বন্দে এ এ মা আ আ তর্ অ অ অ অ ম্। বঙ্কাদা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগভরে বলে উঠলেন, 'ভবানন্দ তুমিই ধন্য।' আমার সন্তান-নাম ভবানন্দই ছিল। বন্দেমাতরমের পরের হিস্ট্রি তোরা তো জানিসই। তারপর থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য পরবর্তী জীবনে কত কীই না করলাম? দনাদ্দন বোম ছুঁড়েছি, মশার পিস্তল থেকে সটাস্‌সট্ গুলি। ইংরেজরা আমাকে তো নম্বর ওয়ান শত্রু বলে ডিক্লেয়ার করেছিল।"

"তবে না কি লাট-বেলাটের সঙ্গে", সুনীত একটু থেমে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, "আপনার খুব দহরম-মহরম ছিল?"

ব্রজদা খুব নিবিষ্ট চিত্তে যদুদার কাজকর্ম কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেন। ব্রজদার মনোযোগ তার উপর পড়াতে তিনি লেখা থেকে মুখ তুলে নিঃশব্দে হাসলেন। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা ব্রজদার দিকে ঠেলে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

ব্রজদা জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কার ছবি, যদু?"

"আকবরের। আনারকলি চিত্রে আকবর।"

"অ্যাঁ, আকবর! গ্রেট্ সম্রাট। দারুণ স্পোর্ট্স্ম্যানস্ স্পিরিট! চিরশত্রু প্রতাপ সিংহ সম্পর্কে কী প্রগাঢ় শ্রদ্ধাই না পোষণ করতেন!" ব্রজদা বলে চললেন, "ইংরেজদেরও, বুঝলি যদু, এই স্পোর্ট্স্ম্যান স্পিরিটটা ছিল। আমি ওদের এনিমি নম্বর ওয়ান ছিলাম তো। সেই কারণেই ভয়ানক ভক্তি-শ্রদ্ধা করত আমাকে। মাইডিয়ার ব্রজদা ছাড়া কথাই কইত না। মাঠের লড়াই আমরা কখনো আজকালকার ফতো ছোকরাদের মত ঘরে টেনে আনিনি। দে, দেশলাইটা দে।"

ইংরেজরা চলে যাবার পর ভাবলাম, (ব্রজদা ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন) দেশ স্বাধীন হল বটে, কিন্তু দেশের কাজ কমল না। তাই গঠনমূলক কাজে মন দিলাম। ভাবলাম, অন্ন-সমস্যাটি দূর করাই প্রথম কাজ। আর বাংলা দেশের অন্ন-সমস্যা মানে চালের সমস্যা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে এই জটিল সমস্যাটির সমাধান বের করে ফেললাম। তারই ফলশ্রুতি এই ব্রজশাল। "ব্রজশাল জনতা।" জাপানী এক্সপার্টরা কত ধানে কত চাল, সেটা বড় জোর বের করে দিতে পারে; কিন্তু বিনে ধানে কত চাল, সেটা পারবে বলতে? রিয়েল বোটানি ক'টা লোক জানে? বেশির ভাগই তো ফুটানি মারে। এবার আমার গবেষণাটা শোন।

অন্ন-সমস্যার স্বরূপটা তলিয়ে বুঝতে গিয়ে কি দেখলাম? প্রথমেই দেখলাম, বাঙ্গালী ভাত খায়, তারপর দেখলাম ভাত রাঁধতে চাল লাগে এবং চাল গাছে ফলে না। চালকে সেজন্য ধানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এইখানে আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করলাম, (এ কাজ অবিশ্যি ঘরে বসে হয়নি, সারা পঃ বঙ্গ + উঃ বঙ্গ = পঃ বঙ্গ টহল দিতে হয়েছে) ধান আসলে মানুষের খাদ্য নয়। বহু খামারে আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে দেখেছি শতকরা একশটা ক্ষেত্রেই ধান তৃণভোজী পশু এবং পাখীরাই কেবল খেয়ে থাচ্ছে। তাই কবিও গেয়ে গিয়েছেন, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে? কই, মানুষ এসে ধান খেয়েছে—একথা তো বলেননি। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি, মানুষ ভাত না পেলে চিড়ে মুড়ি খই ইত্যাদিও খাচ্ছে, তবুও ধান খাচ্ছে না। এমন কি বাঙ্গালী ধরে এনেও আমি এক থালা ধান এবং এক থালা রুটি তার সামনে দিয়ে দেখেছি, সে বরং ব্যাজার মুখ করে রুটি খেয়ে গেল তবু ধানের থালা স্পর্শ করল না।

তার পর থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁছিলাম, মানুষ এমন কি বাঙ্গালীও (মাংসাশী পশুর কথা ধরছিনে) ধান খায় না। ধানের প্রয়োজন

তাদের হয় না। তাদের দরকার চাল, আর যেহেতু চাল ধানেরই উপর প্র-ধান-ত নির্ভরশীল সেই হেতু মানুষ ও চালের মধ্যে একটি তৃতীয় বস্তুর (অর্থাৎ ধানের) অস্তিত্ব এসে যাচ্ছে। এবং এই বিধৃত অস্তিত্ব অবলুপ্ত করতে না পারলে মানুষ একদিকে যেমন চালের কাছে সরাসরি আসতে পারছে না, অপর দিকে চালও মানুষের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলটা রয়েছে এখানে। এই তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্বে। এই বিষয়টি বুঝে ফেলার পরই আমি গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে পেঁৗছে গেলাম।

তখন চিন্তা করে দেখলাম এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? উপায় একটিই, গাছ থেকে (ধানের মাধ্যমে না গিয়ে) সরাসরি চাল পাওয়া। অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী প্রথা তুলে দেওয়া। অর্থাৎ চালের গাছ সৃষ্টি করা। আবার শুধু চালের গাছ সৃষ্টি করলেই চলবে না, চাল যাতে মজুতদারদের হাতে গিয়ে না পড়ে, সেটাও দেখতে হবে। জগতের অনেক বড় বড় আবিষ্কার মুনাফাখোরদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। অতএব সেদিকেও সতর্ক থাকতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদক এবং ভোক্তা অর্থাৎ যে লাগায় আর যে খায়, এরা দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফাবাজীর বীজ সমাজদেহে থেকেই যাবে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে, যে খাবে তাকেই লাগাতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠবে, শহরের ফ্ল্যাট বাড়ির লোক কি করবে? এই সমস্যার সমাধানও করে ফেললাম, টবে চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করে।

বস্তুত চালের গাছ এমনই এক স্পর্শকাতর উদ্ভিদ যে টবে ছাড়া চাষই হয় না। এক টব চালের গাছ থেকে পাঁচ ব্যক্তিবিশিষ্ট একটি পরিবারের দৈনিক দু-বেলার চাল পাওয়া যাবে। এবং আমি যে কেমিকেল কম্পাউন্ডটি আবিষ্কার করেছি, সেটি হচ্ছে এক প্রকার তরল রাসায়নিক সার, সেটি চালিয়াৎ চারার গোড়ায় নিয়মিত ডোজে সিঞ্চন করে গেলে, ৩৬৫ দিনই সকাল ও বিকালে পরিবারের প্রয়োজনমত 'ব্রজশাল জনতা' গাছ থেকে রেগুলার সাপ্লাই পাওয়া যাবে।

তাহলেই দেখ, এই "ব্রজশাল জনতা" চাষ করার ভার যদি সরকার টেক আপ করে, তাহলে, (১) চালের সমস্যা মিটে যাওয়ায় সরকারের শিরঃপীড়া কেটে যাবে এবং (২) অবিলম্বে ধান চাষ বন্ধ করে দিয়ে সেই জমিতে বিদেশী মুদ্রা অর্জনযোগ্য ফসল ফলাতে পারা যাবে। অতএব দেখছিস তো, 'ব্রজশাল জনতা' ছাড়া খাদ্য-সমস্যার আর অন্য কোন সমাধানই নেই।

"আচ্ছা ব্রজদা", ব্রজদা থামবার সঙ্গে সঙ্গে সুনীত প্রশ্ন করল, "আপনি চাল গাছের চারা পেলেন কোত্থেকে?"

"ধানের ভিতর যেমন চাল থাকে", ব্রজদা জবাব দিলেন, "ত্রিকালদর্শী কবির ভাষায় যেমন লুকিয়ে আছে সকল পিতা সব শিশুদের অন্তরে, তেমনি ধানের চারার ভিতরেই চালের চারাও থাকে। সেইটে আমি সুকৌশলে বের করে নিয়েছি। সেটা বের করা এমন কিছু শক্ত নয়, বোটানিক্যাল অপারেশন করে ধানগাছের শীষের খোসা ছাড়িয়ে নিলেই চালগাছের শীষ বেরিয়ে পড়ে। শক্ত হচ্ছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে ফলবতী করা। যতদিন পর্যন্ত না আমি ঐ কেমিকেল কম্পাউন্ড আবিষ্কার করতে পেরেছি, ততদিন ব্রজশালের একটা চারাও বাঁচাতে পারিনি। তেমনি সেই তরল রাসায়নিক সারটি আবিষ্কারের পর থেকে একটি সিংগিল চারাও মরেনি। হাজার ডাইলিউশনের এক এক ফোঁটায় চালিয়াৎ গাছে চাল ফুটিয়ে ছেড়েছি। বুঝলি! ইউ-এন-ওর ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন চেয়েছে ফর্মুলাটা। দেখি, এদেশে যদি কেউ গেরাজ্যি না করে তো ফরেনারদের হাতেই তুলে দেব। সেখান থেকে ঘুরে যখন এখানে আসবে, তখন এরা মাথায় তুলে নাচবে।"

ব্রজদা উঠে পড়তেই সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কিন্তু সেই ফর্মুলাটা কি, ব্রজদা?"

ব্রজদা বললেন, অ্যামোনিয়াম্ ট্রাইক্লোরোনাইট্রেট্ ডাই মিথাইল্-টেট্রা-কার্বন্-পটাশিয়াম্ ফেরোক্সাইড হাইড্রো কারফার্মাকোপিয়াম্ ফস্ফেট্ উইথ হার্মোনিয়াম্ ক্লারিওনেট এবং ক্লোরোফিল্। সংক্ষেপে B C C—মারতে যেও না, পেটেণ্ট নেওয়া আছে।"

"B C C?"

"হ্যাঁ," ব্রজদা স্মিত হেসে বলে উঠলেন, "ইংরাজি নাম না দিলে তোদের এদেশি সাহেব এক্স্পার্টরা তো আবার বুঝতে পারবে না। ওটা হচ্ছে ব্রজদাজ্ কেমিকেল কম্পাউন্ডেরই আদ্যক্ষর। আচ্ছা উঠি।"

"আর তার উপর সেই দুর্ভেদ্য দুর্গম এলিফ্যাণ্ট গ্র্যাসের বন। এই ঐরাবতী ঘাস যে কি ভয়ানক জিনিস, যে না দেখেছে সে কল্পনাও করতে পারবে না। বিপদের উপর বিপদ, আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। একে ঘোর অমাবস্যার রাত্রি তার উপর মেঘে ঢাকা তারা। অন্ধকার একেবারে ঘুরঘুট্টি। কে বেশি জমাট? সেই নিশ্ছিদ্র ঐরাবতী ঘাসের বন, না অমানিশার সেই কুটিল করাল ভয়াল অন্ধকার? তা বলতে পারব না। তবে সেদিনের কাহিনী স্মৃতিপটে জাগরূক হয়ে উঠলে আজও শিউরে উঠি।"

সম্ভবত শিহরণটা হজম করার জন্যই ব্রজদা যদুদার কাছ থেকে আবার একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

"আকাশ, প্রান্তর, সব সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে বিলীন হয়ে গিয়েছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। না ফেলে তো উপায় নেই। সেই চার-মানুষ উঁচু ঐরাবতী ঘাসের নিবিড় অরণ্যে ঢুকলে ণত্ব ষত্ব জ্ঞান বজায় রাখা সম্ভব নয়। নাকের ডগার বাইরে তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছিস না সেখানে, বুঝতে পারছিস কি ক্রিটিক্যাল সিচুয়েসান। মনে হচ্ছিল আমি যেন করাল-বদনী শ্রীশ্রীকালীমাতা ঠাকুরানীর কাজল দিয়ে নিকুনো জঠরে আলকাতরার ড্রামে চড়ে হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই ভয়াবহ গোলক-ধাঁধায় একবার দিক হারালে আর দেখতে হবে না। আর আমার ধারণা ক্রমশই দৃঢ় হচ্ছিল যে, আমি পথ হারিয়েছি। বেলজিয়ান কঙ্গোর সেই ঘাসের অরণ্যে পথ হারানো যে কী—"

"যাচ্চলে, বেলজিয়ান কঙ্গো আব্বার কোত্থেকে এল।" সুনীল ঝাঁ করে বলে বসল।

ব্রজদা বললেন, "ভূগোল থেকে। এসব তো আর কোনদিন উল্টে দেখ—"

"কিন্তু আপনি তো ছিলেন পশ্চিমঘাটে, বলছিলেন সেই ভ্রমণের কথা।"

"আরে তাই তো!" সুনীত এতক্ষণে সাড়া দিল। "সেই জন্যই আমার কেমন গোলমাল ঠেকছিল। লিংকটা ধরতে পারছিলাম না।"

টিকটিকি যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তেলাপোকা সম্পর্কে পরম নির্বিকার ভাব দেখায়, ব্রজদার ভাবখানাও তেমনটি হয়ে উঠল। তাঁর কণ্ঠ থেকে উত্তেজনা-হীন এক প্রশ্ন ভেসে এল, "কিসের লিংক খুঁজে পাচ্ছেন না নিতুবাবু?"



নাকের ডগার বাইরে কিছু দেখা যায় না

তেলাপোকাটা নিজেই গুটি-গুটি হেঁটে টিকটিকির মুখের কাছে চলে এল

"এই মানে," সুনীত বলল, "ওই যে সুনীলবাবু যে পয়েণ্টটা তুললেন পশ্চিমঘাট আর বেলজিয়ান কঙ্গোর যোগসূত্রটা—মানে দুটো আলাদা মহাদেশ তো!"

"ভ্রমণ করছিলেন পশ্চিমঘাটের বনে," সুনীল এতদিনের ঝাল যেন সব মিটিয়ে নেবে, "চট করে বেলজিয়ান কঙ্গোয় চলে গেলেন কি করে?"

"কেন, মন্তাজ শটে।" ব্রজদা সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, "পড়াশুনার বালাই যে নেই, তা তো বুঝতেই পারছি। বাংলা দেশে ভ্রমণ-কাহিনী আজকাল তো এই মন্তাজ টেকনিকেই লেখা হয় রে, মুখ্যু। বাংলা বই-টই পড়িসনে, না কি?"

"না, মানে ঠিক সময় করে উঠতে পারিনে আর কি। আর তা ছাড়া ব্রজদা," সুনীল অমায়িক হবার চেষ্টা করল, "যতদিন না বাংলা ভাষায় পেঙ্গুইন কি পকেট বুক সিরিজের আমদানী হচ্ছে, ততদিন, সত্যি বলতে কি, বাংলা বই ইনটেলেকচুয়ালদের হাতে উঠবে না। জাতে উঠবে না। অর্থাৎ ইজ্জৎ বাড়বে না। পেঙ্গুইন হচ্ছে বুদ্ধিবাদীদের প্রতীক। অবিশ্যি বাংলা বই না পড়লেও খবরাখবর রাখি। এটা একটা ভাল লক্ষণ, স্বাস্থ্যের লক্ষণও বটে যে, বাংলা সাহিত্যে ইওরোপের নিউ ওয়েভ দেখা দিচ্ছে। অ্যাংরি ইয়ংম্যান, বীটনীকদের আবির্ভাব হচ্ছে। আকজাঁস্তাঁসিও দর্শন—"

সুনীত বললে, "কি বললেন কথাটা?"

"কেন. আকজাঁস্তাঁসিও।" সুনীল অবজ্ঞার হাসি ঠোঁটে ছড়িয়ে বলল, "অবিশ্যি আপনার পক্ষে না জানবারই কথা, কথাটা ফরাসী কি না। ইংরাজিতে বলে এক্‌জিস্‌টেন্‌সিয়ালিজম্‌। সাত্রের, কেমুস—ওদেরই ফিলসফি বুঝলেন। ফরাসীরা মশাই এমনই জাত, ওয়ার্লড লিটারেচারে ওদের ইনফ্লুয়েন্স না পড়ে উপায় নেই। এই যে ব্রজদা যার কথা বললেন, মন্তাজ—আহা ওঁর মত প্রতিভা ক'জনের হয়? সত্যি বলতে কি, ভির্লেন, র‍্যাম্বোঁ, মন্তাজ—এঁরা হলেন—"

"মন্তাজ?" সুনীত ভয়ে ভয়ে বললে, "আপনি কি মন্তেনের কথা মিন করছেন?"

সুনীল বলল, "ইংরেজরা ওকে মন্তেনই বলে বটে। ফরাসীতে লোকটির নাম হচ্ছে মন্তাজ।"

"তোমার মুণ্ডু!" ব্রজদা এতক্ষণ বিশ্ব-সাহিত্য সম্পর্কে সুনীলের যতিহীন ফ্লো দেখে ফুঁসছিলেন, এবারে ফেটে পড়লেন। "ফরাসী না হাতি! মন্তাজ হচ্ছে রাশিয়ান। না, কোন লোক-টোক নয়। ওটা হচ্ছে সিনেমার একটা টেকনিক। যুগান্তকারী টেকনিক। বুঝেছ! তোর খুপরির উপরটা দিন দিন কেন যে সাহারা হয়ে উঠছে, এখন তা বুঝলাম। বাঁচতে চাস তো চাঁদিতে

বন মহোৎসব লাগা।”

সিগারেটে গোটাকতক টান দিতেই ব্রজদার উত্তেজনা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়ে এল।

যদুদা বিনীত ভাবে নিবেদন করলেন, “মন্তাজ কথাটায় কেমন যেন একটু বাংলা বাংলা গন্ধ মিশে আছে, ব্রজদা। অন্তত আমার কানে তো তাই লাগে।”

“লাগবেই তো,” ব্রজদা সোৎসাহে বলে উঠলেন। “ও কানের বনেদ যে পাকা। তোমার পেটে যে বিদ্যে আছে বাওয়া। ও তো আর ফেকলু পার্টির কর্ণেন্দ্রিয় নয়। তাহলে কথাটা বলেই ফেলি যদু, কথাটা বাংলাই। মন্তাজ অর্থাৎ মন তাজা—সন্ধি করার পর অন্তের আ বিলুপ্ত হয়েছে। যথা মহা-রাজার স্থলে মহারাজ। মন্তাজ নামটা যে আমারই দেওয়া। আইজেনস্টাইনকে—আইনস্টাইন নয় বুঝেছ সুনীল—আইজেনস্টাইন হচ্ছে রাশিয়ার প্রমথেশ বড়ুয়া, গ্রেট ফিলিম ডিরেকটার—ফন্দীটা আমিই বাতলে দিয়েছিলাম কিনা। তখন সিনেমা শটের গতি ছিল কাট্ আর ডিজল্ভ্ আর ডিজল্ভ্ আর কাট। ঐ থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। আইজেনস্টাইন বললে, ‘ব্রজদা, আর তো পারিনে, অরুচি ধরে গেল যে। একটা উপায় বাতলাও, দোহাই যাতে—’ বাধা দিয়ে বললাম, যাতে মনটা তাজা হয়, এই চাও তো। হাত দুটো চেপে ধরে বললে, ‘হ্যাঁ, দাদা।’

বললাম, তথাস্তু। ব্যস, তারপর হয়ে গেল মন্তাজের জন্ম।

“বাঙ্গালীর আবিষ্কার। বাঙ্গালীই খবর রাখে না। এ দেশের দুঃখু ঘুচাবে কে? ভাগ্যি ভাল যে, রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গমাতা মনের দুঃখে পরিবার পরিকল্পনার আশ্রয় নেননি। তাই না বাংলা সিনেমায় ইদানীং মাণিকপীরের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। বিদেশে বাংলা ছবির ইজ্জৎ বাড়ছে আর কফি হাউসে, রেস্তোরাঁয় চ্যাংড়া ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা ‘র’ কফির পেয়ালায় চুমুক মারতে মারতে আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন, ডি সিকা, ফেলিনি, কুরুশোয়া ঝাড়ছে। ব্যাটাচ্ছেলেরা নিজেদের ঘরের দিকে কোনদিন চোখ তুলেও একবার উঁকি মারলে না। একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করলে না, এসবের মূলে কে?”

ব্রজদা সুনীলের দিকে মুখ ফেরাতেই সে মরীয়া হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করল। “তারপর ব্রজদা, আপনি তো মন্তাজ মেরে এশিয়া থেকে একেবারে আফ্রিকায় গিয়ে পড়লেন। কোথায় ভারতের পশ্চিমঘাট আর কোথায় বেলজিয়ান কঙ্গো। এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশ। লম্বা পাড়ি, সন্দেহ নেই।”

“নিতু”, ব্রজদার আহ্বানে সুনীতের বুক গুরগুর করে উঠল। “তুমি এর মধ্যেকার লিংকটা ধরতে পারনি, বলছিলে না? শোন তাহলে, লিংকটা কোথায়

দেখিয়ে দিচ্ছি। এবারে তাহলে আমাকে একটু ভূতত্ত্বে ঢুকতে হবে! বৈজ্ঞানিকেরা এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, বহু আগে এশিয়া এবং আফ্রিকা এমন কি অস্ট্রেলিয়াও একই ভূখণ্ডে ছিল। কোনকালে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে (ভূমিকম্পটা কিন্তু ভূতাত্ত্বিকদের পরম বন্ধু। ভূমিকম্প না থাকলে বহু থিয়োরি বার করতে তাত্ত্বিকদের হৃদ্‌কম্প দেখা দিত বুঝলি) লোহিত সাগরের অঞ্চলটা দেবে গিয়ে দুটো দেশের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। তবু সুয়েজ যোজক যতটুকু বা আফ্রো-এশীয় সংহতি রক্ষা করছিল, সাম্রাজ্যবাদী ইঞ্জিনীয়ার ফার্দিনান্দ দি লেসেপস্‌ ঘ্যাঁচ করে সেটা কেটে খাল বানিয়ে দিলে তার বারোটা বাজিয়ে! বর্তমানে স্বাধীন হবার পর, বান্দুং সম্মেলনের পর থেকে আবার আফ্রো-এশীয় সংহতির চেষ্টা জোর শুরু হয়েছে। এই সম্মেলন আহ্বানের আইডিয়াটাও এই ব্রজ কারফর্মারই। জবাহরকে বলতেই সে লুফে নিয়েছিল। এবার বুঝলে লিংকটা কোথায়?"

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, (ব্রজদা শুরু করলেন) বেলজিয়ান কঙ্গোর সেই সুগভীর ঘাসের অরণ্যে সেই জটিল গোলক-ধাঁধায়, সেই কুটিল অমানিশার অন্ধকারে, সেই মেঘাবৃত অম্বরে, মাঝরাত্তিরে পথ হারিয়ে ফেলা যে কী ভয়ানক, কী ভয়াবহ, কী ভয়াল ভয়ঙ্কর, মারাত্মক একটা ভুল, তা যে আফ্রিকাকে না জানে, সে বুঝতে পারবে না। প্রবল তৃষ্ণায় আমার আকণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে যে জল ছিল তা দুপুর বেলাতেই ফুরিয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কত যুগ জল খাইনি।

তোরা হলে তো অনেক আগেই গড়িয়ে পড়তিস্‌। তোদের টোন করা মাখন তোলা শরীরের কাপ অনেক আগেই ছটকে যেত। তবে কিনা আফ্রিকার জঙ্গলে আমার ঢের ঘোরা আছে, পথ ঘাট এমন মুখস্থ যে চোখ বেঁধে হাতে ঠিকানা ধরিয়ে দিলেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাব।

"তাহলে," সুনীল বাধা দিল, "পথ হারালেন কি করে?"

"পথ আবার কখন হারালাম?" ব্রজদা বিস্মিত।

"আপনি নিজেই তো বললেন," সুনীল ব্রজদার কথা হুবহু উগরে দিল, "সেই সুগভীর ঘাসের অরণ্যে, সেই জটিল অমাবস্যায়—"

"জটিল গোলক-ধাঁধায়, সেই কুটিল অমানিশার (অমাবস্যায় নয়, মিস্‌-কোট করো না) অন্ধকারে—" ব্রজদা শুধরে দিলেন।

"হ্যাঁ", সুনীল ত্রুটি স্বীকারের ভঙ্গীতে মাথা নোয়াল। "সেই মেঘাবৃত অম্বরে, মাঝ রাত্রে পথ হারিয়ে ফেলা যে কী ভয়াবহ—"

"কী ভয়ানক।" ব্রজদা আবার শুধরে দিলেন, "প্রথমে কী ভয়ানক তারপরে কী ভয়াবহ। তারপর কী ভয়াল ভয়ঙ্কর—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তাই।" সুনীল শুরু করল, "মারাত্মক একটা ভুল, তা যে

আফ্রিকাকে না জানে, সে বুঝতে পারবে না।" কোটেশানখানা শেষ করতে সুনীলের দম প্রায় বেরিয়ে গিয়েছে। আবার শুরু করবার আগে তাই একটু জিরিয়ে নিল। "কি, বলেননি একথা একটু আগে?"

"হ্যাঁ, বলেছি।"

"তবে!" সুনীল শক্ত করে টেবিলটা চেপে ধরে বলে উঠল, "এটা কি আপনার পথ হারানোর স্বীকারোক্তি নয়?"

"আজ্ঞে না সার্, ওটা হচ্ছে সাহিত্য।" ব্রজদা বললেন, "ঐ অবস্থায় পথ হারানোর ভুলটা মারাত্মক, সেটা বলা আছে, কিন্তু আমি সেই ভুলটা করেছি, সেটা কি বলেছি? আর অমন ভুল আমি করতে যাবই বা কোন দুঃখে?"

"যদি আপনি পথ না হারান, তবে ঐ ধরনের একটা ইঙ্গিতই বা দিতে গেলেন কেন?"

"তাই যদি বুঝবে, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি? টাইপরাইটার ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে রিপোর্ট না লিখে, তাহলে তো খান সাতেক ভ্রমণকাহিনীই লিখে ফেলতে পারতে! ওটা হচ্ছে রচনার টেকনিক। ওকে বলে সাসপেন্স। ওটুকু না রাখলে পাঠকদের বুক ধুকপুকও করবে না, আর বই ছাপালে তার খদ্দেরও জুটবে না। ভ্রমণ-কাহিনী জীবনে লিখেছ কখনও? আফ্রিকার কথা ছেড়েই দে, আমাদের কেদার-বদরীর কথাই ধর না, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এমন বুড়োবুড়িও গট গট করে কেদার-বদরী পাড়ি মারছে। কিন্তু তাই নিয়ে আমাদের রাইটাররা কি কাণ্ড করেছে দ্যাখ; তাই যখন কচি মহারাজদের বিগলিত রচনা বের হচ্ছে, কি ঝানু রাইটারদের মহা মহা প্রস্থানের রোমহর্ষক সব বিবরণ বেরুচ্ছে, তখন সেগুলোর এডিশান হু হু করে কেটে যাচ্ছে। কেন? না, যে সাসপেন্স ভ্রমণে থাকে না, সেটা ভ্রমণকাহিনীতে পুরো মাত্রায় পাওয়া যায়। ভ্রমণ করা এক বস্তু আর তার কাহিনী—সে অন্য জিনিস। বুঝেছ। ভ্রমণ-কাহিনীতে রগরগে সাস্পেন্স আর ডগমগে রোমাঞ্চ—এই দুই-ই থাকা চাই। ইচ্ছে হয় শোন, না হয় কেটে পড়।"

ব্রজদার গলায় চরম প্রস্তাব ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। স্তবস্তুষ্ট ব্রজদা যদুদার কাছে সিগারেট চাইতেই বুঝলাম ফাঁড়াটা কাটল।

তেষ্টায় গলা কাঠ। মনে হচ্ছিল (ব্রজদা দেশলাইটা যদুদার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন) কত যুগ যেন জল খাইনি। কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম বাবাকাকু দেশের সেই অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যার কথা। আহা, কী নিটোল কালো দেহ। সারা দেহে যৌবন পিছলে পড়ছে। চোখ

একবার পড়লে আর ফিরতে চায় না। আর কী গানের গলা! আর কী মিষ্টি মধুর নাম। আবলুশা। বাবাকাকু সম্প্রদায় পৃথিবীর আদিমতম এক সভ্য সম্প্রদায়। সেবার পশ্চিমঘাট পর্বতে ভ্রমণ করার সময় আমি সর্বপ্রথম বাবাকাকু সম্প্রদায়ের একটি বৃদ্ধের সংস্পর্শে আসি। চিতাবাঘের কবল থেকে তাকে বাঁচাই। সেই থেকে তার সঙ্গে আমার খাতির জন্মে যায়। সেই বৃদ্ধ মরণকালে আমাকে অদ্ভুত এক ইতিহাস শোনায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অর্জুনের তত্ত্বাবধানে ষাট হাজার যাদব রমণী দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে আসছিল। পথে দস্যুরা বহু রমণী লুটে নিয়ে যায়। সেই সময় সত্যভামার মামাতো বোন কৃকলাশাকে নিয়ে এক দস্যু, তার নাম হাবাগোবা, কৃষ্ণ মহাদেশে উপস্থিত হয় এবং টাঙ্গানিকা হ্রদের ধারে বসতি স্থাপন করে। এই বাবাকাকু সম্প্রদায়ের বাবা আদম আর জননী হবা হচ্ছেন ঐ হাবাগোবা আর কৃকলাশা।

কাহিনীটা শোনা অবধি বাবাকাকুদের দেশে যাবার বাসনা আমার প্রবল হয়ে উঠল। তারপর একদিন খুঁজে খুঁজে তো সেই দেশে উপস্থিত হলাম। বিদেশী দেখে তারা তো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। আমাকে অতর্কিতে পিছমোড়া করে বেঁধে একেবারে সর্দারের সামনে নিয়ে গেল। সর্দারের চেহারাখানা কী। যেন মিনিয়েচার পাহাড়ের চুড়ো একটি। তাঁর সামনে আমাকে নিয়ে যেতেই তাঁর ভাঁটার মত চোখ দুটো আমাকে যেন বেশ করে গুঁতিয়ে দিলে।

সর্দার কিছু বলার আগেই আমি স্বর যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে তুলে বলে উঠলাম : বুবু বাবু কিকু।

সঙ্গে সঙ্গে কী প্রতিক্রিয়া! সেই বিশাল জনতা শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করে বলে উঠল, বুবু বাবু কিকু।

আমি বললাম : ভোর ভয়ি ভোর ভয়ি হুঁকা।

ওরাও আবৃত্তি করলে : ভোর ভয়ি ভোর ভয়ি হুঁকা।

“এটা কি ভাষা?” সুনীত মুখ ফস্কে বলেই চুপ মেরে গেল।

“বাবাকাকুদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ। বৃদ্ধ প্রচুর যত্নে আমাকে শিখিয়েছিল। তারপর শোন।”

ঐ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সর্দার আর পুরোহিতের মুখ কালো হয়ে গেল আর জনতার সে কী উল্লাস। তারা পাগলের মত ছুটে এসে আমার বন্ধন মুক্ত করে দিলে। তারপর সেই জনতার কাঁধে কাঁধেই আমি রাজধানী টাবুটুবু শহরটা ঘুরতে লাগলাম। শহরের শেষ প্রান্তে জীর্ণ এক দুর্গে ওরা আমাকে নিয়ে ঢুকল। এত লোকের সোল্লাস ধ্বনি আর চিৎকারে অবাক হয়ে একটি তরুণী অলিন্দে এসে দাঁড়াল। আমি চমকে গেলাম। চোখ আর ফেরাতে পারলাম না। এ কে? কেলেসোনা কথাটাই শুনেছি। এবারে চাক্ষুষ হল ভাই। হবে না কেন? যদুবংশের রক্ত এখনও ধমনীতে বইছে তো।



বুবু বাবু কিকু

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমি বলে উঠলাম : বুবু বাবু কিকু।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আকাশে একটা হাত তুলে যেন বংশীধ্বনি করল : বুবু বাবু কিকু। ইয়া হু।

বুবু বাবু কিকু। ই—য়া হু। জনতাও সঙ্গে সঙ্গে এই চীৎকার করতে করতে আমাকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করল। তারপর এক সময় আমাকে ছুঁড়েই অলিন্দে তুলে দিল।

মেয়েটির চোখে চোখ রেখে একেবারে বঙ্কিমী স্টাইলে বললুম, 'সুন্দরী, বুঝিয়াছি তুমিই রাজকন্যা আবলুশা?'

রাজকন্যা বললে, "মদীয় পিতৃদেবই একদা বাবাকাকুদের অধীশ্বর ছিলেন। কুচক্রী পুরোহিত কুচুচুকি আর বেইমান সেনাপতি ভোগাভুগির চক্রান্তে তিনি নিহত এবং আমি এই দুর্গে বন্দী। অদ্য আমার ষোড়শ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইল। শয়তান রাত্রে আমাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া সিংহাসনে বসিবে। হা হতোস্মি! ভদ্র, আপনাকে বিদেশী এবং দয়াবান ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এবং আপনার শরীরের লক্ষণাদি দেখিয়া বিশ্বাস হইতেছে, আপনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং এখানেই বা কিরূপে আসিলেন?"

আমি তখন আদ্যন্ত স্টোরিটা বললাম।

শুনে আবলুশা বললে, "হ্যাঁ, সেই বৃদ্ধ আমারই জ্যেষ্ঠতাত, তীর্থ করিতে দ্বারকা গমন করিয়াছিলেন। হায় তাত!" তার চোখ ছলছল করে উঠল। এবং তাকে সান্ত্বনা দেবার আগেই সে শচীন কর্তার সুরে একটা করুণ গান গেয়ে উঠল। গানটা বাবাকাকু ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায় : দ্বারকায় রাখলে দেহ, সেখানে ছিল না কেহ, হায় কি দারুণ বিধি। (অবিকল 'মন দিলে না বঁধু' সুর)। সেই অদ্ভুত পরিবেশে সেই অলিন্দে রমণীয় রমণী-সঙ্গের কী যে এফেক্ট! লক্ষ মশার পক্ষ-বিধূননে আমার হৃদয় যেন পিন পিন করে উঠল।

আমি তাকে সান্ত্বনার কথা শোনাতে গিয়ে দেখি আমার মুখ থেকে কে যেন প্লে-ব্যাক করছে : ইয়ে রাত ইয়ে চান্দিনী, পিউ কাহাঁ। গানটা কিছুতেই চেক করতে পারলাম না।

গানটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকাকু সম্প্রদায়ের রাজকন্যা আবলুশা আমার দুহাত ধরে অলিন্দের ধারে টেনে আনল। তারপর বলল, বুবু বাবু কিকু। (অর্থ—পরম শক্তিমান সৃষ্টিকর্তাই আমাদের প্রভু।)

জনতা সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তুলল : বুবু বাবু কিকু, ইয়া হু,—

রাজকন্যা আবলুশা : ভোর ভয়ি। ভোর ভয়ি হুঁকা, (অর্থ—ভোর হল ভোর



ইয়ে রাত, ইয়ে চান্দনী, পিউ কাঁহা

হল। হুঁকো আন। অর্থাৎ আর দেরী নয়, আর দেরী নয়। কাজে ঝাঁপিয়ে পড়।

জনতাও সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ তুলল : ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি, হুঁকা। ইয়া—হু,—

রাজকন্যা আবলুশা আমার হাতটা ওর এক হাতে উপরে তুলে গান গেয়ে উঠল, কাবা কোবা জামা ডোবা ব্রজ বুবা।

কথাটা শুনে লজ্জায় চলাৎ করে আমার রক্ত চলকে উঠল। কান মুখ গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আমি পকেট থেকে শিশি বের করে দুটো তানসেন গুলি খেয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে নিলাম, রাজকন্যা দুম করে এমন একটা প্রস্তাব করে বসবে ভাবিনি। জনতার মধ্যে সে কী প্রচণ্ড উল্লাস। ই—য়া হু—বলে চেঁচিয়ে উঠল সবাই। কোণা থেকে কে যেন সিটিও মারল একটা। মনে হচ্ছিল ওরা যেন এই মাত্তর একটা হিট ছবি দেখে বেরিয়ে এল!

রাজকন্যার হাত থেকে আমার হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি অলিন্দে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। অ্যাণ্টিগনাসের মত স্যালুট করে ধ্বনি তুললাম : ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

আমার মুখে বিজাতীয় ভাষা শুনে জনতা থমকে গেল। ভুল বোঝার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তর্জমা করে দিলাম : লুম লুম লুম্বা লুম।

অমনি প্রচণ্ড মেঘগর্জনে চারিদিক যেন কেঁপে উঠল : লুম লুম লুম্বা লুম! ইয়া—হু। তারপর আমি—

"কিন্তু ব্রজদা", সুনীত নাচার হয়ে বলে উঠল, "রাজকন্যের সংলাপের তর্জমাটাও যদি—"

"সরি", ব্রজদা বলে উঠলেন : "ল্যাংগোয়েজটা তোরা যে জানিস না ভুলেই গেছলুম, (একটু থেমে) ওটা আসলে রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই একটা লাইন : আমার এই থরথর দেহখানি তুলে ধর।"

ওদেশের ভাষাটা বড় অদ্ভুত। বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক সমালোচকদের ভাষায় যেমন চিত্রল চিত্রকল্প, তেমনি পাটল পাটোয়ারি। গদ্যের গাদকত্তা শক্তি যেমন প্রগাঢ়, তেমনি হস্তামলকে কাব্যের লীলায়িত অঞ্চলে চঞ্চল পরশন। যেন গথিক স্ট্রাকচারে গ্রথিত কোন স্থবির স্থপতির অনুপম স্বাক্ষর। এবং তাকে সদাসর্বদার জন্য ঘিরে রয়েছে বালুচর শাড়ির কারুকার্যের অনুরাগ-মণ্ডিত ব্যঞ্জনাময় সঙ্গীতানুভূতির নভশ্চর সচল রামধনু বলয় (তৎসহ এলিয়টের লাগসই কোটেশন), অর্থাৎ এক কথায় বাঙ্ময়তার অবাক প্রতীক। বুঝলি কিছু?

কাবা কোবা জামা ডোবা—আমার এই থরথর দেহখানি তুলে ধর। ব্যস্ পৃথিবীর সব কথা বলা হয়ে গেল। বাকি থাকল অ্যাকশন। (ব্রজদা একটি

সিগারেট ধরিয়ে সিধে হয়ে বসলেন) এবং বলাই বাহুল্য, ব্রজরাজ কারফর্মা ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকার ছেলে নয়। বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রে, যেখানে রাজকন্যা আবলুশা ব্রজর কাছে প্রকাশ্যে আত্মনিবেদন করে তার পৌরুষকে চ্যালেঞ্জ করেছে। সে দেশের নিয়ম হচ্ছে রাজকন্যাকে বিয়ে করলেই সে রাজ্যের অধীশ্বর হতে হবে। সেই কারণেই ওই বদমাস ভোগাভুগিটা কুচক্রী পুরোহিত কুচুচুকির সঙ্গে ষড় করে আজ রাত্রেই আবলুশাকে বলপূর্বক বিয়ে করবার মতলব করেছে। কথাটা চিন্তা করামাত্রই আমার ধমনীতে বিপ্লবী বাঙালীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল।

আমি অলিন্দে দণ্ডায়মান হয়ে তাই সরোষে গর্জন করে উঠলাম, 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ।' জনতা প্রতিধ্বনি করে উঠল, 'লুম লুম লুম্বা লুম।' আমি সাড়া তুললাম, 'সরমায়দারি সরকারকো—' ওরা সাড়া দিলে, 'বুম চাক্ বুম চাক্ চাক্ চাক্ বুম।'

"তার মানে", সুনীত উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, "এক ধাক্কা ঔর দো! তাই না?"

"ফুল মার্কস্। একশ'র মধ্যে একশ'।" ভাষাতত্ত্বে সুনীতের প্রোগ্রেস দেখে ব্রজদা খুব খুশি। "দুম্বা দুম্বা। অর্থাৎ সাধু সাধু!"

তারপরই বুঝলি সেই কিল্লার কার্নিসে দাঁড়িয়ে (ব্রজদা সোৎসাহে শুরু করলেন) দিলুম এক ভাষণ। রাজকন্যা আবলুশার জেঠামহাশয়ের চিতাভস্ম চন্দন কাঠের যে কৌটোয় পুরে এনেছিলুম, সেই কৌটোটা ডান হাতের তালুতে ধরে হাতখানা উঁচু করে (সকলে যাতে দেখতে পায়), সেই কৌটোর দিকে চোখ রেখে বলে চললাম : বাবাকাকু সাম্রাজ্যের মহান্ অধিপতি! তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব! তুমি বলেছিলে—

"এ কী!" সুনীত বলে উঠল, "এ তো সিরাজউদ্দৌলার সংলাপ! ওপেনিং স্পীচ্! আমরা যে পাড়ার ক্লাবে লাস্ট ইয়ারের—"

"সিরাজউদ্দৌলা এ সংলাপ কোত্থেকে পেল শুনি?" ব্রজদার মুখচোখে তৎক্ষণাৎ মহম্মদী বেগের কুটিল ছায়া ভেসে উঠল।

"সুনীতবাবু কিছুই জানে না, ব্রজদা। ওর কথায় কান দেন কেন?"

সুনীত আরেকটু হলেই ফেটে পড়ত। মনে মনে একশ' থেকে এক পর্যন্ত গুনে সে নিজেকে সামলে নিল। সুনীলের দিকে চেয়ে বললে, "দেখুন, যে বিষয়ে কিছু জানেন না, সে বিষয়ে কিছু বলতে না যাওয়াই ভাল। আমি ডেফিনিট, এ স্পীচ সিরাজউদ্দৌলার। লাস্ট ইয়ারে আমি প্রম্প্ট্ করেছি তা জানেন? বাজে বকবেন না।"

"আপনি মশাই, তবু তর্ক করবেন।" সুনীল বলে উঠল। "শুনছেন

ব্রজদার মুখ থেকে, তবু বলছেন সিরাজউদ্দৌলার স্পীচ। ভাল জ্বালা! ভাল করে এনকোয়ারি করে দেখুন আগে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রজদার স্পীচটাই সিরাজউদ্দৌলা স্রেফ গেঁড়িয়ে দিয়েছে।"

"না না, সিরাজের কোন দোষ নেই।" ব্রজদার স্বরে স্নেহ উথলে উঠল। "ওটা শচীন ভায়ার কীর্তি। তবে ভায়া আমার অনুমতি নিতে ছাড়েনি।"

"তাই বলুন।" সুনীত খুশি হয়ে বলে উঠল, "আমার মেমারি যা শার্প না! আই ক্যান চ্যালেঞ্জ এনিবডি।"

"কি তুই মেমারি দেখাচ্ছিস নিতে। আমার--"

"না না, ব্রজদা আপনার কথা তুলিনি।" সুনীত ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ, তারপর?"

তারপর আর কি? ঐ এক ভাষণেই রক্তহীন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেল। ভোগাভুগি আর কুচুচুকিকে ধরে পিপ্‌ল্‌স্‌ কোর্টে আনা হল। বিচারে তাদের সাজা হল। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে তবে না নিশ্চিন্ত! রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সেখানে সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা হল। ঐ যে দুজনের মাথাটা ন্যাড়া করে মানে শেভ করে চার নম্বুরি বল করে দেওয়া হল না, সেই থেকে এই বিপ্লবের নাম হল বলশেভিক বিপ্লব। এইটেই ওয়ার্লডের প্রথম বলশেভিক বিপ্লব। লেনিন আমারই টেকনিকে আরও দশদিন পরে রুশিয়ার বিপ্লব করলে। তার ব্রজদাকে যে সে ভোলেনি, ইতিহাস তার সাক্ষী। সেও রুশ বিপ্লবকে বরাবর বলশেভিক বিপ্লবই আখ্যা দিয়ে গিয়েছে। তবে ওরা টেকনিকটা আরও ইম্‌প্রুভ করেছিল। বলটা ধড়ের উপর না রেখে এক-এক ঝটকানে একেবারে ফিল্ডে নামিয়ে দিয়েছিল।

বাবাকাকু সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছিলুম আমিই! তারপর একদিন ভেবে দেখলুম, গদীতে থাকলে সংগঠনের জোর কমে যাচ্ছে। তাই সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য ব্রজরাজ প্ল্যান ছাড়লুম দেশে। ঐ এক প্ল্যানে হৈ চৈ বাধিয়ে দিলুম। সঁবাইকে গদী থেকে নামিয়ে, যাতে আমি আর আমার ওয়ারিশ ছাড়া আর কেউ কখনো গদীতে না উঠতে পারে, তারই স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলাম। আমি গদীতে গ্যাঁট হয়ে বসে অন্যকে গদী ছাড়তে বাধ্য করলাম। কি রকম পাকা প্ল্যান তোদের ব্রজদা সেই কত আগে করে রেখেছিল, একবার বুঝে দেখ। এখন কত কাজে সেটা লাগছে। কামরাজী প্ল্যানটা তো ব্রজরাজী প্ল্যানেরই দ্রাবিড় সংস্করণ মাত্র।

কোন রকমে আবলুশার গহনার বাক্সটা বাঁচাতে পেরেছিলুম। তাই নিয়ে দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে হাঁটতে অসীমের পথে পা বাড়িয়েছিলুম। কিন্তু কপালে সইল না!

ঐ ঐরাবতী ঘাসের ঘন জঙ্গলে শেষ পর্যন্ত তাকেও হারিয়ে ফেললাম। দিন যে কী করে পথ খুঁজে বের করেছি সে এক আমিই জানি আর জানে ই তারাটি—যার মুখপানে চেয়ে চেয়ে পথ খুঁজে বাড়ি ফিরেছিলুম।

"ধ্রুব তারাটি বুঝি?"

"না, চেনবার মধ্যে ঐ এক বস্তা-পচা বারোয়ারি তারাটাই তো চিনে খেছ!" ব্রজদা বিরক্ত হয়েই উঠে পড়লেন। "আমার ফেভারিট স্টার অরুন্ধতী। ক আকাশে আর কি ফিলিমে, ঐ একটাই তো ভরসা।"

ষোড়শ গল্প

সুনীল বলল, "ঠান্ডা কাকে বলে এবারে লন্দাখে গিয়ে তা টের পেয়েছি। চুশুল এয়ার স্ট্রীপে নামা মাত্র হাত পা জমে—"

"চুশুল?" সুনীত বলল, "তার মানে আপনি লাডকের কথা বলছেন?"

সুনীল গোটা কতক রিং ছুঁড়ে নিবিষ্ট মনে সিগারেটটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর সেইদিকে চোখ রেখেই শান্তভাবে টেনে টেনে সুনীতের কথার জবাব দিল, "লন্দাখ। দিল্লিতে আমরা লন্দাখই বলি। ওইটেই কারেক্ট উচ্চারণ। আপনাদের কলকাতায় আপনারা কি বলেন, জানিনে।" বলেই যদুদার দিকে চেয়ে টেবিলে আঙুল ঠুকে টুইস্ট নাচের তাল বাজাতে লাগল।

আগেকার আমল হলে সুনীত এসব গ্রাহ্যই করত না। তবে কি না কিছুদিন হল ও টের পেয়েছে যে ওর মধ্যে পার্সন্যালিটি গজিয়ে উঠেছে। তাই এখন ও আর কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। বিশেষ করে যেখানে পার্সন্যালিটির প্রশ্ন জড়িত।

"থামুন মশাই, দিল্লি আবার একটা জায়গা, তার আবার নজির। কালচারের বিন্দুবিসর্গও যেখানে নেই। কতকগুলো আপস্টার্ট আর স্নবের আড্ডা।"

সুনীল বিচলিত হল না। টকাটক টকাটক আঙুল ঠুকতে ঠুকতে পার্লামেন্টারি কায়দায় জবাব দিল, "মাননীয় সহকর্মী বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে, আমাদের সংবিধানে দিল্লিকে ভারতের রাজধানী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন দিল্লিকে অবমাননা করা সংবিধানকেই অবমাননা করা। সম্ভবত মাননীয় সহকর্মী মহোদয়কে এটাও স্মরণ করিতে দিতে হবে না যে ভারতরক্ষা আইন বলবৎ থাকা কালে সংবিধানের মর্যাদাহানিকর কোন মন্তব্য অথবা বক্তব্যাদির প্রকাশ কী ঘোরতর পরিণাম ডেকে আনতে পারে!"

সুনীত বেজায় ঘাবড়ে গেল। বিপন্নভাবে একবার যদুদার মুখের দিকে চাইল। তিনি নন্-এলাইনড দৃষ্টিতে নিজ কাজে মন দিলেন। কাজেই সুনীত আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে ওর পার্সন্যালিটিটাকে কিঞ্চিৎ খাদে নামিয়ে এনে বলল, "বা, হচ্ছে লাডকের কথা, এর মধ্যে সংবিধান অবমাননার কথা এল কি করে?"

"লন্দাখের কথায় এ প্রশ্ন ওঠেনি, আপনি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন স্যার। দিল্লি সম্পর্কে আপনি যে কটূক্তি করেছেন, সেই সম্পর্কেই উঠেছে এবং আ

সঙ্গত কারণেই। এমার্জেন্সির মধ্যে এই জাতীয় অ্যান্টি-ন্যাশনাল ফিলিং কোন সরকারই বরদাস্ত করতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের রায় দেখেছেন তো, ডি আই রুলে একবার ধরলেই শ্রীঘর। নো আপীল স্যর।" সুনীলের আঙুল সমানে টুইস্ট নেচে চলল।

সুনীত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কথাটা ওভাবে পুট করাটা আমার হয়ত ভুল হয়েছে। দিল্লিতে ভাল জিনিস কিছুই নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ইন্ ফ্যাক্ট আমি সব সময় নেহরুকে সাপোর্ট করি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, কতকগুলো মানে এক শ্রেণীর আপস্টার্ট আর স্নব মিলে যে সো-কল্ড কালচার দিল্লিতে সৃষ্টি করেছে সেটা ভাল না, মানে হয়ত ভাল, তবে আমার সেটা ভাল লাগে না, এই আর কি। আই থিঙ্ক আই অ্যাম ক্লিয়ার?"

সুনীল বলল, "হ্যাঁ, এইভাবে বললে ক্ষতি নেই। আইন আপনাকে ছুঁতে পারবে না। যদিও আপনার এই ট্রাইবাল দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমি একমত নই। দিল্লির কালচার কস্‌মোপলিটান, আর্বান, মডার্ন। ফুল্ অফ্ লাইফ্। মডার্ন ইণ্ডিয়া, ডেভেলাপিং ইণ্ডিয়ার হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে চান তো দিল্লি চলুন। সোসাইটিতে পার্টিতে মিশুন। দেখবেন, প্রাণচঞ্চল হৃদ্‌পিণ্ডগুলো কেমন ডপ্‌লপ্ ডপ্‌লপ্ করছে। কলকাতা তো মশাই ড্যাম্প-লাগা ড্যাব-ড্যাবে ডুগি। চার্ম এখানে আছে কি?"

"যা বলেছিস মাইরি!" ক্যামেরার ব্যাগটা টপ করে টেবিলের উপর রেখে ফটোগ্রাফার বিশু সুনীলের প্যাকেট থেকে খপ করে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললে, "আর দিল্লির মেয়েগুলো! ওফ, এক একটা যেন গঁদের লাড্ডু! দ্যাখ সুনীল, এবারে তুই দিল্লিতেই ঝুলে পড়, বুঝলিস্।"

"ইচ্ছে তো আছে, মানে কিছুটা এগিয়েওছি কিন্তু আর আগে বাড়তে সাহস পাচ্ছিনে।"

"সাহস পাচ্ছেন না।" সুনীত লাফিয়ে উঠল, "হোয়াই?"

বিশু বলল, "সুনীলটা চিরকালই এক রকম থেকে গেল। টাক গজিয়ে গেল কিন্তু বয়েস আর বাড়ল না। রিহার্সেলে বাবু আমার খুবই দড়, কিন্তু স্টেজে উঠলেই সব গড়বড়।"

"দেখুন মশাই", সুনীত বলল, "কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয়, আপনার পার্সন্যালিটি গ্রো করা দরকার। আপনি কয়েকটা কোর্স ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিন তো। ওতে আপনার জেনারেল হেল্‌থ ইম্প্রুভ করবে। কিংবা ভাল একজন ডেন্টিস্ট—"

"ডেন্টিস্ট? ডেন্টিস্ট কেন? আমার দাঁতে তো কোনও ট্রাবল্ নেই।"

বিশু বলল, "তোর আক্কেল-দাঁত গজিয়েছে?"

"না।"

"তাই বল। হয়ত সেই জন্যই নিতুবাবু ডেন্টিস্টের—"

সুনীত বলল, "দেখুন, সব বিষয়ে ঠাট্টা করবেন না। প্রেম হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়, মাচ মোর দ্যান দ্যাট্। পার্সন্যালিটি না হলে প্রেম হয় না। আর পার্সন্যালিটি দাঁতেরই মত। পেট থেকে পড়ার সময় ওগুলো কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে না, পরে গজায়। সুনীলবাবুর পার্সন্যালিটির গ্রোথ কেন স্টান্টেড হয়ে আছে সেটা পরীক্ষার জন্যই ডেন্টিস্টের কথা বলেছি। প্রেম-ট্রেম করার আগে একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করিয়ে ফেলা ভাল বলেই আমি মনে করি। বেশ তো, ডেন্টিস্ট যদি পছন্দ না হয়, অন্য কারও কথা সাজেস্ট করুন। বিশুবাবু আপনিই বলুন না, কে এই বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন। সুনীলবাবু তাঁর কাছেই যাবেন।"

বিশু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "ওর উচিত বেলগেছেয় গিয়ে ভেটেরিনারি সার্জেনের সঙ্গে কন্সাল্ট করা, কারণ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি সম্পর্কে ওঁরা বিশেষজ্ঞ।"

"ডাক্তার-ফাক্তারে আমার কিছু করতে পারবে না মশাই।" সুনীল সাহেবি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। "আই ওয়ান্ট মানি। মানি মানি মানি। টাকা চাই মশাই। দিল্লিতে প্রেম করা বিগ ফিনান্সের ব্যাপার। পেট্রোল আর হোটেল রেস্তোরাঁর বিল মেটাতে তিন দিনের মধ্যেই মাসের মাইনে ফতুর হয়ে যায়। তখন খালি পকেট নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই। টেলিফোনে ডাকলেও আর সাড়া দিতে পারিনে। হাতছাড়া হয়ে যাবে মশাই। ও মাই ডার্লিং!" ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনীল টাই দিয়ে বাতাস খেতে লাগল।

"আই বাপ্!" বিশুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "যে ফোর্সে হাওয়া ছাড়লি তাতে খুব ডীপ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

"বাঙালীর কপালে কি ভাল জিনিস সয় রে? যা কন্স্পিরেসি চলছে চান্দিকে কি বলব।" সুনীলের সকাতর উক্তি। "সবে ব্যাপারটা ঘন করে আনছিলাম, বলব কি, অমনি নন-বেঙ্গলিদের চোখ টাটিয়ে উঠল। বাঙালী এমন একটা মেয়েকে গেঁথে ফেলবে! আর কি মেয়ে মশাই, কাশ্মীরে বর্ন্ অ্যান্ড ব্রট্ আপ। টক্ টক্ করছে রঙ। ক্রুক্সের গাগলস্ চোখে পরে চাইতে হয়, নইলে জেল্লায় স্নো-ব্লাইন্ড হয়ে যেতে হবে। বাপের অগাধ পয়সা। ভেজিটেব্‌ল প্রডাক্টের ফলাও কারবার। গোটা উত্তর ভারত ওদের ফ্যাক্টরিতে ছেয়ে গেল। ভেজিটেবল্ ঘি, ভেজিটেবল্ মাংস, ভেজিটেবল্ মাছ ওদের একচেটে! আজকাল ভারতে তো ভেজিটেরিয়ানদেরই রাজত্ব। মাছ মাংস ছোঁয় না, অথচ সাহেবসুবোর সঙ্গে অনবরত দহরম মহরম। লাঞ্চ ডিনার দিতে হয় ঘন ঘন। রিনি রায়নার বাপ ভেজিটেবল্ মাছ মাংস আবিষ্কার করে তাঁদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে এখন

কথাবার্তা চলছে। দরে পোষালে ভেজিটেবল্ মাছ চালান দিয়ে বাংলা দেশ ফ্লাড করে দেবে। রিনি রায়না এমনই একটা লোকের মেয়ে। রিনি রায়না, আহা কী মোলায়েম নাম! সেতারের তরফের তারে যেন রবিশঙ্করের আঙুলের আলতো আলতো ব্যঞ্জনা। যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কালিদাসের কাব্যের বিভূতি। যেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহলের গালে চাঁদের চুম্বন। যেন বিশ্বের ছন্দময় রমণীয় অনুরণনের সঙ্গে পেলব অনুভবের তন্ময় ফুলশয্যা। যেন—যেন—যেন—" বোঝা গেল সে আর থই পাচ্ছে না।

বিশু তাড়াতাড়ি সুনীলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "যেন চার মাসের পুজো বোনাস পাবার উৎফুল্ল উদ্গার। যেন বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্কীম থেকে অব্যাহতি।"

এই অপ্রত্যাশিত উপমায় সুনীল হকচকিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সুনীত বলল, "পরিস্থিতি জটিল সন্দেহ নেই। আচ্ছা, আপনার রাইভাল করে কি? মানে কোন্ ক্লাসের লোক?"

"রাইভাল কি এক-আধজন যে এ কথার উত্তর দেব। অন্তত আধ ডজন। আর একা আমাকে তাদের মহড়া নিতে হচ্ছে। তাদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ফ্যাক্টরী আছে। আর আমার তরফে থাকবার মধ্যে আছে শুধু ঐ শান্তিনিকেতন!" সুনীল ভাবাবেশে কপালে হাত তুলে বলে উঠল, "ঠাকুর, ঠাকুর, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ! এখন তুমিই আমার ভরসা প্রভু!" আবেগটা খানিক থিতুলে সুনীল বলল, "রিনি রায়নার মাসতুতো দিদি শান্তিনিকেতনে পড়েছে। সেই হচ্ছে ওদের পরিবারের মেয়েদের আদর্শ। আমি বাইচান্স একদিন বলে ফেলেছি, আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে। ব্যস—সেই থেকেই রিনি আমার দিকে ঢলেছে। কিন্তু শেষরক্ষা বুঝি আর হয় না।"

"খুবই কঠিন অবস্থা।" সুনীতকে বেশ ভাবিত দেখা গেল। "আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন না—হরলিক্স খেতে শুরু করুন।"

"হরলিক্স খাব! কেন?" সুনীল অবাক।

"ওতে খুব কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বুঝলেন।" সুনীত সিরিয়াস। "আসলে সকল বিফলতার মূল হচ্ছে প্রত্যুষের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য চাই এক্সট্রা এনার্জি। শরীরটা তাজা রাখতে হবে। গায়ে জোর না থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মহড়া নেবেন কি করে?"

"এখানে গায়ের জোরে কুলোবে না মশাই, ট্যাঁকের জোর চাই। সিলভার টনিক, বুঝলেন। খুব তো তখন থেকে লেকচার ঝাড়ছেন, পারবেন হাজার কুড়ি টাকা যোগাড় করে দিতে? ট্যাঁকের জোর থাকলে আপনাদের এই বোগাস লেকচার শোনার জন্য এখানে পড়ে থাকতুম না, বুঝলেন। প্রেম করা কাকে

বলে ব্যাটাচ্ছেলেদের বুঝিয়ে দিতুম।”

“বাঙগালীর ছেলে হয়ে তুই গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রেম করতে চাস সুনীল? ছি ছি ছি!” ব্রজদা ধিক্কার দিতে দিতে প্রবেশ করলেন। একটি সিগারেট ধীরে সুস্থে ধরালেন। বার কতক লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বসলেন।

“বাঙগালীর ছেলে হয়ে”, ব্রজদা সুনীলের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি হেনে হুঙ্কার দিলেন, “মালদার রাইভালদের সঙ্গে ট্যাঁক খসিয়ে টক্কর দিতে চাস! তোদের বাড়িতে হর্তুকির কল আছে, তা জানতাম না তো। তোকে কি আর বলব? তোকে যদি উজবুক বলি তো দুনিয়ার উজবুক আমার নামে মানহানির মামলা করবে, বুঝলি।”

“ব্রজদা, আপনি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেননি, তাই আমার প্রতি—”

“থাম থাম। ব্রজকে ব্যাখ্যা করে কিছু বোঝাতে হয় না।” ব্রজদা বার কতক ছোট ছোট টান মেরে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। “তোরা এই জেনারেশানের ছেলেরা কী বল তো? জাতীয় চরিত্রটাকে একেবারে শিকেয় তুলে দিলি?” একটু থেমে বললেন, “ট্যাঁকের জোর দেখায় মাড়োয়ারি, তলোয়ারের জোর দেখায় রাজপুত, কলমের জোর দেখায় মাদ্রাজী। বাঙগালীর জোরটা কোথায় আছে শুনি?”

সুনীত ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মত তাড়াতাড়ি জবাব দিল, “কেন, ব্রেনে। বাঙগালীর ব্রেন—”

ব্রজদা সস্নেহে সুনীতের দিকে চেয়ে বললেন, “সে তো সত্য যুগের কথা রে। এই কলিতে বাঙগালীর ব্রেন আর কলকাতার ড্রেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত শুধু নামেই টিকে আছে, বুঝলি। বাঙগালীর জোর এখন মুখে। মুখের জোরে বাঙগালীকে মারবে, এমন জাত ওয়ার্ল্ডে নেই।”

“টেক্কা যদি মারতে চাস সুনীল, (ব্রজদা শুরু করলেন) তবে মুখটাকে শানিয়ে রাখ, অন্য পথে পা বাড়াসনি। মুখেন মারিতং জগৎ। আর এ তো একটা প্যাঁচকে ভেজিটেবল্ মেয়ে! হ্যাঃ। বলে কত সব তা বড় তা বড় মালটি মিলিওনেয়ারের বাড়ির আইবুড়ো মেয়েরা বেড়ালের মত ম্যাও ম্যাও করে আমার চার পাশে দিনরাত ঘুর ঘুর করেছে। আমি পাত্তাই দিইনি।”

সুনীত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, “মিলিওনেয়ারদের মেয়েরা বুঝি ম্যাও ম্যাও করে প্রেম করে?”

“তারা কি তোমার দিশি মেয়ে যে প্রাণনাথ প্রাণনাথ বলে হাঁক পাড়বে!” ব্রজদা খিঁচিয়ে উঠলেন। “মিলিওনেয়ার বিলিওনেয়ার সব ফ্যামিলির মেয়েদের



মেয়েরা ম্যাও ম্যাও করে আমাব চার্দিকে

আমি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা আমার কানের কাছে দিনরাত মাই-ডিয়ার, মাই ডার্লিং করে কুক ছাড়ত। বুঝলি।"

সুনীত জিজ্ঞেস করল, "ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হল ব্রজদা?"

সুনীল নিজের ব্যথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বলে উঠল, "কোথায় আবার, লেকের ধারে।"

ব্রজদা অমায়িক হেসে সুনীতকে বললেন, "সুনীলটা প্রায় ঠিকই বলেছে। তা সেটা লেক ছাড়া কি, তবে সে লেকে জল নেই, শুধু জমাট বরফ। বার মাসই বরফ। যতদূর চাও, ধু ধু বরফ।"

"এভারেস্টের কথা বলছেন বুঝি?"

"তোমার মাথা। দুনিয়ার বরফ কি শুধু এক এভারেস্টেই আছে। আমি রস দ্বীপের কথা বলছি। নামে দ্বীপ, আসলে জমাট একটা লেক।"

সুনীতের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্রজদা বললেন, "কি রস দ্বীপ কোথায়, সেটাও আবার বলে দিতে হবে নাকি? দক্ষিণ মেরুতে।"

সুনীত চোখ গোল গোল করে বলল, "দক্ষিণ মেরু! মানে সাউথ পোল!! গড!"

সুনীত একটা হেঁচকি তুলে চুপ করে গেল।

ব্রজদা সুনীলের দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বললেন, "তোমার যদি ওতে বোঝবার সুবিধে হয়, তবে তাই। লে-ম্যানরা তাই বলে। আমরা এক্সপ্লোরারকা ওকে অ্যাণ্টার্টিক বলি।"

"আচ্ছা ব্রজদা", সুনীত দুম্ করে বলে বসল, "কথাটা লাডক না লদ্দাখ?"

এই আচমকা প্রশ্নে ব্রজদার মত লোকও হকচকিয়ে গেলেন। তিনি সুনীতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে?"

সুনীল কটমট করে সুনীতের দিকে চাইতেই সে মিইয়ে গেল। "না, ওটা কিছু না। হঠাৎ কেমন বেরিয়ে গেল আর কি। সরি!"

"ব্রজদা বুঝি ওখানে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন?"

"পিকনিক ছাড়া জীবনে তো আর কিছু বুঝলিনে সুনীল।" ব্রজদা মৃদু এক ধমক মারলেন। "১৯১২ সালে ২৫শে ডিসেম্বরের মাঝরাতে দক্ষিণ মেরুতে পিকনিক করতে ব্রজবাজ কারফর্মা যায়নি। আর ৭৪০ মাইল দম না ফেলে ঘুরে এসে সে মেজাজও ছিল না। তবে মেয়েগুলো তাই গিয়েছিল বটে। বড়লোকের মেয়ে সব, খেয়ালের অন্ত নেই। অ্যাণ্টার্টিকে খ্রীষ্টমাসের উৎসব করতে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল।"

আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারিনি, (ব্রজদা নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে শুরু করলেন) টিলার ওপিঠ থেকে যে চেঁচামেচি ভেসে আসছে, সেগুলো মেয়েমানুষের কলরব। আমি ভেবেছি ওধারে বুঝি এম্পারার পেঙ্গুইনের কলোনি। এ সব তারই চেঁচামেচি। তাই আর তাঁবুর বাইরে বের হইনি। বাইরে তখন ভয়ংকর ব্লিজার্ড।

তা ছাড়া আমি দু মাস একটানা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কি কাজে ওখানে পা দিয়েছিলাম, আর শেষ পর্যন্ত কোন কাজ ঘাড়ে চাপল! ভাগ্যের ফের আর কাকে বলে! দক্ষিণ মেরুতে গিয়েছিলাম শ্বেত ভাল্লুকের শাদা হবার রহস্যটা কি তা জানবার জন্য। এর পিছনে আবার একটা স্যাড্ হিস্ট্রি আছে, বুঝলি। আমরা যখন পটলডাঙ্গায় থাকতুম, তখন আমাদের পাশের বাড়ির এক মেয়ের সঙ্গে আমার দারুণ লভ হয়েছিল। আমাদেরই পালটি ঘর। ওরা আঠাশের পর্যায়, আমরা ছাব্বিশের। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। ঐ আমার ফার্স্ট লভ। কাজেই শকটা বেশী করে বেজেছিল। আমার রং ময়লা বলে আমার সঙ্গে সেই মেয়ের মা তো তার বিয়ে দিলে না। জোর করে কন্দর্পকান্তি এক লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হল। বিয়ের আগের দিন গায়ে কেরোসিন ঢেলে সে পুড়ে মরল। খুব চোট পেলুম মনে। কালো রং কি মানুষের এত বড় শত্রু! এর কিছুদিন পরে আমার এক মাসতুতো বোন আত্মঘাতী হল। সেও কালো। তার বর জোটেনি। এই তো তোদের বাঙ্গালী যুবকদের ক্যারেক্টার। বুঝলি, আমরা সাহেবদের চাইতে কম বর্ণবিদ্বেষী নই।

যা হোক, এই সব ঘটনা থেকে একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমার মনে দানা বেঁধে উঠল। কালো রং যদি এত অনর্থের মূল, তবে তা নির্মূল করে দিতে হবে। এমন ওষুধ আবিষ্কার করতে হবে, যা দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র কালো রং শাদায় পরিণত হয়। তারপর থেকে হাজার হাজার শ্বেতভল্লুক স্টাডি করে ফেললাম। উত্তর মেরুর কাজ শেষ করে দক্ষিণ মেরুতে এলাম। বিখ্যাত মেরু আবিষ্কারক ননী সেন আমার সঙ্গে উত্তর মেরুতে ঘুরে ঘুরে বই লিখে বিরাট নাম আর নরওয়েতে সেটল্ করল। আজ তাকে সবাই ন্যানসেন বলেই জানে। কিন্তু আসলে ও ননী। ননীগোপাল সেন। বিক্রম-পুরের বৈদ্য। দক্ষিণ মেরুতে এসে আমি প্রথম যে পাহাড়টায় চড়ি তার নাম আমি রেখেছিলাম ননী সেন গিরি। সাহেবরা আমার কৃতিত্ব অস্বীকার করতে পারেনি। ভূগোল খুলে দেখিস, মাউণ্ট ন্যানসেনের হদিস পাবি।

রস দ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে বছরখানেক ধরে শ্বেতভল্লুক স্টাডি করে, এক্সপেরিমেণ্ট করে শাদা হবার ফর্মূলা প্রায় কম্প্লিট করে এনেছি, এমন সময় শুনলাম ক্যাপ্টেন স্কট সাউথ পোলে যাবার জন্যে এসেছে। মাইল কতক



শ্বেত ভাল্লুকের শাদা হবার রহস্যটা কী

দূরেই ওদের বেস। ছোকরাকে আমি ভালই বাসতাম। ছেলেবয়েস থেকেই দাদা দাদা করত। এসেই খবর পাঠালে দেখা করতে চায়। গেলুম। বহু লটবহর এনেছে।' গোটাকয়েক ট্রাক্টর, এই কাজের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্কট, কুকুর এত কম কেন? শ্লেজই বা কই? ট্রাক্টরের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে, ব্রজদা, এই আমার কুকুর। এই আমার শ্লেজ। এই ভুলটুকুর জন্যই বেচারা আর ফিরতে পারল না। অ্যাণ্টার্টিকের বরফেই চিরকালের মত থেকে গেল।

যা হোক, স্কট নিজের লক্ষ্যে রওনা হয়ে গেল। আমিও নিবিষ্টচিত্তে শ্বেত ভল্লুকের গ্ল্যান্ড থেকে শাদা হবার ওষুধ বের করার সাধনায় মগ্ন হলাম। ঠাকুরের কৃপায় শাদা হবার ওষুধ আবিষ্কার করেও ফেললাম। নাম দিলাম 'ব্রজলীন'। দারুন ওষুধ বের করেছিলাম, বুঝলি। একটা বাচ্চা তিমি ধরে তার গ্ল্যান্ডে এক ডোজ 'ব্রজলীন'—টেন সি সি—পুশ করা মাত্র তার গায়ের রং ফুটফুটে ফর্সা হয়ে গেল। দেখে আমিই অবাক। সেই শাদা তিমিটাকে নিয়েই তো মবি ডিকের গপ্প লেখা হয়েছে। পড়ে দেখিস। মন্দ লেখেনি, তবে সাহেবরা যা করে, 'ব্রজলীনের' কথাটা স্রেফ চেপে গিয়েছে।

আজ যদি 'ব্রজলীনের' ফর্মুলাটা থাকত! (ব্রজদা ফো-স্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) দুনিয়ার সুরতই বদলে যেত। সেদিন কেনেডি আমেরিকা থেকে লোক পাঠিয়েছিল। ফর্মুলাটার রাফ কপিটাও অন্তত যদি দিতে পারি। তাহলে ওরাই নিজের খরচে "ব্রজলীন" ম্যানুফ্যাকচার করে তাবৎ নিগ্রোকে শাদা করে ফেলে শাদা-কালোর বখেড়া মিটিয়েই ফেলবে। তা খুঁজেই পেলুম না।

সুনীত—কিন্তু অরিজিন্যালটার কি হল?

ব্রজদা—পোড়া কপালের কথা তবে আর বলছি কি? গুপ্তচর লেগেছিল পিছনে। সাহেবরাই লাগিয়েছিল। সবাই শাদা হয়ে গেলে ও ব্যাটাদের পুঁছবে কে, শুনি! সেই একদিন চুরি করল। পিছু পিছু তাড়াও করেছিলাম, ধরেও ফেলতাম, কিন্তু গ্রহের কি ফের, কি আর বলব!

সুনীত—শেষপর্যন্ত হলটা কি?

ব্রজদা—সর্বনাশ! সুন্দরবন দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, গেঁওখালি থেকে সাবমেরিণে উঠে সটকান দেবে বলে। এমন সময় ইয়া এক কেঁদো বাঘ লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে কোট প্যাণ্ট সমেত তাকে কোঁৎ করে গিলে ফেললে। আমি হায় হায় করে সঙ্গে সঙ্গে বাঘের টুঁটি টিপে ধরলুম। তারপর বাঘটাকে চেন দিয়ে বেঁধে ক্যানিং-এ নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি কড়া জোলাপ খাইয়ে দিলুম একসঙ্গে চার ডোজ। কিন্তু বাঘের কী হজম শক্তি। ব্বাপ্‌স্! জোলাপ দিয়ে কাগজখানাই শুধু বার করতে পারলুম, ফর্মুলাটা বেমালুম হজম করে



সাহেবটাকে কোঁৎ করে গিলে ফেললে

ফেলেছে। আর যা হবার তাই হল। আধঘণ্টার মধ্যেই শুধু 'ব্রজলীনের' ফর্মুলা খেয়েই (ধক্‌খানা কি ছিল তাহলে বুঝে দ্যাখ), সেই বাঘটা শাদা হয়ে গেল। ঐ হচ্ছে পৃথিবীর আদি এবং অকৃত্রিম শাদা বাঘ। রেওয়ার রাজাকে বাঘটা আমিই প্রেজেণ্ট করে দিই। অনেকদিনের ফ্রেণ্ডশিপ কিনা।

সুনীল (টাকের ঘাম মুছতে মুছতে শুকনো গলায়)—এতটা আমি জানতুম না।

ব্রজদা—দেয়ার আর মোর থিঙস্‌ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ সুনীল, তুই তো কালকের ছেলে, এই ব্রজই কি সব জানে? এই ক্যাপ্টেন স্কটের কথাই ধর না। ওর মত ঘাঘু এক্সপ্লোরার, ও যদি জানতই এমন বেঘোরে মারা পড়বে, তাহলে কি ঐ ট্রাক্টারের ভরসা করে সাউথ পোলে যায়, না যে ব্রজ ওর গুরুর মত, তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে?

ব্রজলীনের এক্সপেরিমেণ্ট তিমির উপর সফল হতেই (ব্রজদা সিগারেটে দুটো সুখ টান মেরে বললেন) অর্থাৎ কালো রাত্রির মত তিমির গায়ের রঙ কেটে যেতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে" এটা তো আসলে কবিতায় ব্রজলীনেরই বিজ্ঞাপন, তোরা কি সে-খবর রাখিস। আহা'কি সাজেশান? তিমি-র বিভাবরী অর্থাৎ রাত-কালো রং কি করে কাটবে? কবি প্রশ্ন করছেন। "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে?" এরই জবাব হিসাবে এই লাইনটা জুড়ে দেব ভেবেছিলাম, নিয়মিত 'ব্রজলীন' সেবনে।" অ্যাঁ, লাইনটা কেমন?

সুনীত—বেশ অর্থপূর্ণ।

বিশু—এক লাইন কবিতার জন্য যদি নোবেল প্রাইজ থাকত, তাহলে নির্ঘাৎ আপনি সেটা পেতেন। মাইরি, আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি।

ব্রজদা—(হুঙ্কার ছাড়লেন) কি বললি বিশে, নোবেল প্রাইজ—

সুনীল—(বিরক্ত হয়ে) দ্যাখ বিশু, ফ্ল্যাশ মেরে মেরে তোর এমন বদভ্যেস হয়ে গিয়েছে! চুপচাপ বসে থাক। আলটু-ফালটু কথা বলিসনি। নোবেল প্রাইজটাই যে ব্রজদার দেওয়া তা জানিস?

টাকাটা নোবেলের, প্ল্যানটা আমার। (ব্রজদাকে খুশিই দেখা গেল) যাক গে যাক, এসব মাইনর জিনিস নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না করাই ভাল। ওতে নজরটা ছোট হয়ে যায়। তার চেয়ে যা বলছিলাম, শোন। 'ব্রজলীন' আবিষ্কারের পর তাঁবু গুটিয়ে রস দ্বীপ থেকে দেশে ফিরব। তোড়জোড় করছি এমন সময় লণ্ডন থেকে খবর এল, স্বয়ং রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেণ্টই জানালে, "ব্রজদা, স্কট্‌ নো ট্রেস্‌, বিপদের আশঙ্কা করছি, তুমিই ভরসা,

সার্চ।" তাঁবু গুটোনো আর হল না। তক্ষুনি স্লেজ জুতে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর দু' মাস ধরে সার্চ করে খ্রীস্টমাসের সন্ধ্যায় রস দ্বীপে আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম। মনে বিষাদ, দেহে ক্লান্তি, স্কটের ডায়েরিখানা নিয়েই ফিরে এসেছি। তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না! একেবারে শেষ মুহূর্তের কথাও লিখে রেখে গিয়েছে। শেষের পাতাটার আঁকিবুকির পাঠ উদ্ধার করে দেখি, লেখা আছে : "খালি ব্রজদার কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাকে ঠিক সময়ে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন। আমি তা মানিনি, এ আমার চরম শিক্ষা।" বেচারি! (ব্রজদা মাথা নীচু করে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন। ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে এল।)

সামান্য কিছু, (গলাটা ধরে গিয়েছিল তাঁর, তাই ভাল আওয়াজ বের হল না। দুবার কেশে গলাটা ছাড়িয়ে নিলেন) সামান্য কিছু খেয়েই শুয়ে পড়লাম। আমার তাঁবুটা আর বেলাভূমির মাঝখানে ছোট্ট একটা টিলা। বরফ ঢাকা। ব্লিজার্ডের গুঁতো থেকে বাঁচব বলেই তাঁবুটা টিলার আড়ালে খাটিয়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম টিলার ওধার থেকে নানা রকম আওয়াজ আসছে। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি, ওগুলো মানুষের কলরব। ভেবেছিলাম এম্পারার পেঙ্গুইনদেরই বুঝি কাকলি। একবার মনে হল, তালি বাজাতে বাজাতে কারা যেন নাচছে। উদ্দাম নৃত্য। ভাবলাম এ-সব পেঙ্গুইন-দেরই পাখা ঝাপটানির শব্দ। একবার মনে হল পেঙ্গুইনরা ফক্স ট্রট্ নাচছে বুঝি। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। অকস্মাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই আবার ঝাঁকি, আবার ঝাঁকি। একবার মনে হলো অ্যাভালান্স নাকি? পরক্ষণেই মন বলল, দূর, তা কি করে হবে? তবে কি ভূমিকম্প? ঝাঁকুনির জোর দেখে মনে হচ্ছিল, হ্যাঁচকা টানে কেউ বুঝি পৃথিবীটাকে গোড়াসুদ্ধ উপড়ে নিতে চাইছে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। না, আমি ভয় পাইনি। তবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।

এমন সময় টিলার ওপিঠ থেকে এক আর্ত চীৎকার ভেসে এল। না, এ তো এম্পারার পেঙ্গুইনের চীৎকার নয়। এ যে রমণীর কণ্ঠ! তবে কি এখনও স্বপ্ন দেখছি? "হেল্প্! হেল্প্!" অবলা নারীর আর্তস্বর সেই প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করে আবার বেজে উঠতেই আমার জড়তা কেটে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু প্রচণ্ড এক ধাক্কায় একেবারে ধরাশায়ী হলাম। পড়ে গিয়েই টের পেলাম, এ কী! দ্বীপটা যে চলছে! একেবারে যে ভৌতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল!

"হে—ল্প্ হে—ল্—প্!" আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলাম না। এক

লাফে টিলা টপকে ওধারে পেঁছালাম। হঠাৎ মধ্যরাত্রির সূর্য সেই ঘন কুয়াশা ভেদ করে পিচ করে খানিকটা এনিমিক আলো ছিটিয়ে দিলে। সেই ঝাপসা আলোর আবছায়াতে দেখি একটা চাঁদোয়ার তলায় একটা খ্রীস্টমাস ট্রী, বিস্তর বেলুন, মদের বোতল, পোর্টেবল গ্রামোফোন, রেকর্ড, অজস্র খাবারদাবার আর অনেকগুলো পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। কিন্তু জনমনিষ্যি কোথাও নেই। আমাকে নিয়ে দ্বীপের বেশ খানিকটা অংশ সমুদ্রের জলে ভেসে চলেছে। রস দ্বীপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে এর মধ্যেই আমার ভাল রকম এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

"দ্বীপ ভেসে চলল!" সুনীত আর থাকতে পারল না। "তাও আবার হয় নাকি?"

"কেন, কেন ভাসবে না শুনি। বংশ দিয়েই ভাসানো যেতে পারে। দ্বীপটাকে যদি বাঁশের চাপের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই চলে! না ব্রজদা?"

"দ্যাখ সুনীল", ব্রজদা ক্ষেপে গেলেন। "তুই বড্ড আজগুবি কথা বলিস। অ্যাণ্টার্টিকে ঘাসই বলে জন্মাতে চায় না। বাঁশ তুই পাবি কোথায়?"

এবার সুনীলও ঘাবড়ে গেল। "তাহলে?"

"লেখাপড়া জীবনে যদি করতিস তো বোকার মত কথায় কথায় মূর্চ্ছা যেতিস না, বুঝলি। আইস্‌বার্গ জলে ভাসে, কথাটা কখনও শুনিসনি না কি? নয় ভাগের আট ভাগ নিচে আর মাত্র একভাগ জলের উপরে ভেসে থাকে।"

"আইস্‌বার্গ!" সুনীত বলে উঠল, "তাই তো। ইস্‌স্‌!" তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল।

প্রায় আট হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা চাঙড় খসে বেরিয়ে এসেছিল, (ব্রজদা খেসারত স্বরূপ একটা নতুন সিগারেটে আগুন দিলেন) তাই বাঁচোয়া। নইলে আমাদের ভর সইতো না।

নে, এখন শোন। কিন্তু হেল্‌প হেল্‌প করে কে চেঁচালে? এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। দূর থেকে একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। ঠাহর করে বুঝতে পারলাম বরফ-ভাঙ্গা জাহাজের শব্দ। ভালই হল। বাঁচবার পথ পাওয়া গেল। প্রাণভরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেঁচিয়ে উঠলাম, আ—হোই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

হঠাৎ খ্রীস্টমাস ট্রীটা একটু দুলে উঠতেই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা পরমাসুন্দরী মেয়ে বরফের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রং এত ফর্সা যে বরফের সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছে। তাই এতক্ষণ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে গিয়ে তাকে তুলে আনলাম। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে আমার



দেশলাই জেবলে জেবলে

তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। আমার বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে ভয়-পাওয়া কবুতরীর মত তার মহাপ্রাণীটা ধুকপুক করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সেবা শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। ক্রমশ ঠাণ্ডা বেড়ে চলল। তাপমাত্রা সাংঘাতিক রকম নেমে গেল। সে যে কী ঠাণ্ডা কল্পনাও করতে পারবিনে তোরা।

ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, পারলাম না। পারব কি করে? কথা ঠোঁট ছেড়ে বেরুতে না বেরুতেই জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। ওর কান পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছেই না। ভেবে দ্যাখ কী রকম শীত! দক্ষিণ মেরুর শীত কি না। যাহোক করে শেষপর্যন্ত ওর পরিচয়টা বের করেই ফেললাম।

"ইশারা করে বুঝি?"

"না", ব্রজদা সুনীতের দিকে কিছুক্ষণ থমকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে। কথাগুলো ঠোঁট থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে যেই জমে যেতে লাগল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে জ্বেলে ধরতে লাগলাম। অমনি জমাট কথা সাউন্ড এনার্জিতে পুনরায় রূপান্তরিত হয়ে তার কানের ডায়াফ্রেমে স্বাভাবিক নিয়মেই গিয়ে আঘাত করতে লাগল। এসব হাই সায়েন্সের ব্যাপার। ব্রজদাজ্ ফ্রিজিং সিস্টেম্ অব সাউন্ড নামে লেটেস্ট যা একখানা থিয়োরি দিয়েছি না, তাই নিয়ে বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকরাও খাবি খেতে শুরু করেছে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, গ্রামোফোনের ব্যবসা এবারে লাটে উঠবে। একটি মাত্র শব্দযন্ত্র থাকবে দুনিয়ায়, তার নাম ব্রজদাজ্ ফ্রিজো-ফোন। মুখেন মারিতং জগৎ, বাঙালী তা প্রমাণ করে ছাড়বে।"

যাকগে, এ নিয়ে আর গাবিয়ে বেড়িও না, ছোটখাট কাজ এখনও কিছু বাকি আছে। (ব্রজদা সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন) তারপর ধীরে ধীরে তো মেয়েটার সব হিস্ট্রি জেনে নিলাম। খুব হাই ফ্যামিলির মেয়ে। মাপ করো, এর বেশি কিছু আর বলতে পারব না। নাম বা পরিচয় কিছু না। মা কালির নামে দিব্যি খেয়েছি।

বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। বাপ-মা নেই। ঠাকুর্দা আছে। ওদেরই একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি হাতাবার মতলবে দক্ষিণ মেরুতে খ্রীস্টমাস উৎসবের স্ফূর্তি করবে বলে মেয়েটাকে একটা বরফ-ভাঙ্গা জাহাজে করে এখানে নিয়ে আসে। তারপর এই দ্বীপে ফেলে রেখে চম্পট দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের লীলা, পালাবার সময় তাড়াহুড়ো করে এমন ভাবেই বরফ ভেঙ্গে গিয়েছে যে ওদের পিছু পিছু আমরাও দিন চারেক পরে ক্লিয়ার ওয়াটারে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু বাহির-সমুদ্রে পড়ার পর আমাদের তো গতি নেই, তাই আমরা ভাসতে লাগলুম, আর আমাদের এই কাহিনীর খল নায়ক আমার অসহায় চোখের সামনে দিয়ে ফুল স্টীমে জাহাজ

চালিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আমি রাগে অন্ধ হয়ে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। যদি একবার জাহাজটায় উঠতে পারতাম তো ব্যাটাচ্ছেলের ছাল বদলে দিতাম।

এদিকে এক নতুন বিপদ দেখা গেল। যতই আমরা উষ্ণ থেকে উষ্ণতর জলে এসে পড়ছি, ততই আমাদের বরফের আশ্রয় দ্রুততর বেগে গলতে শুরু করেছে। মেয়েটা এত সরল যে, এই বিপদের বিন্দুমাত্র আঁচও পায়নি। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে। আমি এই সব কথা ভাবছি, মাঝে মাঝে মেপে দেখছি, আইস্‌বার্গটা কতটা গলল। এরই মধ্যে সিকি ভাগ গলে গিয়েছে। জলের যা টেম্পেরেচার তাতে দিন দুয়েকের মধ্যেই সবটা গলে জল হয়ে যাবে। তারপর এয়ার-ম্যাট্রেসের ভেলায় দুটি প্রাণী এই ভয়ানক সমুদ্রে আর কতক্ষণই বা টিঁকে থাকতে পারব?

হঠাৎ ও চীৎকার করে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে দুহাতে চেপে ধরল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে আঙুল তুলে বললে, "ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, দুটো সামুদ্রিক রাক্ষস। মন্‌স্‌টার। আর রক্ষা নেই।" বলেই কাঁদতে লাগল।

চেয়ে দেখি একশ গজ দূরে দুটো পূর্ণবয়স্ক তিমি, নীল তিমি, নিশ্চিন্ত মনে গা ভাসিয়ে পিচকিরি করে জলের ফোয়ারা ছাড়ছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে বললাম, আর ভয় নেই। ওরা আমাদের মুক্তির দূত। বলেই মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। ওকে বললাম, দ্যাখো, এখনই একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে। আমি সিগন্যাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পিছন থেকে আমার কোমরটা শুধু শক্ত করে গায়ে যত জোর আছে, চেপে ধরবে। কিছুতে ছাড়বে না। বুঝেছ। তারপর যা করবার আমি করব।

তাঁবু থেকে বেশ ভারি দুটো হারপুন বের করে আনলাম। ছয় শ গজ করে এক একটার দড়ি। চোখের পলক পড়তে না পড়তে সেই ভীষণ হারপুন দুটো তিমি দুটোর গলার ঠিক উপরে কণ্ঠায় গেঁথে গেল। ওরা এই আক্রমণের জন্য আদৌ তৈরি ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে ওরা ভুস্‌ করে ডুবে গেল। দুই হারপুনের দড়ি আমি লাগামের মত দুই হাতে ধরে থাকলাম। দড়িতে ভীষণ টান পড়ল। আমরা উল্কার গতিতে উত্তর মুখে ধেয়ে চললাম। তিমি দুটো মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। আমিও সিন্ধুঘোটকের গোঁফ দিয়ে চোমরানো ছপটি দিয়ে ওদের লেজে সপাস্‌সপ্‌ ঘা কষিয়ে ওদের চাঙ্গা করে তুলছিলাম।

সারারাত ধরে নক্ষত্র দেখে পথের নিশানা বের করে তিমি দুটোকে লাগামের টানে টানে ঠিক পথে পরিচালিত করলাম। ভোর রাত নাগাদ বরফভাঙা জাহাজটার লেজের আলো আমার দৃষ্টিগোচর হল। আধ মাইল থাকতেই



সেও গোঁত্তা খেয়ে খলনায়িকার অনুগমন করল

নিশানা ঠিক করে হারপনের দড়ি ছেড়ে দিলাম। তিমি দুটো ছাড়া পেয়ে ভুস্ করে ডুবে গেল। আমি বললাম, ওয়েল ডান্ বয়েজ্, মেনি থ্যাংক্স্। ধীরে ধীরে আইসবার্গটা জাহাজের গায়ে ঠেকতেই রেলিং-এ দড়ি ছুঁড়ে আমি লাফ দিয়ে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। তারপর দড়ি নামিয়ে মেয়েটাকে তুললাম। সেই মুহূর্তে আইসবার্গটাও তলিয়ে গেল। এত বেগে আসার ফলে জলের ঘসায় একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছিল।

জাহাজটা ছিল এই মেয়েটারই। ওকে তাই চুপি চুপি নাবিকদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর খলনায়কের কেবিনে ঢুকে তাকে এই প্যাঁদান আর সেই প্যাঁদান। পাশের কেবিনে আরেকটি মেয়ে ছিল। একেবারে মুনির মন-টলা খাই-খাই চেহারা। বুঝতেই পারছিস সে খলনায়িকা। ভ্যাম্প্। গোলমাল শুনে একটা কিরীচ নিয়ে এই ঘরে ঢুকতে এসেছিল। কিন্তু সেই সময় খল-নায়কের পিস্তলের তাক-ফস্কা গুলী তার বুকে লাগতেই সে রেলিং টপকে জলে পড়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আমি খলনায়কের মুখে একখানা আপার কাট্ ঝাড়তেই সে-ও গোঁত্তা খেয়ে খলনায়িকার অনুগমন করল। ঝপাৎ করে একটা শব্দ আর তার কিছুক্ষণ পরেই মর্মভেদী চিৎকার শুনে বুঝলাম হাঙরে ধরেছে। দি এন্ড।

ব্রজদা উঠতে যাচ্ছিলেন। বিশু বলল, "কিন্তু ব্রজদা, মানে, একেবারে শেষটুকু—মানে আসলটুকু—মানে, বুঝলেন না, হেঁ হেঁ হেঁ—"

"তবে শোন", ব্রজদা আবার বসলেন। "সেদিন সারাদিন সে আমাকে আর চোখের আড়াল করল না। রাত্রে খাবার টেবিলে বসে বললে, হানি, তোমার জন্য এসব আমি নিজের হাতে রেঁধেছি। বললাম, থ্যাংক্যু। তারপর আমার কেবিনের বিছানাটা নিজে হাতে ঝেড়েঝুড়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। তারপর মশারি টাঙিয়ে দিয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে এক সময় দেখি (ব্রজদা খুক খুক করে কেশে নিলেন) ও ঠোঁট ক্রমশই নামিয়ে আনছে। যখন প্রায় ছুঁই ছুঁই তখন আমি বললাম, "বোনটি, এবার তোমার ঘরে যাও। ঢুলে পড়ছ। ঘুম এসে গেছে বোধ হয়।"

সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। (ব্রজদা একটা সিগারেট ধরালেন) তারপর বলল, বাট্ আই লাভ ইউ হানি। বললাম, জানি। সে বলল, তবে? তবে হানি, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

আমি বললাম, উপায় নেই। আমাদের দেশের সিস্টেম বড় কড়া। নায়িকা মশারি গুঁজে দেবার পর আমাদের দেশের নায়করা যে আর পাশ্চাত্যের নায়কদের মত দেহবাদী থাকে না ভাই। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাদের সম্পর্ক তখন

অন্য মার্গে ধাবিত হয়। নায়িকা তখন হয় বোন, নয় দিদি আর না হয় বৌদি। ব্যস্, এই আমাদের বরাদ্দ। বিশ্বাস না হয় বাংলাদেশের সাহিত্যসম্রাট, উজির, নাজিরদের লেখা মোটা মোটা সব নভেল পড়ে দেখতে পার।

ব্রজদা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না।

সপ্তদশ গল্প

"চীনে ব্যাটারা এই যে পিছু হটে চলে গেল, এর পিছনে কোন মিস্ট্রি নেই মশাই, একেবারে পরিষ্কার হিসেব।"—সুনীল সুনীত ঘোষের সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট প্যাকেটের গায়ে ঠুকতে ঠুকতে বলল, "ভয়ে, ওরা সেরেফ ভয় পেয়েই পিঠটান দিয়েছে মশাই। এ একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর বলছি। ফাইলটা আমি নিজে চোখে দেখেছি কি না।"

"রিয়েলি!" সুনীতের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল। সুনীলকে আগা-পাশতলা বেশ ভাল করে দেখে নিল। এই কদিনেই, তার মনে হল, দিল্লির হাওয়া লেগে, সুনীলের বেশ রাজকীয় পরিবর্তন হয়েছে। পোশাকে পরিচ্ছদে, হাবে ভাবে তো বটেই, এমন কি সুনীতের চোখে ওর টাকটাও বেশ নতুন নতুন লাগল। ঠিক যেন পরিপাটি কনট সার্কাসটি।

একটু সমীহ-করা গলায় সুনীত বলল, "তা এর মধ্যেই তো দারুণ কনট্যাক্ট করে ফেলেছেন মশাই! একেবারে ফাইল-টাইল অব্দি পেঁছে গেছেন! বেশ, বেশ। আপনার ক্যাপাসিটি আছে।"

"দিল্লির রিপোর্টিং-এর তরিকা কলকাতার মত নয়," ধোঁয়ার গোল্লা গোটা কতক বাতাসে ছুঁড়ে সুনীল সেটা সুনীতকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলে। "কনট্যাক্ট, সেরেফ কনট্যাক্ট, দিল্লিতে সাফল্য লাভের এই হচ্ছে সিক্রেট। টপকে যাবার টপ সিক্রেটও বলতে পারেন। এই যে আপনাকে যে খবরটা দিলুম, ওটা কার কাছ থেকে পেয়েছি জানেন? অফিসর-ইন-ফাইলিং ক্লার্কের সাব-ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যাণ্টের কাছ থেকে। একদিন তার সঙ্গে খুব আড্ডা মারছি। একটা ফাইল ঝাড়তে ঝাড়তে সে বললে, চীনেরা পিছিয়ে গেল কেন জানেন? এই দেখুন তার ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট। নিন্ পড়ুন। পড়লুম।"

"কি দেখলেন?" সুনীত টাইপ মেসিনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"ঐ যে বললুম," সুনীল শান্তভাবে বলল, "চীনেরা শেষ পর্যন্ত একটা গোপন খবরে পট করে জানতে পারলে আমাদের রিয়েল স্ট্রেংথটা কোথায়। অ্যাইসা ভয় পেয়ে গেল যে পালাতে আর পথ পায়নি।"

"সেটা তো আগেই বলেছেন।" সুনীত অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, "এবার আসল খবরটা বলুন না মশাই। গোপন খবরটা কি? তারা কার ভয়ে পালাল?"

"কার ভয়ে আবার, তোদের ব্রজদার ভয়ে ব্যাটাচ্ছেলেদের দাঁত কপাটি লেগে গেছল।" ব্রজদা একটা চেয়ার টেনে বসে মাথা থেকে উজবুকি টুপিটা খুলে হাওয়া করতে লাগলেন। "এই যে সুনীল, কবে এলি।"

"তা দিন সাতেক হয়ে গেল।"

"কদিন থাকবি।"

"কদিন আবার, পরশুই চলে যাব ভাবছি।" প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বা বা বা বা, বেড়ে টুপিটা তো। ফার্স্ট ক্লাস তুর্কি টুপি।"

"তুর্কি নয়, উজবুকি টুপি।" ব্রজদা গম্ভীরভাবে সুনীলের ভুলটা শুধরে দিলেন। বললেন, "এবারে হাতে মোটেই সময় ছিল না, তাই উজবুকদের রিপাবলিক অব্দি গিয়েই বাড়ি ফিরে এলাম। তুর্কোমানিয়ায় আগে কয়েক-বার গিয়েছি তো, তা ছাড়া মস্কোর কাজ চুকতেই অনেকটা সময় চলে গেল কি না?"

সুনীত জিজ্ঞেস করল, "আপনি রাশিয়াও গিয়েছিলেন না কি?"

"না হলে এতদিন ছিলাম কোথায়?" ব্রজদা বাঁকা চোখে চাইলেন।

ব্রজদার মুখের ভাব দেখে সুনীত আমতা আমতা করে হঠাৎ মরীয়া হয়ে বলে উঠল, "না, মানে আমার ধারণা ছিল, আপনি বুঝি চাঁদে গিয়েছেন।"

ব্রজদার মুখে-চোখে আলো ফুটে উঠল। বললেন, "কারেক্ট। ঠিকই ধরেছিস। ব্যাপারটা সিক্রেট বলে কাউকে বলছিনে। মস্কো হয়েই তো গেলাম, তাই সব্বাইকে রাশিয়ার কথাই বলেছি।"

এবার সুনীলের খাবি খাওয়ার পালা।

"আপনি চাঁ-দে গিয়েছিলেন! আচ্ছা?"

"এতেই তোর চোখ টাকে ঠেকছে, সবটা শুনলে তো নির্ঘাৎ দাঁত কপাটি।" ব্রজদা একটুক্ষণ বিরতি দিয়ে বললেন, "কেন গেছলুম জানিস?" ব্রজদা আবার থামলেন। বললেন, "জিমন্যাস্টিক দেখাতে। যা খেল দেখিয়ে এসেছি, তাতেই বাজীমাৎ।"

"চাঁদে কি লোকজন আছে নাকি যে, জিমন্যাস্টিক দেখালেন!" সুনীল কিন্তু-কিন্তু করে জিজ্ঞেস করল। "আমার ধারণা ছিল, চাঁদে জনপ্রাণী নেই।"

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, "তবে চাঁদে কি আছে বলে তোমার ধারণা, তাই শুনি।"

"চাঁদে যা থাকে", সুনীল বললে, "অমাবস্যে, পূর্ণিমা। এই আর কি।"

"ব্যস্!" বলে ব্রজদা গুম্ মেরে গেলেন।

সুনীত বলল, "আমি সুনীলবাবুর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছিনে। আমার ধারণা—" ব্রজদাকে ওর দিকে চাইতে দেখে সুনীত চুপসে গেল।



মস্কো হয়েই তো গেলাম

"বল না," ব্রজদা উৎসাহ দিলেন, "আবার গুটিয়ে গেলি কেন?"

সুনীত বলল, "আমার ধারণা, একাদশীও—"

ব্রজদা খিঁচিয়ে উঠলেন, "একাদশী! তোমার মাথা। আচ্ছা তুই সবসময় বিধবাদের মত কথাবার্তা বলিস কেন নিতে বল দিকিনি। মাছ-মাংস খাসনে, না কি?"

সুনীত বলল, "আমি ফিল্ করি কি না, তাই।"

ব্রজদা : "তুমি বিধবাদের মত ফিল্ কর, তাই বলতে চাইছ।"

সুনীত (বিব্রত হয়ে) : "না না, বিধবাদের মত ফিল্ করিনে তো, আমি একাদশীটা ফিল্ করি। ঐ সময়টা আমার গিঁটে গিঁটে ব্যথা হয় কি না। একবেলা উপোস দিলে, মানে—"

"বুঝেছি, তোমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না। অদ্ভুত সব ব্যামোর তুই একটা গ্যারেজ। রেগুলার ডন-বৈঠক কর্ না।"

সুনীত (চমকে উঠল) : "ডন-বৈঠক? মানে একসারসাইজ্! ও বাবা! আমার হার্টটা আবার একটু উইক কি না। তা ছাড়া—"

সুনীল বললে, "আচ্ছা ব্রজদা, জিমন্যাস্টিক দেখতে খুব লোক হয়েছিল বুঝি চাঁদে?"

ব্রজদা এতক্ষণ পরে একটু মুচকে হাসলেন। বললেন, "দর্শক ছিল মাত্র একজন। তবে কি জানিস, ক্রুশ্চেভ একাই একশ'।"

"ক্রুশ্চেভ্!" সুনীল আর সুনীতের গলা শুকিয়ে উঠল। দুজনেই একসঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে উঠল, "নরেন একটু জল দে।"

ব্রজদা বললেন, "ক্রুশ্চেভই আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল। জিমন্যাস্টিকের পার্টি নিয়ে রাশিয়ায় যাওয়া তো একটা ছল মাত্র। আসল খেল যেটা দেখালুম, সেটা তো পলিটিক্সের। ক্রেমলিনে ডিনার খেতে খেতে ক্রুশ্চেভ্ একদিন বললে, ব্রজদা, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে পরামর্শ আছে। একটু নিরিবিলিতে তোমাকে বলতে চাই।"

"আচ্ছা ব্রজদা," সুনীত প্রশ্ন করল, "রুশ ভাষায় কি ব্রজদাকে ব্রজদাই বলে?"

"তা বলতে যাবে কেন? ওরা কি তোদের মত নকলনবিশ?" ব্রজদা ধমক মারলেন, "ব্রজদার রাশিয়ান হচ্ছে ব্রজ্দানভ্। তোদের সুবিধের জন্যই আমি বাংলা করে বলছি। তোরা আবার যা বোগ্দানভ্, রাশিয়ান বললে তো আর বুঝবিনে।"

ব্রজদা বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলুম। ক্রুশ্চেভের কথাটা শুনলুম বটে, কিন্তু তেমন গা করলুম না। তাছাড়া রান্নাটা এত ভাল হয়েছিল, আর এত ভ্যারাইটি যে, অন্যদিকে মন দেবার সময়ই ছিল না। দ্যাখ, কম্যুনিস্টদের কাছে



ক্রুশ্চেভ বললে, ব্রজদা

আমাদের অনেক কিছু শিখবার আছে। আমি তো রাশিয়া তন্ন তন্ন করে দেখেছি। ওখানে যে যার কাজ নিয়ে থাকে। পরচর্চা কেউ করে না। হিংসা দ্বেষ দেশ থেকে দূর করেছে। শ্রমিক কৃষকের কাজ হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি, তারা তা করে যাচ্ছে। নেতাদের কাজ হচ্ছে নেতৃত্ব করা, সেটা তারা করে যাচ্ছে। শ্রমিক কৃষক মোটা কাজ করে, তাদের সেখানে মোটামুটিভাবেই রেখে দেওয়া হয়েছে। বিলাসব্যসনে গা ঢেলে দিলে পাছে উৎপাদন ব্যাহত হয়, পাছে দেশের ক্ষতি হয়, তাই তাদেরকে ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নেতারা সেদিকে খুব কড়া নজর রেখেছেন। জনসাধারণ মাপা খাবার খায়, মাপা জায়গায় শোয়। কিন্তু নেতাদের তো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ করতে হয়, বিশ্বের উৎপীড়িত জনতাকে শোষণ থেকে মুক্তি দেবার ফন্দীফিকির মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। আর এই মাথার খাটুনিকে অব্যাহত রাখতে হলে, দেহের বিশ্রামের প্রয়োজন। আরাম বিরাম ভাল মতে চাই। তাই নেতাদের তোয়াজে রাখার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা দেশের জনসাধারণ হাসিমুখে করে যাচ্ছে। আমেরিকার যে-সব কূপমণ্ডুক ক্যাপিটালিস্ট ভাবে পার্থিব সুখ-ভোগের তারাই একমাত্র অধিকারী, রুশ দেশে এসে কম্যুনিস্ট নেতাদের চালচলন দেখে তারা থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেশে পালাবার পথ পায় না। এমনি প্রোগ্রেস করেছে রাশিয়া। প্রোগ্রেসিভ কাণ্ট্রি লোকে কি আর সাধে বলে?”

“রাশিয়াতেও তাহলে,” সুনীল বললে, “ধনী আর গরিবের পার্থক্য আছে বলুন।”

“তুই তো আমেরিক্যান ইম্পিরিয়ালিস্টদের বুলি কপচাতে লেগেছিস সুনীল।” ব্রজদা ঠেস দিয়ে বলে উঠলেন। “রাশিয়া কি ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ যে ওখানে ধনী গরিব থাকবে? ওটা কম্যুনিস্ট কান্ট্রি, ওখানে আছে নেতা আর জনতা। রাশিয়াতে যারা বড় বড় গাড়ি চড়ে, বড় বাড়িতে থাকে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ডিনার খায়, তোদের মত বুর্জোয়া সাংবাদিকরাই তাদের ধনী বলে গাল পাড়ে। কিন্তু তারা একটা মূল কথা ভুলে যায় যে, ক্যাপিট্যালিস্ট এবং কম্যুনিস্ট দেশের সিস্টেমই আলাদা। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজের যাঁরা মাথা তাঁরা নিজের থাকবার জন্য প্রাসাদ তৈরী করেন, কম্যুনিস্ট সমাজের যাঁরা মাথা তাঁরা ধনীদের প্রাসাদ বাজেয়াপ্ত করে তাতে বাস করেন। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজে ধনী নিজের জন্য গাড়ি কেনেন, কম্যুনিস্ট সমাজে নেতাদের পছন্দ করা গাড়ি কিনে দেয় রাষ্ট্র। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজে ধনী ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক, কম্যুনিস্ট সমাজে নেতা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মালিক। ক্যাপিট্যালিস্ট সমাজে নেতাদের জীবিতাবস্থায় তাঁর কৃতকর্মের সমালোচনা করা হয়, মরে গেলে তাঁর সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। কম্যুনিস্ট সমাজে উল্টো। ওরা এত ভদ্র যে নেতার জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। তাঁর নামে

জয়ধ্বনি দেয়। গত হলে তবে তাঁর বাপান্ত করে। এইখানেই ক্যাপিট্যালিজ্‌মের সঙ্গে মার্ক্সিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌ম্‌-এক্সিজ্‌মের ফান্ডামেণ্টাল তফাৎ।"

ব্রজদা দম নিতেই সুনীত ফস করে প্রশ্ন করে বসল, "মার্ক্সিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌ম্‌ বুঝলাম। কিন্তু এক্সিজ্‌ম্‌ তো বুঝলাম না।"

ব্রজদা একগাল হেসে বললেন, "বুঝিয়ে না দিলে ব্যাপারটা বোঝা শক্ত। কম্যুনিস্ট চিন্তায় তোদের ব্রজদার ঐটেই বিরাট একটা আবিষ্কার। মস্ত একটা অবদান। বুঝিয়ে বলছি, একটু মন দিয়ে শোন। এক্সিজ্‌ম্‌ = এক্‌স্‌ + ইজ্‌ম্‌। আর এই এক্‌স্‌টা হচ্ছে বীজগণিতের এক্‌স্‌। ফর্মুলার সারাৎসার। হোমিওপ্যাথি বা বায়োকেমিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এর প্রভূত ব্যবহার হয়েছে। যথা, বেলেডোনা থ্রি এক্‌স্‌, ইপিকাক সিক্‌স্‌ এক্‌স্‌ ইত্যাদি। চিন্তার ক্ষেত্রে এক্‌স্‌-এর প্রয়োগের কৃতিত্ব একমাত্র এই শর্মার। কম্যুনিস্ট দর্শনের নতুন হিস্ট্রিখানা পড়িস। দেখবি মার্ক্‌স্‌, এঙ্গেলস্‌, লেনিনের পাশে তোদের ব্রজদা, এই ব্রজ কারফর্মা কমরেড ব্রজদানভ্‌ কারস্কি ফর্মায়েভ্‌ হয়ে বিরাজ করছে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কম্যুনিজম্‌ অনড় মতবাদ তো নয়, ভয়ানক ডিনামিক জিনিস। সর্বদাই তর তর করে বয়ে চলেছে। যত দিন যাচ্ছে, যত প্রবক্তার জন্ম হচ্ছে, ততই ওর নামটাও বেড়ে যাচ্ছে। যথা, প্রথমে ছিল মার্কসিজ্‌ম্‌। তারপর মহামতি লেনিনের আবির্ভাব। হল মার্কসিজ্‌ম্‌ + লেনিনিজ্‌ম্‌। এলেন স্ট্যালিন! হল মার্কসিজ্‌ম্‌ + লেনিনিজ্‌ম্‌ + স্ট্যালিনিজ্‌ম্‌। স্ট্যালিন কুপোকাৎ হলেন। হল মার্কসিজ্‌ম্‌ + লেনিনিজ্‌ম্‌ + (স্ট্যালিনিজ্‌ম্‌ − স্ট্যালিনিজ্‌ম্‌)। এদিকে ক্রুশ্চেভ এলেন, ওদিকে মাও সে-তুঙ। তারপরই হল ফ্যাসাদ। চীনে কমরেডরা কম্যুনিজ্‌মকে তুঙ্গে তুলতে চায়। রুশী তভারিশরা তাতে নারাজ। তা বলে তো চিন্তার প্রবাহ থেমে থাকতে পারে না। হল মার্কসিজ্‌ম্‌ + লেনিনিজ্‌ম্‌ + (স্ট্যালিনিজ্‌ম্‌ − স্ট্যালিনিজ্‌ম্‌) × (ক্রুশ্চেভিজ্‌ম্‌ + মাওইজ্‌ম্‌)। বর্তমান পরিস্থিতিতেই কম্যুনিস্ট চিন্তার রূপটা এই দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দিন এখনও পড়ে আছে। টিটো ক্রমশ যে-ভাবে কল্কে পাচ্ছেন, চীন যদি ওঁকে মেনে নেয়, তাহলে ওঁকেও জুড়তে হবে। খিটকেল এখানেই থামবে না। আলবেনিয়ায় আনোয়ার খোজা আছেন, কিউবায় আছেন ফিদেল কাস্ত্রো, ইন্দোচীনে হো-চি-মিন। পোল্যান্ডে গোমুলকা।

"তারপর ধর, এখন কম্যুনিস্টদের যা মওকা, হুট করে কবে কোন্‌ দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটে যায়, তার তো ঠিক নেই। কাজেই সেইসব দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের জন্যও তো প্রভিশন, মানে জায়গা খালি রাখতে হবে। আর এখন যাঁরা আছেন, তাঁরা তো কেউ আর 'অমর্ত' ফল ভক্ষণ করে মর্ত্যে আসেননি যে, চিরকাল টিঁকবেন। মাও-এর পর চাউ আসবেন। তারপর হাউ-

মাউ আরও বাড়বে। লেজড় জুড়তে জুড়তে দশ-বিশ বছর পরে কম্যুনিস্ট চিন্তার চেহারাটা অবিকল একটা ব্যালাস্ট ট্রেন হয়ে দাঁড়াবে। মাথা থেকে ল্যাজ দ্যাখে কার সাধ্যি। কম্যুনিজ্‌মের ডিনামিক গতি যে সমিস্যের সৃষ্টি করেছে, তার সমাধানের জন্যই ক্রুশ্চেভ্‌ আমাকে কল দিয়েছিল। ঘ্যাঁচ করে করে দিলুম। উচ্চ-চিন্তায় মাথা খেলাতে বাঙালীদের সঙ্গে হোল্‌ ওয়ার্ল্ডে কেউ পারবে না। তাই তো ক্রুশ্চেভ্‌ বললে, ব্রজদা, বাঙালী আজ যা ভাবছে, বাকী দুনিয়ার লোকেরা সে চিন্তা শুরু করবে আগামীকাল, কথাটা যে কত সত্যি, তুমি তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ও আরও কত কি বলত কে জানে, ওকে থামিয়ে দিলুম। বললুম, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বাঙালী বাঙালী করে বেশী কচলিও না। ক্রুশ্চেভ্‌ হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন, কেন? আমি বললুম, এতে অন্য রাজ্যের লোকেরা অফেন্ডেড্‌ হতে পারে। আমাদের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের পক্ষে এই ধরনের সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা বড়ই ক্ষতিকর হতে পারে। আমরা এখন তাই ইন্ডিয়ান হয়ে গিয়েছি। জমিদারী, বীমা ব্যবসা, রামমোহন, বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথ এখন আমাদের দেশে কারো প্রাইভেট্‌ প্রপার্টি নয়, জাতীয় সম্পত্তি। ক্রুশ্চেভ্‌ একথা শুনে মোহিত হয়ে গেল। বললে, ব্রজদা, তোমরাই দেখালে। তোমার খুরে দণ্ডবৎ।”

“সে কি! পায়ে হাত দিলে!”

“এতে চোখ কপালে তোলার কি আছে নিতু। মার্ক্সিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌ম্‌-এর রেকারিং ডেসিমেলের অঙ্কের মত ডাইনামিক ইজ্‌মের যে খপ্পর থেকে ওকে বাঁচিয়েছি, তাতে ওটুক তো কিছুই নয়, ও ডন-বৈঠকের পর ডন-বৈঠক মারলেও আমি তো আপত্তি করার কিছু পেতাম না। শুনে নে, আগামী পার্টি সম্মেলনেই আমার থিসিসটা ওরা পেশ করছে।

“মার্ক্সিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌মের সঙ্গে এক্সিজ্‌ম্‌ যোগ করায় কথাটা যেমন ছোট হল, রাশিয়ার বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের আর বহির্রাশিয়ার ধেড়ে ধেড়ে কমরেডদেরও বেশ সুবিধে হল, মুখস্থ করতে আটকাবে না, তেমনি পার্সনালিটি কাল্টের মূলেও কুঠারাঘাত করা হল। যা দাঁড়াল, তা একটা পারফেক্ট ইম্পার্সনালিটি কাল্ট। কম্যুনিস্টরা এবার চোখ বুজে এটা আঁকড়ে ধরতে পারবে।”

ব্রজদা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সুনীলের প্রশ্নে থমকে গেলেন।

“মার্ক্সিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌ম্‌টা কি? ওটা কি পার্সনালিটি কাল্ট নয়?”

ব্রজদা বললেন, “দ্যাখ সুনীল, গুরু-গোঁসাইদের সম্পর্কে যা-তা বলে ওঁদের খাটো করতে নেই। এখানে এ-কথা বলে তুই পার পেয়ে গেলি, কম্যুনিস্ট দেশ হলে তোর বুকে হাঁটু দিয়ে ভুল স্বীকার করিয়ে ছাড়ত।

মার্কসকে, লেনিনকে কম্যুনিস্টরা মানুষ বলে ভাবে না। ওঁরা তার উপরের ক্যাটিগরির। আর বিজ্ঞানে বলে, পার্সনালিটি থাকে মানুষেরই। অতএব যিনি মানুষ নন তাঁর পার্সনালিটির বালাই নেই। সেই কারণেই ভূত, ভগবান, মার্কস্ আর লেনিনের পুজো পার্সনালিটি কাল্টের আওতায় পড়ে না। কম্যুনিজ্ম্ হচ্ছে বিজ্ঞান-শুদ্ধ মতবাদ, বুঝলি। ও-সব আলটু-ফালটু কথা আর বলিসনি। শুনতে ইচ্ছে হয় শোন, না হয় কেটে পড়। যত্তো বখেড়া!"

সুনীল ব্রজদার অতর্কিত আক্রমণে রীতিমত ব্যোমকে গেল। সুনীত মেক-আপ দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আচ্ছা ব্রজদা, আপনার না চাঁদে যাবার কথা ছিল?"

"কথা ছিল মানে! চাঁদের হাওয়া গায়ে না লাগলে কি এ জিনিস অমনি মাথা দিয়ে বেরোয়?" ব্রজদা সস্নেহে সুনীতের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন। "এতক্ষণ যা বললুম, সে-কথা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে চাঁদের রাশিয়ান জোনে বসে বসেই আলোচনা করেছিলুম।"

"রাশিয়ান জোনে!" সুনীল একটা হেঁচকি তুলল। "চাঁদে আবার রাশিয়ান জোনও হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ, পূর্ব দিকটা রাশিয়ানদের আর পশ্চিম দিকটা আমেরিকানদের। খবর তো রাখ না কিছু। দিল্লির দপ্তরখানা থেকে সরকারী হ্যাণ্ড-আউট কুড়িয়ে কুড়িয়ে তো করেসপণ্ডেন্ট হয়েছ। তার আবার বাত কত?"

"কেন ব্রজদা, শুধু হ্যাণ্ড-আউট কুড়িয়ে কেন", সুনীল কৈফিয়ত দিল, "আমরা এমবাসীর ককটেল পার্টি, ভি আই পি···"

"থাম, থাম", ব্রজদা বললেন, "ভি আই পি শোনাচ্ছিস যে বড়, আমার চেয়ে বড় ভি আই পি হোল্ ওয়ার্ল্ডে কে আছে আর খুঁজে বার কর দিকি. নিজের পাবলিসিটি করতে চাইনে তাই, তা কখনো এসেছিস আমার কাছে? আরে, আজকের দুনিয়ার সব থেকে বড় খবর তো এই শর্মার কাছে। তোরা খবর পাবি কোথায়?"

একটু দম নিয়ে ব্রজদা বললেন, "তাহলে শোন বলি। ডিনার খেতে খেতে ক্রুশ্চেভ্ কানের কাছে মুখ এনে বললে, ব্রজদা, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, খুব জরুরী। আমি খেয়েই যাচ্ছি, এক-এক কোর্স ডিনার শেষ হচ্ছে, আর তার পরই আসছে ভোদকার পেগ, আমি টকাটক দু-তিনটে গলায় ঢেলে দিচ্ছি। ওর কথায় হুঁ না, কিছুই বলছিনে। যখন পঁচিশ কোর্স খানা আর পঞ্চাশ-ষাট পেগ ভোদকা উড়িয়ে, রাত একটা নাগাদ ডিনারের মাঝামাঝি এসে পেঁছিলুম, তখন আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে

ক্রুশ্চেভ্‌ আর স্থির থাকতে পারল না। আমার বাঁ-হাতখানা চেপে ধরে বললে, এই ব্রজদা! শোন বলছি, ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস, একটা ব্যাপারে তোমার মতামত চাই। চল, ওঠো। মেনুর উপর চোখ বুলিয়ে আমি অবাক হলাম। বললাম, ভাল রে ভাল, এখনও অর্ধেক পদ পড়ে থাকল, আর এরই মধ্যে উঠতে বলছ। পেট ভরে যদি খেতেই না দেবে তবে নেমন্তন্নই বা করলে কেন? ক্রুশ্চেভ্‌ বললে, এ তোমার ক্যাপিট্যালিস্ট দুনিয়ার ডিনারের নেমন্তন্ন নয় ব্রজদা, যে পাঁচ কোর্সেই খতম হবে। এ হচ্ছে রাশিয়ান ব্যাঙ্কোয়েট, শেষ হতে রাত পুইয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকা তোমারও অসাধ্য। এতক্ষণ যে আউট হয়ে যাওনি, এতেই তোমার স্ট্যামিনার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছে। এখন রাশিয়ান ব্যাঙ্কোয়েট শেষ করতে পারে এমন লোক একজনই আছে। আমি। অথচ স্ট্যালিনের আমলে আমাকে ব্যাঙ্কোয়েট শেষ হবার আগেই আউট হয়ে যাবার ভান করতে হত।

ক্রুশ্চেভের কথা শুনে আমি একটু আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, কেন? ক্রুশ্চেভ্‌ বললে, স্ট্যালিনের ব্যাঙ্কোয়েটের নাম আমি দিয়েছিলুম ফাঁসীর খাওয়া। সে-আমলে যিনিই স্ট্যালিনের সঙ্গে টক্কর দিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট শেষ করেছেন, তাকেই ঐ ফাসিস্তের বাচ্চাটা (এ গালটা রাশিয়ায় সন-অব-এ-বিচ থেকেও খারাপ), ভবসিন্ধুপারে পাঠিয়ে দিয়েছে। স্ট্যালিন কখনোই তার রাইভালকে বরদাস্ত করত না, তার মতলব আমি আগে-ভাগেই জানতে পেরেছিলুম, এ আমার বাপের ভাগ্যি, তাই তোমার সঙ্গে আজ খেতে বসার মওকা পেয়েছি। এখন রাশিয়াতে আমিই এ-বিষয়ে চ্যাম্পিয়ান। বুলগেনিন, ম্যালেনকভ, ঝুকভ, মলোটভ, ঐ স্ট্যালিনিস্টগুলো অবিশ্যি এ-বিষয়ে আমার সমান সমান ছিল, তা জনগণই ওদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে।

ক্রুশ্চেভের বড়াই দেখে আমার হাসি পেল। আমাকে রাশিয়ান ব্যাঙ্কোয়েট দেখাচ্ছে। বাঙালীর বাড়িতে বিয়ে আর শ্রাদ্ধের খ্যাটন তো দ্যাখনি চাঁদ' তার কাছে তোমার এই ব্যাঙ্কোয়েট সকালের চাল-জল খাওয়া। এস, আজ তোমার চ্যাম্পিয়ানগিরি শিকেয় তুলে দিচ্ছি।

ভোর চারটেয় শেষ কোর্সটা সাবড়ে ভোদকার শততম পেগটি যখন আলগোছে গলায় ঢেলে দিলুম, তখন দেখি ক্রুশ্চেভ্‌ ডিনার টেবিলে দু-হাতে মাথা রেখে ফুরুৎ ফুরুৎ নাক ডাকাচ্ছে। আমি একটু হেসে ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ভোরাই রাগিণীতে গান ধরলুম :

রাই জাগ রাই জাগ, শুক সারি বোলে।
কত নিদ্রা যাও হে রাই,
কালো মাণিকের কোলে!!

ক্রুশ্চেভ্ ধড়মড় করে উঠেই বললে, আমি কিন্তু ঘুমুইনি, একটু থিংক্ করছিলুম। ঘুমুচ্ছে দ্যাখো ঐ ওরা। চেয়ে দেখি, গেস্টরা সব সারা হলঘরে মাইফেল শেষের তাকিয়ার মত পড়ে আছে। বললুম, চারটে তো বাজল, জরুরী কথা কি আছে বলছিলে। ক্রুশ্চেভ্ বললে, হ্যাঁ, চল একটু নিরিবিলিতে যাই।

ব্যাঙ্কোয়েট হলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলুম দুজনে। ক্রুশ্চেভ্ তাঁর বেবি ভোস্টকের দরজা খুলে আমাকে আগে উঠতে বললে। তারপর নিজেও উঠল। রকেটটা কিন্তু ভারী সুন্দর। টু-সীটার টুরর্। সামান্য একটু ঝাঁকুনি খেতেই ক্রুশ্চেভ্ দরজা খুলে নেমে পড়ল। বললে, এসে গেছি ব্রজদা, নামো। নামতেই, মরি মরি মরি, প্রাণটা তর্র্ হয়ে গেল। এ কোথায় এলুম রে, এ যে চির বসন্তের দেশ। মলয়, পিক ইত্যাদি মিলে তনু মন প্রাণ সব হ্যান্ডাব্যান্ডা করে দিলে। শেষ পর্যন্ত কী যে হত কে জানে, ক্রুশ্চেভ্ জোর বাঁচা বাঁচিয়ে দিলে। আমায় ওরকম আনচান করতে দেখে ক্রুশ্চেভও একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশির ভিতর খানিকটা গুঁড়ো মতন কি ঢালল, বেশ করে গুলে নিয়ে তার এক ফোঁটা আমার বাঁ-হাতে ঢেলে, একটা বারসূঁচ দিয়ে তিনটে আঁচড় কেটে দিলে। ব্যস্ ধাতস্থ হয়ে গেলুম।

সুনীত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, "জিনিসটা কী ব্রজদা।"

"রাশিয়ান টীকে।" ব্রজদা বললেন, "বসন্তের হাত থেকে বাঁচাবার এ-রকম মোক্ষম প্রতিষেধক আর নেই। ব্রজদা বাঁ-হাতে একটা বড় টীকের দাগ দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখ, ব্রজ প্রমাণ ছাড়া কোন কথা বলে না।"

"তারপর কী হল?"

"তারপর আমরা হাই অল্টিচ্যুড্ তাঁবু খাটিয়ে সেখানে দিনকতক বাস করলুম। আর ভবিষ্যৎ কম্যুনিজ্মের ফর্মুলো তৈরি করে দিলুম। সে-কথা তো আগেই বলেছি।"

সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে ব্রজদা বললেন, "যেদিন চলে আসব, তার আগের রাত্তিরে বললুম, কেনেডির সঙ্গে দেখাটা না করেই চলে যাওয়াটা কি তোমার পক্ষে ভাল দেখাবে। কূটনৈতিক সৌজন্য বলেও তো একটা কথা আছে।"

"কেনেডি!" ক্রুশ্চেভ্ চমকে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, "তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে না কী? কেনেডি এখানে কোথায়?"

"না, সে এখানে নেই", আমি শান্তভাবে বললুম, "সে ঐ পশ্চিম সাইডে



মর্নিং-ওয়াক করতে গিয়ে রোজই তো ওর সঙ্গে দেখা হয়

আমেরিকান জোনের সীমানাটা পাকা করবার জন্য খুঁটোটুঁটো পুঁতছে।"

"খুঁটো পুঁতছে! বাই মার্কস্! আচ্ছা জাঁহাবাজ তো!" হঠাৎ দেখি ক্রুশ্চেভ্ আমার দিকে বেশ সন্দেহ-কুটিল চোখে চাইছে। আমার জামার কলারটা চেপে ধরে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল, "এত খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?"

"আমি কোত্থেকে পেলাম মানে?" আমি আশ্চর্য হয়েই বললুম, "মর্নিং ওয়াক্ করতে গিয়ে রোজই তো ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমাকে আবার দারুন খাতির করে কি না। দেখা হলে এক পাত্তর বিয়ার না খাইয়ে ছাড়ে না।"

"ঠিক ঠিক। তোমার মুখে কদিন ধরে ক্যাপিটালিস্ট বীয়ারের গন্ধ পেয়েছি তো। তা আমি ভেবেছি তার কারণ অন্য। ভেবেছিলাম, তোমরা ইণ্ডিয়ানরা তো নিউট্রাল, তাই রাশিয়ান ভোদকা খেয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যই বুঝি আমেরিকান বীয়ারের ঢেকুর তুলছ। কিন্তু তলে তলে যে এই কাণ্ড, তা জানব কী করে। উঃ, কী সাংঘাতিক। ল্যাকিজ অব ক্যাপিটালিজ্‌ম্।"

বললাম, "মিছিমিছি গাল পেড়ো না। ফের গালমন্দ করেছ কি, আমি কেনেডির তাঁবুতে চলে যাব। ও তো আমাকে যেতেই বলছিল, আমিই আরও বললুম, বাঃ, তা কি করে হয়, এসেছি একসঙ্গে, তাছাড়া তুমি হলে আমার ফ্রেণ্ড, আর ক্রুশ্চেভ (এখনও পর্যন্ত) আমার ব্রাদার, ও তাড়িয়ে না দিলে আসি কি করে, চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো।

"ব্যস্, এক প্যাঁচেই বাছাধন কাবু। ক্রুশ্চেভ্ খাতিরের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। ওকে বললুম, তোমাদের দুজনের মধ্যে যে-রকম টেনশন, তোমাদের দুই জোনের সীমানা গায়ে গায়ে ঠেকানো বুদ্ধির কাজ হবে না, যে-কোন মুহূর্তে বিশ্বে আণবিক যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। সেটা কি ভেবে দেখেছ?"

"সেইটেই তো ভাবছি তখন থেকে, যখন থেকে তোমার মুখে এই সাংঘাতিক খবর শুনেছি। পরিস্থিতি খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াল দেখছি। এখন কি করা যায় বল তো?"

বললাম, "কেন, একটা সোজা উপায় রয়েছে। নন্-এলাইন্‌মেণ্ট। তোমাদের দুই জোনের মাঝখানে একটা নিউট্রাল জোন করে দাও। ল্যাঠা চুকে যাক।"

ক্রুশ্চেভের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "দি আইডিয়া। ব্রজদা, মাই ডিয়ার ডিয়ার ব্রজদা, তুমি গ্রেট্। ব্রজ্‌দানভ্ দি গ্রেট্।" তারপর একটু থেমে বলল, "তা না হয় হল, কিন্তু ও কি রাজী হবে? উনি একটি বাস্তু ঘুঘু।"

"যেমন ঘুঘু, তার ফাঁদও তেমন আছে। কেনেডিকে রাজী না করিয়ে

কথাটা তোমার কাছে পেড়েছি না কি। ওঁর সঙ্গে আমার এই ব্যাপারে একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে।”

ক্রুশ্চেভ্ আমায় একটা গালাগাল দিতে মুখ খুলতে যাচ্ছিল; আমি বললুম, “নো গালাগাল বিজনেস। গাল দিয়েছ কি আমি—”

ক্রুশ্চেভ্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “না না, গাল দিচ্ছিনে। কিন্তু এটা কি হল?”

বললুম, “খাঁটি বাংলায় এটা হল—পিওর একটি ল্যাং।”

“ল্যাং!” ক্রুশ্চেভ্ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, “শুনলে তো চীনে চীনে বলে মনে হয়। বস্তুটা কি?”

“চীনে নয়, খাঁটি বঙ্গদেশী জিনিস। ওর চেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কারই হয়নি। তোমাদের হাজার মেগাটনের বোমাও ওর কাছে ছুঁচো পটকা।”

“বলো কী!”

“কেন, ল্যাংখানি খেয়ে নিজেই তো টের পেলে।”

“তা বটে।”

“চীনেরাও, যদি এখনও সাবধান না হয়, ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে না যায়, টের পাবে লেঙ্গি কাকে বলে। তখন আর বাপ বলতে দিশে পাবে না।”

“লেঙ্গি, লেঙ্গিটা আবার কি?”

বিরক্ত হয়ে বললুম, “কিছুই তো জান না, এদিকে আবার মিঃ ওয়ার্ল্ড হবার শখটা ষোলআনা আছে। লেঙ্গি হচ্ছে ল্যাং-এরই ইস্টবেঙ্গল সংস্করণ। ওর এফেক্ট আরও নিদারুণ। ওর মার মোক্ষম মার।”

আমার কথা শুনেই ক্রুশ্চেভ্ পিকিংকে সিক্রেটলি ইনফর্ম করে দিয়েছিল। হাজার হোক, চীন কম্যুনিস্ট তো। একটা কম্যুনিস্ট কাণ্ট্রি নন্-কম্যুনিস্টের কাছে বেইজ্জত হয়ে যাক, এটা কোন কম্যুনিস্টই প্রাণে ধরে চাইতে পারে না। মুখে মুখে যে যতই তড়পাক।”

ব্রজদা উঠতেই সুনীত জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা ব্রজদা, চাঁদে আমাদের, মানে, নিউট্রাল জোনটা কেমন?”

“কী কেমন?”

“এই মানে জায়গা জমি—”

“জায়গা জমি”, ব্রজদা বললেন, “কেমন আবার! ভালো জমি কি কেউ খয়রাত করতে চায়? এই ভূদানে যে ধরনের জমি পাওয়া যাচ্ছে, কোয়ালিটিটা সেই রকম আর কি।”

অষ্টাদশ গল্প

সুনীত বিয়ে থা করার পর থেকে অনেক চৌকস হয়েছে। মনের ভাব এখন গোপন করতে শিখেছে (বিয়ে করার অবশ্যম্ভাবী ফল)। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর পারল না। বেচারা অনেকক্ষণ ধরে আত্মসংবরণ করে চুপচাপ বসে ছিল। বলতেই হবে, সে সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

ব্রজদা সিনেমায় নব্য তরঙ্গের অবদান সম্পর্কে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে একনাগাড়ে ভাষণ দিয়ে চলেছেন, সুনীত একবারও মুখ খোলেনি। এমন কি, ব্রজদা যখন তাঁর আগামী চিত্রের নামটা ঘোষণা করলেন, তখন সুনীলের মধ্যেই বরং চঞ্চলতা দেখা গিয়েছিল।

টাইপ-রাইটারের চাবিতে আঙুলের ঠোক থামিয়ে টাক মুছে সুনীলই জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি বললেন? নামটা আবার বলুন!"

ব্রজদা বললেন, "বললে তোরা ভাল বুঝবিনে। লিখে দিচ্ছি। যদু তোর প্যাডটা দে তো।"

প্যাডটা পেতেই ব্রজদা খস খস করে লিখে দিলেন, "ং ঃ ँ।" বললেন "এই হল আমার ছবির টাইটেল।"

সুনীল ট্যারা হয়ে বলে উঠল, "মানে?"

ব্রজদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "সৃষ্টির আবার মানে কি। সৃষ্টিই সৃষ্টির মানে। এই যে আকাশ, এই যে বাতাস, এই যে সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসবের কোনও মানে বের করতে পারবি? পারবিনে। কেননা, এগুলো সব সৃষ্টি, মহৎ সৃষ্টি। একটা সামান্য কথাই ধর না, এই যে তুই জন্মেছিস, আমি যদি তার মানে জানতে চাই, পারবি বলতে?"

সুনীল রণে ভঙ্গ দিল। যদুদা হঠাৎ বলে বসলেন, "সিনেমাকে আপনি সৃষ্টি বলতে চান?"

"আলবৎ", ব্রজদা টেবিলে চাপড় মেরে বলে উঠলেন, "শুধু সৃষ্টি নয়, সিনেমা আরও কিছু। যেমন ধর সত্ত্ব রজঃ তমঃ, তেমনি এটাও। যথা : সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি আর সিনেমা-সৃষ্টি।"

এবার যদুদার স্তব্ধ হবার পালা। তিনি নিঃশব্দে সিনেমা পাতার প্রেজ-প্রুফে মনোনিবেশ করলেন।

সুনীল খুঁতখুঁত করে বলে উঠল, "যাই বলুন ব্রজদা, আমরা অরডিনারি

লোক। অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারিনে।"

ব্রজদা বললেন, "এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বললি সুনীল। সিনেমার মজাই হল এই, হয় অর্থ অর্থাৎ বক্স্ অফিস আর না হয় নুভেল ভাগ অর্থাৎ ভেগে পড়া। এ ছাড়া আর তৃতীয় পন্থা নেই। বুঝেছ। বক্স্ অফিস পাব বলেই তো ছবির নাম দিয়েছি ং ঃ ँ। ছবি শুধু ँ হয়ে উঠলে তখন পাওনাদারের হাত এড়াতে নু অর্থাৎ নতুন ভেল অর্থাৎ ওড়না কিনে মুখ চাপা দিয়ে ভেগে পড়া ছাড়া আমাদের মত ছাপোষা ডিরেকটারের আর কি পন্থা থাকতে পারে বল।"

এতক্ষণে সুনীতের মুখে অস্ফুট একটা আওয়াজ শোনা গেল।

ব্রজদা চকিতে তার দিকে চেয়ে সস্নেহে বললেন, "নিতু, কিছু বলবি?"

"বলবি মানে", বিশু ক্যামেরার ব্যাগটা এমনভাবে সরালে, যেন ওই ব্যাগটাই সুনীতের স্বরযন্ত্র এতক্ষণ চাপা দিয়ে রেখেছিল। "দেখছেন না", বিশু ব্রজদাকে বলল, "কথাগুলো অনেকক্ষণ থেকে বেরুতে না পারায় ওর চোখ মুখ কেমন ফুলে উঠেছে।"

"আহা, ওকে বাধা দিও না।" ব্রজদার করুণা ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টির মত মিহি করে ছিটিয়ে পড়ল। "বল নিতু, নির্ভয়ে বলে যাও।"

"মানে, আমি যেন আলো দেখলাম।" সুনীত এক দমকে পুরো বাক্যটা বলে ফেলে সিগন্যাল-না-পাওয়া ট্রেনের মত খচাৎ করে ব্রেক কষল।

বিশু বললে, "ধুস্, আমি ভাবলাম না-জানি কি।"

সুনীল কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে মোলায়েমভাবে বলল, "নিয়নের আলো তো সেই সন্ধ্যে থেকেই জ্বলছে। এতক্ষণ কি ঘুমুচ্ছিলেন?"

সুনীত বিব্রত হয়ে বলল, "না না, ও আলো নয়, ও তো আমিও দেখছি. সেই সন্ধ্যে থেকেই দেখছি। আমি নিয়ন আলো মীন্ করিনি।"

"তবে কি মীন্ করেছেন", সুনীল তেমনি শীতল কণ্ঠে উগরে চলল, "অরোরা বোরিয়ালিস্, মধ্যরাতের সূর্য। কিন্তু সে তো স্ক্যানডিনেভিয়ায় না গেলে—"

সুনীত অতি কষ্টে সামলে নিল। "না না, কোন রিয়েল আলো নয়, ব্রজদার চন্দ্রবিন্দুতেই আলো দেখলাম।"

এমন কি যদুদার মত লোকও ফ্যালফ্যাল করে সুনীতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বিশু বলল, "শুধু শুধু ভয় দেখাসনি মাইরি, ভড়কে যাব।"

সুনীত এতক্ষণে তেতে উঠল। "ভয় আবার কখন দেখালাম।"

"লাইফের ওয়ান-থার্ডও তো পার হলিনে। এখনই চন্দ্রবিন্দুর আলো

দেখছিস", বিশু খুব সহানুভূতির সঙ্গে বলল। "ও আলো তো ব্রজদার ইহলোকে চোখে পড়ে না।"

সুনীত উৎসাহ পেয়ে বলে উঠল, "সেইটেই তো বলতে চাইছি।"

বিশু বলল, "আমিও তো তাই বলছি, তুই পরলোকের আলো দেখতে শুরু করেছিস, তাতেও বলছিস আমরা ভয় পাব না।"

ব্রজদা গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "তোর পেটটা ভাল আছে তো?"

সুনীত বিপন্ন হয়ে বলল, "আমার কথাটা আপনারা ধরতে পারছেন না।"

সুনীল বলল, "কথা তো বেশ আস্তে ধীরেই বলছেন, জেটের স্পীড তো নয়, ধরতে না পারার কী আছে?"

"দেখুন মশাই", এতক্ষণে সুনীতের অরিজিন্যাল চেহারা বেরিয়ে পড়ল, "বেশি টিক টিক করবেন না, আপনাদের আই. কিউ. যে এত নেমে গিয়েছে তা আমার ধারণা ছিল না। আমি বলছি এক আর আপনারা মানে করছেন উল্টো। হয় আমাকে বলতে দিন, নয় আমাকে যেতে দিন।"

যদুদা বললেন, "আপনি বলেই যান।"

সুনীত নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, "পরকালের চন্দ্রবিন্দু নয়, আমার মনে হল, আমি যেন ব্রজদার ছবির টাইটেলের মানেটা ধরতে পেরেছি। সেই অর্থেই আমি আলো দেখেছি বলেছি।"

সুনীল বলল, "তা এই কথাটা এতক্ষণ বলে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যেতো।"

সুনীত (গরম হয়ে) বলল, "বলতে আর দিচ্ছেন কই? সেই তখন থেকেই তো বাগড়া মারছেন। বলতে দিলে তো বলব।"

সুনীল ঠকাস ঠকাস করে টাইপ-রাইটারে দুটো ঘা মেরে বলল, "নিজের রাইট-এ চলবেন মশাই, অন্যের তোয়াক্কা করবেন কেন? এই দোষেই তো বাঙালী মরেছে। পুনরুত্থানের আর চান্স নেই।"

ব্রজদা সুনীলের দিকে চোখা নজর ছুঁড়ে সুনীতকে বললেন, "বলে যা, নিতু।"

সুনীতও কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল, "আমার তো মনে হয় ব্রজদার এই ং ঃ ̐ টাইটেলের মধ্যে একটা মহৎ ভাব, একটা বিরাট বক্তব্য, একটা—একটা—মানে দারুন একটা ফিলসফি লুকিয়ে রয়েছে।"

বিশু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বলল, "মোদ্দা ব্যাপারটা কি?"

সুনীত বলল, "আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় শূন্যবাদের ক্রমবিকাশ। একেবারে খাঁটি ভারতীয় ভাবধারা। ং-এ, অর্থাৎ আদিতে এক শূন্য বিরাজমান ছিল, ঃ-এ, অর্থাৎ মধ্যপথে এসে এককে বহু হবার ঝোঁক দেখা

গেল, এবং •-এ, অর্থাৎ অন্তিমে সেই ০-ও বিন্দুবৎ, অর্থাৎ কিনা একেবারেই বিলীন।”

“তোর ভেতর পদার্থ আছে নিতে”, ব্রজদা খুশি হয়ে বললেন, “ভালো সিনেমা ক্রিটিকের বীজ তোতে আছে। আচ্ছা এবার শোন।”

ব্রজদা হাত বাড়াতেই যদুদা অভ্যেস বশে একটা সিগারেট তাঁকে দিতে যাচ্ছিলেন, ব্রজদা হেসে বললেন, “নস্যি থাকে তো দে। ও-সবে আর শানায় না। চিত্রনাট্য রচনা, সে বড় কঠিন কাজ। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা দিয়ে হাত পাকাতে শুরু করেছিলাম, বুঝলি। যা একখানা সিনারিও তৈরি করেছিলুম না, শুনলে ট্যারা হয়ে যাবি। কোনও ব্যাটাচ্ছেলে সেই ছবি তুলতে সাহস পেল না। মনের ঘেন্নায় নিজেই শেষে ডাইরেক্টার হয়ে গেলুম। ওপেনিং শটখানা কী!”

ব্রজদা তদ্‌গত হয়ে বলে উঠলেন, “অন্ধকার। একেবারে স্ক্রীনে কালি ছেটানো অন্ধকার। অ্যান্ড নো সাউন্ড। এক মিনিট। তারপর স্ক্রীনে সাদা ফোকাস। ব্যাক গ্রাউন্ডে খুব অস্পষ্টভাবে জলের উপর দাঁড় পড়ার শব্দ। তারপর ধীরে ধীরে টাইটেল ফুটে উঠতে লাগল। প্রত্যেকটা টাইটেলের মোতিফ হচ্ছে জলের ঢেউ। অর্থাৎ কথাগুলো যেন ঢেউ-এ ভেসে এসে সাদা শক্ত স্ক্রীনে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মিউজিক এখনও নেই। শুধু জলের উপর দাঁড় পড়ার অস্পষ্ট ছপছপানি। গোড়ায় টাইটেলগুলো মন্থর ঢেউ-এর দোলায় পর্দায় ফুটে উঠেছিল, ক্রমশ গতিবেগ বাড়তে লাগল। টাইটেলের ঢেউ ক্রমশ বড় হতে লাগল। লিপিগুলো অশান্ত হয়ে উঠছে। এই প্রথম কথা শোনা গেল।

নেপথ্যে বৃদ্ধের কণ্ঠ : কি ব্যাপার, ননীগোপাল কাঠ আনতে গেল তো গেলই।

দ্বিতীয় কর্কশ কণ্ঠ : ও কি আর আছে, যা ন্যালাখ্যাপা লোক। দেখগে, তোমার ননীগোপাল হয়ত এতক্ষণ বাঘের পেটে।

কয়েকটি রমণীকণ্ঠের অস্ফুট আর্তস্বর। বৃদ্ধার কণ্ঠ : বালাই ষাট। অলক্ষুণে কথা বলনি বাবা। ছেলেটা উপগারি বটে। একাই কাঠ আনতে নেমে গেল। আর তো কারও মুরোদ হলনি।

মাঝির কণ্ঠ : জোয়ারে বড় জোর গো। নাও ছেড়ে দিলাম। রাখতে পারছি না।

টাইটেলের লিপি যেন পর্দা ছিঁড়ে বাইরে লাফিয়ে পড়বে, এতই অশান্ত।

মেয়েরা : লোকটাকে ফেলে পালাচ্ছ, ধম্মে সইবেনি।

পুরুষরা : চুপ। চুপ। গোল করো না।

সমস্বরে : ননীগোপাল! ননীগোপাল!

টাইটেলে প্রযোজনা, পরিচালনা, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত—ব্রজরাজ কারফর্মা। ফট্।

ব্রজদা চুপ করতেই বিশু বলে উঠল, "ফট্! ফট্ কি?"

ব্রজদা : নৌকোর দাঁড়ে নেপথ্যে ওই রকম শব্দ হল। ধর নৌকোর পাটাতনে একটা দাঁড় পড়ল। টাইটেলও ওই সঙ্গেই শেষ। আর পর্দাও সঙ্গে সঙ্গে আবার ভুষো মাখানো অন্ধকারে ঢেকে গেল। এই হল কপালকুণ্ডলার টাইটেল।

"কি বললেন", সুনীল বলল, "কপালকুণ্ডলা!"

ব্রজদা : কেন, তোমার আপত্তি আছে?

"না না", সুনীল অপ্রস্তুত হল, "মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম, এটা বুঝি ং ঃ ঁ-রই টাইটেল। আচ্ছা, ননীগোপাল কে?"

"কেন, কপালকুণ্ডলা ছবির হিরো।"

যদুদার চোখ গোল হল। বললেন, "কপালকুণ্ডলার হিরো! ননীগোপাল! মানে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, কিন্তু", সুনীল যথেষ্ট আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, "বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার হিরোর নাম তো ননীগোপাল নয়। তার নাম তো—"

"নবকুমার।" ব্রজদা বললেন, "নিতান্ত নাবালকেও তা জানে। তোমার আর পাণ্ডিত্য ফলাতে হবে না।"

সুনীল বলল, "তাহলে ননীগোপালকে পেলেন কোথায়?"

"চিত্রনাট্যে। উপন্যাসে বঙ্কিমের সৃষ্টি যেমন নবকুমার। কপালকুণ্ডলার চিত্রনাট্যে তোদের ব্রজদার ক্রিয়েশন তেমনি ননীগোপাল। নবনীমাধবই রাখব ভেবেছিলাম। সাত-পাঁচ ভেবে ননীগোপালই বহাল রাখলাম। চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে নবকুমারকে খারিজ করতেই হত।"

"কেন?"

যদুদার এই প্রশ্নে ব্রজদা কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলেন। তবুও মেজাজটি যথাসম্ভব খোশ রাখার চেষ্টা করে বললেন, "উপন্যাসের নাম কি ঠিক ঠিক সিনেমায় রাখা যায়? এটা যে ডিফারেনট্ মিডিয়াম। আগেকার যুগে যাও বা চলত, বাংলা সিনেমা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করার পর থেকে আমরা সে বালাই চুকিয়ে দিয়েছি। সিনেমার এখন একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা হয়েছে। সাহেব মেমরা এখন বাংলা ছবির রিভিয়্যু বড় বড় সব ইংরাজি কাগজে লিখছে। আছিস কোথায়?"

একটু থেমে ব্রজদা বললেন, "টাইটেলের পর অন্ধকার। তারপরই লং শট্,

প্রখর আলোয় উদ্ভাসিত এক পর্বতের চূড়া। ক্যামেরা প্যান করে একটা প্যানোরামিক ভিউ দেখাল। কাট্। মিড্ শট্, চূড়ার উপর কপালকুণ্ডলা বসে আছে। নিশ্চল মূর্তি। কাট্। ক্লোজ আপ, অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী। যেন কুমোরটুলির প্রতিমে। বাতাসে সুনিবিড় ঘনকৃষ্ণ কেশদাম আন্দোলিত হচ্ছে, তাই বোঝা যায় নারী। আচ্ছা বল তো, স্ট্যাচুর আভাস না দিয়ে কুমোরটুলির কাজ বোঝালাম কেন।"

এ-ওর মুখের দিকে চাইল। সবাই নিরুত্তর।

ব্রজদা সস্নেহে হেসে বললেন, "সিমবল্টা ধরতে পারলিনে হাঁদারাম। স্ট্যাচুর সঙ্গে পাথরের সম্পর্ক। কুমোরটুলির সঙ্গে মাটির। কপালকুণ্ডলার ভাল নাম যে মৃন্ময়ী। সেইটে এস্টাব্লিশ্ করে দিলাম।"

পরমুহূর্তেই ব্রজদা বললেন, "কাট্। এর পরই জুম দিয়ে ননীগোপালকে টেনে চূড়ার কাছাকাছি এনে ফেললাম। কাট্। ক্লোজ শট, কপালকুণ্ডলার চোখে সন্ধানী তীব্রতা। একটু ঝুঁকে নিচের দিকে চাইল। ক্যামেরা পরমুহূর্তে প্যান করে ননীগোপালকে ধরে ফেলল। মিড্-লং-শট্, পথশ্রমে ক্লান্ত ননীগোপাল হাঁফাতে হাঁফাতে উপরের দিকে উঠছে। চট করে দেখলে মনে হয় বুঝি এক মাউনটেনিয়ার। মিড্ শট্, ননীগোপাল একটা কুড়ুলের হাতলে ভর দিয়ে উঠছে। কাট্। ক্লোজ আপ, কপালকুণ্ডলার মুখ। ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। ক্লোজ শট্, ঝুঁকে পড়ে ননীগোপালের দিকে চেয়ে আছে। কাট্। টপ্ শট্, পাহাড়ের চূড়া, ঝুঁকে বসা কপালকুণ্ডলা, ননীগোপাল ধীরে ধীরে উঠে আসছে। কাট্। ক্লোজ আপ, কপালকুণ্ডলার রাশি রাশি চুল উড়ছে, কপালকুণ্ডলার ঠোঁটের কৌতুক মিলিয়ে গেল, ননীগোপালের দুর্দশায় তার ঠোঁটে করুণার প্রকাশ। জাম্প্ কাট্। সিড্ ক্লোজ্, ননীগোপাল চূড়ার নিচে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। ক্লোজ আপ, মুখে বুকে দরদর ঘাম। কাট্। ক্লোজ শট্, কপালকুণ্ডলা দেখছে। ননীগোপাল তাঁর নাগালের মধ্যে। সংলাপ : পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ! কাট্। ক্লোজ শট্, ননীগোপাল চমকে উঠল। এই প্রথম চূড়ার দিকে চাইল। কাট্। লং শট্, ক্যামেরার চোখে সুনীল আকাশ। সাদা পায়রা লাট খেতে খেতে সমুজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ সাঁতার কাটল। তারপর অতর্কিতে একখণ্ড ঘন মেঘ তাকে গ্রাস করে ফেলল। ক্লোজ শট্, ঘন কালো মেঘ। মিক্স্, কালো মেঘ কপালকুণ্ডলার কালো চুলে রূপান্তরিত হয়ে ক্যামেরার চোখ কিছুক্ষণ আবৃত করে থাকল। তারপর চট করে সরে গেল। কাট্। ক্লোজ আপ, ননীগোপাল ভ্যাবাগঙ্গারামের মত চেয়ে আছে। এখানে ঝড়াক্সে একটা মন্তাজ মেরে প্রথমে ননীগোপালের মুখ, তারপর শুধু তার চোখ দুটো, তারপর কপালকুণ্ডলার চোখ দুটো, তারপর তার মুখ এবং তার ঠোঁটে আবার কৌতুকের হাসি ক্লোজ-আপে দেখাতে হবে। তারপর সংলাপ :

পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ? কাট্। ক্লোজ শট্, কৌতুকময়ী কপালকুণ্ডলা নিঃসংকোচে নবীগোপালকে সাহায্য করার জন্য হাতখানা এগিয়ে দিচ্ছে। কাট্। ক্লোজ শট্, মন্ত্রমুগ্ধ ননীগোপালের হাতখানা আপনা থেকেই কপালকুণ্ডলার দিকে এগিয়ে আসছে, খুব কাছাকাছি এল। ছোঁয় ছোঁয় এমন সময় প্রচণ্ড গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল। অমনি ফ্রিজ্। পর্দায় হাত দুখানা সেঁটে গেল। নেপথ্য সংলাপ—কাপালিকের গর্জন, মেঘমন্দ্র স্বরে : ক-পা-ল-কু-ণ্ড-লে! ক্লোজ আপ, ভীত ত্রস্ত কপালকুণ্ডলা হাত সরিয়ে নিল। কাট্। ক্লোজ আপ, ব্যালানস্ হারিয়ে ননীগোপাল টাল খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। মিড্ এবং লং শট্, গড়াতে গড়াতে ননীগোপাল পর্বতের সানুদেশে কুয়াশার অন্ধকারে তলিয়ে গেল। বাঘের গর্জন শোনা গেল। কাট্।"

ব্রজদা থামলেন। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেলেন। তারপর বললেন, "নে বল কেমন লাগল?"

যদুদা বললেন, "সবই বুঝলাম, কিন্তু এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থানটা যে কোথায় সেইটেই বুঝলাম না।"

ব্রজদা জবাব দিলেন, "বঙ্কিমের স্থান তাঁর নভেলে, আর আমার টাইটেলে। এটা বুঝতে কি খুব অসুবিধে হল? নিউ ওয়েভে আমরা রাইটারদের এর বেশি প্রশ্রয় দিইনে। বুঝলি।"

সুনীত কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুনীল বলে উঠল, "ভাগ্যিস্ ছবিটা করেননি। একে এই রকম ঘটনা, তার উপর নবকুমার হয়েছে ননীগোপাল। এ ছবি আত্মপ্রকাশ করলে যদুদারা আর আপনাকে আস্ত রাখত না। গালিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিত।"

"দ্যাখ সুনীল", ব্রজদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে অবজ্ঞা ঢেলে বলতে লাগলেন, "ব্রজরাজ কারফর্মার মতো পরিচালক এই যদো-মাধোর দিকে তাকিয়ে ছবি করে না। তার চোখ দেশ-কালের গণ্ডির বাইরে বাঁধা। কান, ভেনিস, বার্লিন যতদিন আছে, ততদিন তোদের ব্রজদার কদরও আছে। বেঁচে থাক আমার কান ফেসটিভ্যাল। কান টানলে মাথাও আসবে, এই বিশ্বাসটা আছে বলেই তো ছবি করতে নেমেছি।

"ফিলিমের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এমন লোক এদেশে ক'টা আছে, বল দিকিনি। ওই তো যে-ক'টা কফি হাউসে বসে, তারা ছাড়া আর সবাই তো কমারশিয়ালের খদ্দের।

"ফিলিমের প্রকৃত দর্শক যারা তাদের কেউ-ই বাংলা নভেল নিয়ে মাথা ঘামায় না। পড়েই না। ওই বাপ-ঠাকুরদা যা পড়ে রেখে গিয়েছিল তাই ভাঙিয়েই খাচ্ছে। তাদের কাছে যাহা নবকুমার তাহা ননীগোপাল। আমার চিত্রনাট্যে ননীগোপাল যদি উপন্যাসের নবকুমারই থাকত তাহলে কি আর

এদের কাছে মুখ দেখাতে পারতাম ভেবেছিস।"

—"কেন?"

—"ওরে গাড়ল, ওরা যে আমাকে সেকেলে পরিচালকদের গাদায় ফেলে দিত। ইংরেজি কাগজে চট্ করে দুখানা চিঠি ছাপিয়ে দিলেই দফা গয়া।"

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, "বাজে কথা থাক। এখন বল, টাইটেলে ইমেজ সৃষ্টিটা কেমন লাগল?"

"কি জানি দাদা," সুনীল বলে বসল, "কিছুই তো বোধগম্য হল না। আপনি যা বললেন তার মোদ্দা কথা তো দেখলাম পর্দাটা একবার কালো হচ্ছে আর একবার সাদা হচ্ছে। এর মধ্যে যে কী ইমেজ আছে খোদাই মালুম।"

এতক্ষণে সুনীত বলল, "কেন, এ তো বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল।"

সুনীল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু বুঝলেনটা কী।"

"কেন, কালো সাদা, সাদা কালো—"

বিশু বলল, "এ মাইরি নির্ঘাৎ সিগারেটের বিজ্ঞাপন।"

সুনীত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "সেটা আবার কিসে পেলেন?"

পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে সুনীতের সামনে নাচাতে নাচাতে বিশু বললে, "আপনার কথায় আর এই প্যাকেটের লেবেলে।"

"দেখুন, বিশুবাবু, এ আপনার ক্যামেরার শাটার টেপা নয়", সুনীত যথেষ্ট সিরিয়াস হয়ে বলল, "ব্রজদা সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে বসেননি, উনি ওই পাঁচ কি দশ মিনিটের টাইটেলে জীবনের মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। এক মুহূর্তে তিনি আমাদের অতলস্পর্শী গহ্বরে নিক্ষেপ করে পর মুহূর্তেই উৎক্ষিপ্ত করেছেন আকাশচুম্বি উচ্চতায়। পরিশেষে এমন এক প্রশান্তির সমতটে স্নেহময় নিবিড়তায় আলতোভাবে নামিয়ে রেখে গিয়েছেন, যেখানে মন সমস্ত সংগ্রাম শেষে আপনা থেকেই মিশ্র রামকেলির উদাসী হাওয়ার সঙ্গে গেয়ে উঠতে পারে—তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। ব্রজদার এই চিত্রকল্প যেমন দৃষ্টিমোহন, সেগুলি তেমনি শ্রুতিসহন। কত জটিল আবার কত সহজ। অপূর্ব!"

সুনীতের মুখমণ্ডল অকস্মাৎ জ্যোতির্ময় উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দেখে সুনীল কিছুক্ষণের জন্য বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলল।

একটু পরে ব্রজদা উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে নিতু, বউমার সঙ্গে রিলেশানটা ভাল যাচ্ছে তো?"

অপ্রস্তুত সুনীত বলল, "না, হ্যাঁ, কেন বলুন তো!"

"না, এমনি আমার যেন কেমন মনে হল। অকারণে তো বিবাহিত লোকের মুখ দিয়ে এই ধরনের সংলাপ বের হবার কথা নয়।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুনীত একটু লাজুক লাজুক ভাব ফুটিয়ে

বলল, "না, ওসব কিছু নয়। আমি সিনে সোসাইটির মেম্বর হয়েছি কি না, তাই।"

ব্রজদা ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তাই বল। উঃ কি ঘাবড়েই না দিয়েছিলি।"

সুনীত প্রশ্রয় পেয়ে বলল, "আধুনিক সিনেমা সম্পর্কে আমার যা-কিছু জ্ঞান, তা এই সোসাইটির দৌলতে। এই ক'দিনেই আমার চোখ খুলে গিয়েছে। আগে বোকার মতন শুধু সিনেমাই দেখতাম, সিনে সোসাইটির মেম্বর হওয়া ইস্তক—"

সুনীল ফোড়ন কাটল, "যাত্রা থিয়েটারও দেখছেন বোধ হয়।"

"না।" সুনীত গরম হয়ে বলল, "এখন শুধু ইমেজ দেখি। আর ইমেজ যদি দেখতে হয় তো বাইরের ছবির।"

বিশু টক খাওয়ার শব্দ করে বলে উঠল, "আহ! যা বলেছিস মাইরি। একেবারে মার মার কাট্ কাট্। খান কয়েক দেখেছিলাম বটে এবারের ফেসটিভ্যালে। টিকিট যোগাড় করতে অবিশ্যি আমরক্ত বেরিয়ে গেছল। কিন্তু পরিশ্রম সার্থক। কী রগরগে মাল সব মাইরি, বিলিতি চীজ্ তো! যেমন মুখ, তেমনি তার ইয়ে, আর কি বলে, তেমনি ঠ্যাং। হ্যাঁরে, তোদের সোসাইটি যে-সব ইমেজ দেখায়, সেগুলো কি ফেসটিভ্যালের মত আন্সেন্সারড্? দু-একখানা দেখা না মাইরি?"

সুনীত বিশুর হঠাৎ এত উৎসাহ দেখে একটু অবাক হল। জিজ্ঞাসা করল, "কী দেখতে চাইলেন?"

"বাইরের ছবিতে তুই আজকাল যা দেখতে ভালবাসিস, যা দেখিস বললি, তাই। কিন্তু বেশ সরেস মাল হওয়া চাই। ইতালিয়ান ছবি হলেই ভাল। ওদের বেড্-রুমের ইমেজগুলো বেশ ফরোয়ারড্। পোশাক-আশাকের ঝামেলা নেই। দেখলেই মনে হয়, ওদেশের ছবিগুলো সব গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে তোলা।"

এতক্ষণে সুনীতের ঘটে বুদ্ধি এল। বিশুর কথার মানেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা রাঙা আর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম হয়ে উঠল।

"বুঝলাম। অবিশ্যি আপনাদের যা রুচিবোধ তাতে সেক্স্ ছাড়া আর কতদূরই বা আপনাদের চিন্তা উঠতে পারে। কিন্তু আপনি যা মীন করছেন, ইমেজের মানে তা নয়।"

খোঁচা খেয়ে বিশু বলল, "তবে কি গীতাভাষ্য!"

"না, তাও নয়।"

"তবে তুই-ই আমাকে বুঝিয়ে দে, ইমেজ্ বলতে কি বোঝায়?"

সুনীত এবার বিজ্ঞতার হাসি ঠোঁটে মেখে প্রোফেসারি স্টাইলে বলল,

"ইমেজ্, বিবসনা নায়িকা নয়, ইমেজ্ হচ্ছে চিত্রকল্প।"

এবার সুনীল বলে উঠল, "চিত্রকল্প মানে কি?"

"তাও জানেন না", সুনীত খোঁচা মেরে বলে উঠল, "চিত্রকল্প মানে—" এবার নিজেই হোঁচট খেল। "চিত্রকল্প মানে—মানে—মানে সিনেমার ইমেজ্ অর্থাৎ (সুনীত বুঝল সে ক্রমেই গভীর জলে গিয়ে পড়ছে) অর্থাৎ ছবি দিয়ে, মানে (তার কপালে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম ফুটে উঠল) ছোট ছোট দৃশ্য সাজিয়ে (সুনীত ক্রমশ খাবি খেতে লাগল) এক একটা চিত্রকল্প গড়ে তোলা, (সুনীতের গলার আওয়াজ ক্রমশ মিনমিনে হয়ে উঠতে লাগল) মানে ইমেজ্ সৃষ্টি করা আর কি (সুনীত অসহায়ের মত দেখতে পেল কয়েক জোড়া তীব্র দৃষ্টি তার মুখের উপর বিঁধে রয়েছে।) মানে ফেলিনি, কুরুসওয়া, আন্তোনিয়নি, বেয়ারিম্যান রেনে, ত্রুফো এঁরা ছবিতে যে জিনিস ব্যবহার করেন (সুনীত হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠল) মানে জিনিসটা যেমন হাইলি টেকনিক্যাল তেমনি দারুন ইনটেলেকচুয়াল—"

"আপনি তো সত্যজিতের নাম করলেন না? তাকে কি—"

সুনীলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুনীত বলল, "ইচ্ছে করেই করিনি। যেদিন থেকে দেখলাম, ওঁর ছবি বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেদিন থেকেই ওঁর উপর আমার ভক্তি চটে গিয়েছে। হ্যাঁ, ইমেজ্ উপলব্ধির জিনিস; ও ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না।"

সুনীত বিপন্ন হয়ে ব্রজদার মুখপানে চাইল। ব্রজদা গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "বুঝেছি।"

"বুঝেছেন!" সুনীত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যাক বাঁচা গেল। বলুন তো ব্রজদা, একি এককথায় বোঝানো যায়?"

ব্রজদা বললেন, "কেন যাবে না, বুঝতে পারলেই বোঝানো যায়।"

"যায়? যাক বাবা, বাঁচলাম", সুনীতের আত্মপ্রত্যয় আবার গুটি গুটি ফিরে এল। সোৎসাহে বলে উঠল, "দিন তো ব্রজদা ওদের বুঝিয়ে।"

"এক কথায় ইমেজ্ হচ্ছে প্রকাণ্ড একটি অশ্বডিম্ব।" একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করে ব্রজদা মুখ বুজে ফেললেন। সমগ্র ঘরে ঝপ করে স্তব্ধতার একটি নিরেট পর্দা পড়ল।

সুনীত সেই থেকেই আর মুখ খোলেনি। কিছুক্ষণ পরে ব্রজদাই মৌন ভঙ্গ করলেন।

বললেন, "ইমেজ্-ফিমেজ্ নয় বাবা, মীথ্। মীথ্ অর্থাৎ পরিচালক সম্পর্কে চিত্র-সমালোচকদের মনে সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টির জন্য কল্পকথার একটা

বিচিত্র বলয় তৈরি করাটাই হচ্ছে সিনেমার নব্যরীতির মোদ্দা কথা। মানে চিত্রকল্প। এমন একটা দুর্ভেদ্য দুর্বোধ্য দুর্গের মধ্যে পরিচালককে শালগ্রাম শিলার মতো প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সিনেমা সমালোচকদের রীতিমত ভড়কি খাইয়ে দেবে। কড়া সূর্যের দিকে তাকালেই যেমন চোখে কালো কালো সরষে দানার মত ফুট্‌কি ফুটে উঠতে থাকে, তেমনি এমন একটা ইনটেলেকচুয়াল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে, যাতে নব্যরীতির চিত্র-পরিচালকের দিকে চাইবা মাত্র সমালোচকরা চোখে দিবারাত্র যেন প্রতীকের সরষে ফুল দেখতে থাকেন। এ সব হচ্ছে এই ব্রজরাজ কারফর্মার টেক্‌নিক। এই টেকনিক প্রয়োগ করছি বলেই আজ, দ্যাখ, তোদের ব্রজদার সাদা আর কালো দিয়ে ফোটানো ং ঃ ঁ-র টাইটেল দেখে আমাদের নিতু কত দৃষ্টিনন্দন ইমেজের সন্ধান পেয়েছে, এমন কি ং ঃ ঁ-র কেন্দ্রবিন্দুতে যে এক সুগভীর দর্শনতত্ত্ব নিহিত আছে, সেটা অবধি টেনে হিঁচড়ে বের করেছে। নিতুর এই সেবাপরায়ণ সমালোচকের দৃষ্টিই নব্যরীতির শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষে মোক্ষম সালসা। নিতুরা আছে তাই ব্রজদারাও আছে।"

একটু থেমে ব্রজদা বললেন, "আসলে নিতুদের ভরসাতেই এই ছবিটাতে, এই ং ঃ ঁ-তে হাত দিয়েছি। এখন শুধু আউট-লাইনটাই শোন। পাঁচদিনের ক্যাজুয়াল লীভ্‌ নিয়ে ঘোলসাপুর যাব। তখন ডিটেল্‌স্‌ স্ক্রিপ্‌ট্‌টা করে আনব।"

ব্রজদা একটু দম নেবার জন্য থামতেই বিশু জিজ্ঞাসা করল, "স্টোরিটা কার?"

"স্বয়ং ব্রজরাজ কারফর্মার। প্রভুর কৃপায় পাওয়া। দ্যাখ, বাংলা দেশটা অদ্ভুত জায়গা। পুরনো জিনিসকে আঁকড়ে ধরেই এরা বাঁচতে চায়। নতুন আলোয় কিছু দেখতে চায় না, নতুন ঢেউ-এ ভাসতেও চায় না। যখনই আমি বঙ্কিম, শরৎ কি রবীন্দ্রনাথকে ইমপ্রুভ্‌ করতে গিয়েছি, অমনি হইহই রইরই কাণ্ড। তিতবিরক্ত হয়ে নাক কান মলে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর না বাবা। ব্রজরাজ কারফর্মা তোমাদের আর কড়ে আঙুল দিয়েও ছোঁবে না। এতে ব্রজের কানাকড়িও ক্ষতি নেই, সে যে জিনিয়াস সেই জিনিয়াসই থাকবে। মরতে মরলেন বঙ্কিম, শরৎ, রবি ঠাকুর। আমার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে গোটা কতক ভদ্রলোকের পাতে পড়তে পারতেন, এখন সেটা গেল বন্ধ হয়ে।

"এবার থেকে ঠিক করেছি নিজের গল্পেই নব্য তরঙ্গে ভাসব। কি বলিস।"

ব্রজদা থামতেই সুনীত সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "তা ভাল। নিজের পাঁঠা আপনি যেভাবেই কাটুন কারোর কিছু বলার থাকবে না।"

ব্রজদা কটমট করে চাইতেই সুনীত বুঝল, উপমাটা দেওয়া ঠিক হয়নি।

লজ্জায় মুখ নোয়াল।

ব্রজদা বেশ করে গলা ঝেড়ে শুরু করলেন, "ং ঃ ঁ-র হিরো হচ্ছে উদ্বাস্তু। স্মাগলার। হিরোয়িনও উদ্বাস্তু। ক্যাম্পের বাসিন্দা ছিল। এখন নার্স। দেশ বিভাগ দিয়েই শুরু করেছি। তাতে টপিক্যালিটি পুরো বজায় থাকল। ও ব্যাপারে আর কাউকে ট্যাঁ-ফোঁ করতে হবে না।"

ব্রজদা গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। বললেন, "ভাবছি ছবিটা এইভাবে শুরু করব। ফাঁকা একটা জুনিয়ার ইশকুলের ক্লাসঘর। স্ট্যানডের উপর মস্ত একটা ব্ল্যাকবোর্ড্। টেবিলের উপর একটা ডাস্টার আর একটা পেনসিল-চক পড়ে আছে। একটা গলায়-বকলস-দেওয়া বাঁদর এক লাফে ঘরে ঢুকল। এক লাফে একটা বেন্চির উপর উঠল, আরেক লাফে টেবিলের উপর। ডাস্টারটা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। ছুঁড়ে ফেলে দিল। চক্টা হাতে এক লাফে চেয়ারের উপর গিয়ে বসল। তারপর চক্ দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা এলোমেলো দাগ কেটে ক্যামেরার দিকে চেয়ে হুকুহুকু ডাক ছেড়ে পরম উল্লাসে হাসতে লাগল। নেক্স্ট শটেই দেখান হবে একই গ্রামের ভিতর দিয়ে সীমান্তরেখা চলে গিয়েছে। সীমান্তের দুই পারে দুটো ইশকুল-বাড়ি। দুই ইশকুলের প্রাঙ্গণেই ছিন্নবেশ ছন্নছাড়া ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর দুটো ব্যানডে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে দুটো ফ্ল্যাগ-স্ট্যানডে দুই দেশের দুই জাতীয় পতাকা ধীরে ধীরে উঠছে।"

সুনীত আর থাকতে পারল না। উত্তেজিতভাবে বলে ফেলল, "অপূর্ব! গ্রেট্!! অসাধারণ ব্যঞ্জনা!!!"

সুনীলও উদ্বেলিত হয়েছে বোঝা গেল। মুক্তকণ্ঠে বলল, "সত্যিই ভাল। কিন্তু ব্রজদা, ওই যে বাঁদর, ওটা কেন? ওটা কী?"

ব্রজদা সহজভাবে বললেন, "ওটা প্রতীকী র‍্যাডক্লিফ্। যার খামখেয়ালি রোয়েদাদে দেশটা এমন জগাখিচুড়িভাবে ভাগ হয়েছে। ওই বাঁদরটাকে ইনট্রো-ডিউস্ করে হিসটোরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনটা দুম করে কেমন এস্টাবলিশ করে দিলাম। আবার অন্য দিকে বাঙালীরা যে ওদের কি চোখে দেখে, সেই সেনটিমেন্টটাও জানান হয়ে গেল। এটাকে জাতীয়তাবাদী ছবিও বলতে পারিস। উদ্বোধন রজনীতে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে ছবি তোলালে প্রমোদ-করটা মকুব করানো যাবে।"

সুনীত গদ্গদ হয়ে বললে, "সাব্বাস। একেই বলে সিনেমার ভাষা।"

বিশু বলল, "জবাব নেই।"

ব্রজদা বললেন, "তাহলে লাগবে বলছিস।"

সুনীল সোৎসাহে বলে উঠল, "হিট্। হিট্।"

বিশু : শুধু হিট্ নয়। ফিলিম লাইনের সব্বাইকে টাইট্ করেও

ছাড়বে। তারপর ?

ব্রজদা একটা সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ ধরে ক্রমাগত ধোঁয়া খেয়ে চললেন।

বললেন, "তারপর ধীরে ধীরে স্টোরি এগোতে থাকবে। নায়ক একদিকে চোরাকারবারি, অন্যদিকে বিশে ডাকাত বা রবিন হুড্। খালি দুই দেশের অসৎ ধনীদের জক্ দেয় আর সীমান্তের দুই পারের গরীব-দুঃখীদের প্রতিপালন করে। নায়িকা নারীত্বের চরমতম অপমান সহ্য করেও নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সে নার্স। সেবিকার কল্যাণী মূর্তি। এক দুর্যোগের মধ্যে নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটবে। কেউ কাউকে প্রথমে ভালবাসবে না। ছাড়াছাড়ি হবে। কিন্তু ভুলবে না। নায়ক দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। হঠাৎ শত্রুপক্ষের স্মাগ্ল্ড্ গুড্সের মধ্যে সে আবিষ্কার করবে এমন একটা দলিল, একেবারে টপ্ সিক্রেট, যার উপর তার দেশের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। দলিলটি নিয়ে শত্রু সেনানীর ছদ্মবেশে সে সেই দেশের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে কলকাতায় চলে আসবে দলিলটা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে। চৌরঙ্গিতে স্টেটবাস চাপা পড়ে মর-মর অবস্থায় মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি ওয়ারডে ভর্তি হবে। নায়িকা তাকে দেখেই চিনতে পারবে। নায়কের ভুল বকার অর্থ উদ্ধার করে সে সব বৃত্তান্ত জানতে পারবে। সকলের অলক্ষ্যে নায়িকা নায়কের দেহের গুপ্তস্থান থেকে সিক্রেট দলিলটা বের করে নিজের দেহের সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখবে। দেশপ্রেমিক সার্জেন নায়ককে অপারেশন করে বাঁচাতে গিয়ে ভুল করে টের পাবে, সে শত্রু-দেশের মিলিটারি অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে নায়ককে নজরবন্দী করে রাখা হবে। নায়ক একটু ভালো হতেই কেল্লায় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সামরিক বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ খবরের কাগজের বড় বড় হেডলাইনের মারফত ঘোষণা করা হবে। নায়িকা উপায়ান্তর না দেখে দিল্লি গিয়ে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের হাতে দলিলখানা তুলে দিয়ে তাঁকে নায়কের নির্দোষিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় করে যখন অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়বে, ততক্ষণে কলকাতার কেল্লায় নায়ককে বধ্যভূমে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।"

ব্রজদা থামতেই সুনীল আঁকুপাকু করে বলে উঠল, "তারপর ?"

ব্রজদা গম্ভীরভাবে বললেন, "ইনটারভ্যাল।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ইনটারভ্যাল শেষ হবার আশায় সবাই ব্রজদার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। ব্রজদা জল খেলেন, সিগারেট একটা শেষ করে আরেকটা ধরালেন।

সুনীত উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে উসখুস করে বলে উঠল, "তারপর ?"

ব্রজদা ধমক মারলেন, "দাঁড়া, আগে বিজ্ঞাপন দেখানো শেষ হোক।"

দ্বিতীয় সিগারেটে সুখটান মেরে ব্রজদা বললেন, "পরবর্তী আকর্ষণের ট্রেলার শেষ হতেই দেখা যাবে দিল্লি এবং কলকাতায় যুগপৎ তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। এক দিকের টেমপো তীব্র, অন্য দিকে মন্থর। দিল্লিতে স্পীড্, কলকাতার মুভমেন্ট্ স্লো। দিল্লিতে গতি, কলকাতায় স্থিতি। কলকাতা দিয়েই শুরু। দেখা যাবে, মোটা মোটা গরাদ দেওয়া কেল্লার কয়েদখানায় নায়ক শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার গায়ে কয়েদীর পোশাক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ছোট ছোট ফ্ল্যাশব্যাকে নায়কের বাল্য ও কৈশোরের নানা সুখ-স্মৃতি ভেসে ভেসে উঠছে। তার ফাঁকে ফাঁকে কেল্লার সেপাইরা রাইফেল পরিষ্কার করছে। গার্ড কয়েদখানার সামনে পায়চারি করছে। ওদিকে দিল্লি। নায়কের প্রাণদণ্ড মকুবের আদেশ রেডিও মারফত কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা চলছে। ফেলিওর। কোথায় আণবিক বিস্ফোরণ হয়েছে। ফলে রেডিও-তরঙ্গে বিশৃঙ্খলা। মেসেজ পাঠানো গেল না। কলকাতায় দশজন সশস্ত্র সিপাই ক্রূর-পদক্ষেপে মার্চ করে কয়েদখানার সামনে গিয়ে পৌঁছাল। শান্ত্রী তালা খোলার উদ্যোগ করছে। দিল্লি থেকে টেলিফোন মারফত কলকাতায় নির্দেশ পাঠাবার চেষ্টা চলেছে এমারজেন্সি চ্যানেলে। ডাক ও তার বিভাগের পঞ্চবার্ষিকী দক্ষতায় টেলিফোন লাইন আসানসোল টু ক্যালকাটা আউট অব্ অরডার। কলকাতায় নায়ককে কয়েদখানা থেকে বের করে চোখ বেঁধে দেওয়া হল। দিল্লিতে উপায়ান্তর না দেখে সিকরেট সারভিসের টপ অফিসার রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা আর হিরোয়িনের জ্ঞানহীন দেহ পাঁজাকোলা করে মোটরে চাপলেন। কলকাতায় নায়ককে সশস্ত্র সেপাইদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। দিল্লির অফিসার বিমানঘাটিতে উপস্থিত হলেন। শুনলেন, ওয়েদার খুব খারাপ, বিমান সারভিস ক্যান্সেল।

কলকাতায় নায়ককে মাঝখানে রেখে সামনের ও পিছনের সিপাইরা করিডর দিয়ে বধ্যভূমির দিকে স্লো মার্চ করে চলেছে। ওদিকে গ্র্যানড্ ট্রাংক রোড। অফিসার তীব্রবেগে গাড়ি চালাচ্ছেন। মুখে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। পিছনের সীটে এলায়িত নায়িকা। গাড়ির স্পীডোমিটার আশি, পঁচাশি, নব্বুই মাইলে উঠল। একটা শহর ঝড়ের গতিতে পার হয়ে গেল। নায়িকার ক্ষীণ কণ্ঠ : কতদূরে এসেছি? অফিসারের কণ্ঠ : এইমাত্র আলিগড় পার হলাম। নায়িকা : শেষরক্ষা করতে পারব তো? অফিসার : করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

কলকাতায় কেল্লার করিডর দিয়ে স্লো মার্চ চলেছে।

অফিসারের গাড়ি ছুটে চলেছে গ্র্যানড্ ট্রাংক রোড ধরে। স্পীডোমিটারের



অফিসার বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন

কাঁটা একশ', একশ' পাঁচ, একশ' দশ-এর ঘরে টাচ্ করল।

সুনীল জিজ্ঞাসা করল, "কোথাকার গাড়ি? এত স্পীডে চলছে!"

ব্রজদা বললেন, "স্টুডিওর। ওটা ইন্‌ডোরে টেক্ করতে হবে। হ্যাঁ, শোন, তারপর নায়িকা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় এলাম। অফিসার : সামনে কানপুর। নায়ককে নিয়ে সেপাইরা স্লো মার্চ করে এতক্ষণে কেল্লার কয়েদখানার করিডর থেকে কমপাউনডে নেমে পড়ল। গ্র্যানড ট্রাংক রোডে অফিসারের গাড়ির স্পীডোমিটার একশ' তিরিশের ঘরে। চাকা আর মাটিতে নেই। নায়িকা : আমরা তো এলাহাবাদ ছাড়ালাম, না? অফিসার "হ্যাঁ" বলেই চীৎকার করলেন, হুঁশিয়ার। তার পরেই জোরে ব্রেক কষলেন। গাড়ি ঘুরে গিয়ে থেমে পড়ল। একখানা চাকা খুলে মাঠে গিয়ে পুকুরের জলে তলিয়ে গেল। কিছু বুড়-বুড়ি। অফিসার স্টেপ্‌নি খুলেই দেখেন স্যাবোতাজ। কে হাওয়া খুলে দিয়েছে। নায়িকা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বলল, এখন উপায়? অফিসার হঠাৎ বলে উঠলেন, "আছে।" তিনি দৌড়ে গিয়ে মাঠে নামলেন। একটা ঘোড়া চরছিল। সেটাকে ধরে এনে নায়িকাকে বললেন, নিন, উঠুন, আর দেরি নয়। এখনও অনেকটা পথ। নায়িকা : আমি যে কখনও ঘোড়ায় চড়িনি। অফিসার বললেন, আমিই কি চড়েছি নাকি? স্কুটারে চড়েছেন তো? নায়িকা : হ্যাঁ। অফিসার : তবে তেমনিভাবেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসুন। নায়িকা : পিছনে বসতে পারব না। অফিসার : তবে সামনেই থাকুন। নায়িকা : আমি কিন্তু আপনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসব। অফিসার : যা ইচ্ছে করুন। আর সময় নেই। তারপর দুজনে ঘোড়ায় চাপলে অফিসার বাতাসের বেগে তাকে ছুটিয়ে দিলেন। নায়িকা : আপনি কি বিবাহিত? অফিসার : না, কেন বলুন তো? নায়িকা অমনি দু'হাতে অফিসারের গলা জড়িয়ে বসে থাকল।"

সুনীত দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "বীচ্।"

সুনীল চটে গেল, "খামখা গাল দিচ্ছেন কেন?"

সুনীত : বলি কি সাধে। সোয়ামি ওদিকে গুলি খেয়ে মরতে বসেছে, আর উনি এদিকে রাসলীলা শুরু করলেন।

সুনীল : ও যে স্বামী, তা কে বলল?

সুনীত : এখনও না-হয় হয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হবে তো।

বিশু বলল, "অবিশ্যি যদি বেঁচে থাকে। তবে চান্‌স্ কম।"

সুনীল বলল, "কেন?"

বিশু বলল, "এতদিন ধরে দিল্লিতে আছিস। তবু তোর কোনও আইডিয়া হল না। এলাহাবাদের কাছ থেকে ঘোড়ায় করে সর্‌ট্ টাইমে কলকাতায় কোনকালে পৌঁছানো যায়!"

"ঘোড়ায় করে কলকাতায় পৌঁছুবে কে বললে?" ব্রজদা বললেন,

"অতিরিক্ত পরিশ্রমে কিছুদূর এসেই ঘোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। ততক্ষণে নায়ককে বধ্যভূমিতে দাঁড় করিয়ে দশটা সেপাই রাইফেল তাক করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে। নায়িকারা তো ঘোড়াটা মরে যাবার পর উপায়ান্তর না দেখে গোরুর গাড়ি চেপেই কলকাতামুখো রওনা দেবে।"

বিশু তার লম্বা হাতখানা সুনীলের মুখের সামনে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠল, "নাও, এবার হল তো।"

সুনীত আর্তনাদ করে বলে উঠল, "ব্রজদা, তবে কি হিরোটা মরে যাবে?"

ব্রজদা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ঘাবড়াসনি, তোদের ব্রজদা থাকতে কোন্ ইয়ে হিরোকে মারে।"

বিশু বলল, "কিন্তু আমি তো কোনও চান্স্ দেখছিনে। যেখানে সেপাইরা হাঁটু গেড়ে বসে গিয়েছে, সেখানে আর চান্স্ কোথায় তা তো বুঝিনে। সিগন্যাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে সট্ সট্ সট্—ব্যস্ খতম। হিরোয়িনকে যেখানে গোরুর গাড়িতে তুললেন, সেখান থেকে জেটে চড়ালেও পৌঁছতে পারবে না। ভগবানও আর বাঁচাতে পারবে না। এই টাইম-গ্যাপ মেকআপ হবে কি করে?"

ব্রজদা চটে গেলেন। বললেন, "বেশী চালাকি করিসনি। গোটা কয়েক জাম্প্ কাটেই ওই গোরুর গাড়িকে এলাহাবাদ থেকে চোখের পলক না ফেলতেই একেবারে কলকাতায় এনে কেল্লার দরজায় ভিড়িয়ে দেব।"

বিশু বললে, "ততক্ষণ কি সেপাইরা চুপ করে বসে থাকবে, কেল্লার দরজা থেকে বধ্যভূমি পর্যন্ত নায়িকারা যাবার আগেই হিরোকে খতম করে দেবে। তখন?"

ব্রজদা বললেন, "সেটা কি আর ভাবিনি ভেবেছিস। এদিকে যেমন জাম্প্ কাট ঝেড়েছি, ওদিকে তেমনি ফ্রীজ্ ছাড়ব। একেবারে ডীপ্ ফ্রীজ্। পর্দার সেপাইরা তো কোন্ ছার, হাউসের দর্শকরা অবধি সেই ফ্রীজের গুঁতোয় জমে বরফ হয়ে যাবে। একেবারে নট্ নড়ন চড়ন, নট্ কিচ্ছু। যে-সে ফ্রীজ্ নয় বুঝলি। এ বাবা ব্রজফ্রীজ। এই 'ব্রজফ্রীজ'ই সিনেমা টেকনিকে তোদের ব্রজদার সব থেকে বড় অবদান। বেশি ট্যাঁ-ফো করিসনি।"

শেষ গল্প

জুজুৎসু জানা না থাকলে, খবরদার, গণ্ডার ধরতে যাসনি। রিক্স্ আছে।

কথাটা বলেই ব্রজদা সুনীতের দিকে চাইলেন।

সুনীল বলল, ভাল লোককেই কথাটা বললেন বটে ব্রজদা। সুনীতবাবু নিজে হাতে কখনও একটা ছারপোকা ধরেছেন কিনা জিজ্ঞেস করুন তো।

ছারপোকা! সুনীত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বাঃ, কি যে বলেন, ছারপোকা ধরা কী এমন শক্ত!

শক্ত বৈকি? জুজুৎসু জানলে গণ্ডার কাবু করা যায়, কিন্তু জুজুৎসুতে ছারপোকা ঘায়েল করা যায় না। এ আমার নিজের চোখে দেখা কি না। আমার যিনি ওস্তাদ—জাপানের চ্যাম্পিয়ন জুজুৎসু বীর

(ব্রজদা থামলেন। চোখ বুঁজে আলতোভাবে নিজের নাক কান মলে গুরুকে স্মরণ করে নিলেন।)

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা একবার কলকাতায় এসেছিলেন জুজুৎসুর খেলা দেখাতে। বড়লাটের আমন্ত্রণে। আমি তখন পটলডাঙ্গার মেস্-ডি-শান্তিনিকেতনে একখানা সিঙ্গল সীটেড্ রুমে থাকি। ওস্তাদের ইচ্ছে আমার কাছেই ক'দিন থাকেন। কি আর করি, গেস্ট রুম থেকে একখানা ভালো দেখে তক্তপোশ এনে আমার পাশেই পেতে দিলুম। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক চীৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দেখি অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা হুটো-পাটি চলেছে। ব্যাপারটা কি? তাড়াতাড়ি লাইট জেলে দিলাম। ততক্ষণে মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা গোটা কয়েক জুজুৎসুর গুঁতো ঝেড়ে তক্তপোশটার বারটা বাজিয়ে দিয়েছেন।

একটু অবাক হয়েই বললাম, ব্যাপার কি?

মিঃ গুরুমারা গুঁতোগাতা বললেন, শতো শতো সূচিখোঁচা দাগা।

ওস্তাদ জাপানী হলেও একটু বাঙ্গাল কছমের জাপানী। কিয়োটোর কুট্টি কিনা। তাই মানেটা বুঝতে একটু দেরী হল। সমঝে নিয়ে একটু হেসে বললাম, ওস্তাদ, ভয় পেয়ো না, ওগুলো সূঁচের খোঁচা নয়। এদেশে এক রকম খুদে খুদে ডোমেস্টিক জানোয়ার আছে। আমরা বলি, ছারপোকা।

হার্মলেস্। শুয়ে পড়ো।

ওস্তাদ আমার কথায় বিশেষ ভরসা পেলেন না। আলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে সারা গা দেখতে লাগলেন।

আর বলতে লাগলেন, গাটাগোটা ফুটো।

তা মিছে বলেননি, বুঝলি। আমিও দেখলাম ছারপোকার কামড়ে ওস্তাদের গোটা গাটাই প্রায় ফুটো হয়ে গেছে।

ব্রজদা দম নেবার জন্য একটু থামতেই সুনীত বলে উঠল, বাঃ, জাপানী ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার তো বেশ একটা মিল আছে!

ব্রজদা বললেন, হবে না কেন, ওরিয়েণ্টাল কাণ্ট্রি যে। আমরাও প্রাচ্য, জাপানীরাও প্রাচ্য। অরিজিন তো সেই বেদ। ইংরেজ এসেই না ভেদটা সৃষ্টি করে দিলে। নইলে আদিতে শ্যাম, কম্বোজ, বোরোবুদুর, যবদ্বীপ, বালি, সিংহল, জাপান, ইস্তক আমেরিকা, এ-সবই তো বৃহত্তর বঙ্গের অংশ ছিল। আমাদের ছিল। বাংলার সমৃদ্ধি, বাংলার সংস্কৃতি এককালে কোন তুঙ্গে উঠেছিল একবার চেয়ে দ্যাখ। আর সেই বাংলার আজ কি দুরবস্থা। এখন যে চান্স পাচ্ছে, সেই একখানা লাথি ঝেড়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রজদা ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, ডিফেক্টটা কি হয়েছে জানিস, পেঁচক আর তেমন করে ডাকছে না।

পেঁচক! মানে?

পেঁচা। বাংলা কি ভুলে গেলি? আউল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, পেঁচা ডাকছে না, তা হয়েছে কি?

যা হবার তাই হচ্ছে। আবার কি হবে!

ব্রজদা চটে উঠলেন।

বললেন, প্রহরে প্রহরে পেঁচক "বাঙ্গালী জাগো" বলে আর ডেকে উঠছে না। কাজেই বাঙ্গালী ঘুমুচ্ছে। একেই বাঙ্গালীর ছেলের একটু লেটে ওঠা অভ্যেস, তার উপর জাগানেওলা নেই। আসল গুবলেট তো সেইখানেই। বুঝলিনে। নইলে জাগ্রত বাঙ্গালীর গায়ে হাত তুলবে এমন সাহস ভূভারতের কোন ব্রাদারের আছে!

যাকগে যাক, যা বলছিলাম তাই বলি।

ব্রজদা প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

সারারাত ধরে মিঃ গুরুমারা ছারপোকা মারার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, দেখলাম বটে, জাপানী অধ্যবসায় কাকে বলে! এক একখানা করে কাঠ তক্তপোশ থেকে তিনি খুলে ফেললেন। কিন্তু কোথায় ছারপোকা! একটারও টিকি দেখা গেল না। আবার একটু একটু করে তক্তপোশটি জুড়ে আলো নিভিয়ে যাঁহাতক শোয়া অমনি "শতো শতো সূচিখোঁচা" ওস্তাদকে আবার

দাগা দিলে। সারারাত এইভাবে লড়াই চলল। তোষক বালিশ ছিঁড়ে, তক্তপোশের কাঠগুলো ভেঙে, ঘরটাকে লণ্ডভণ্ড করে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওস্তাদ আমার হাওয়া দিলেন। এ দেশ ত্যাগ করেই চলে গেলেন। তাই বলছিলাম, বাঘ, ভালুক, হাতি, হিপো মারার চাইতে ছারপোকা মারা শক্ত। অন্তত আমার কাছে।

সুনীত বলল, আর গণ্ডার? গণ্ডার মারেননি ব্রজদা?

সুনীল দাবড়ে উঠল, কাকে কি কোশ্চেন করতে হয় মশাই এখনও পর্যন্ত তাই শিখলেন না। ব্রজদা কি এক-আধটা গণ্ডার মেরেছেন? গণ্ডার হিসেব জিজ্ঞেস করুন।

ব্রজদা সস্নেহে বললেন, চিরটা কাল তোর একই রকম কাটল সুনীল। আজও তোতে পাক ধরল না। সেই ডাঁসাই থেকে গেলি। গণ্ডার কি বাঙালী যে গণ্ডায় গণ্ডায় মারা পড়বে? আর তা ছাড়া এখানে কোথায় তুই গণ্ডায় গণ্ডায় গণ্ডার পাবি যে মারবি? মারা তো দূরস্থান, যে ক'টা বাঙালী গণ্ডার আছে রিজার্ভ ফরেস্টে, সে ক'টা বাঁচিয়ে রাখাই এখন দারুণ সমস্যা।

ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন।

বললেন, মাঝখানে তো আমাদের বনমন্ত্রীর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কি, না গণ্ডারদের ছেলেপুলে হচ্ছে না। কত ডাক্তার কবিরাজ এল। অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, বাইওকেমিক, আয়ুর্বেদী, য়ুনানি, ভেটিরিনারি, কত কি করা হল। কোন ফল হল না। বনমন্ত্রী সাহেব-ডাক্তার আনালেন। বড় বড় সব গাইনোকলজিস্ট। যাদের হাতে পড়লে বাঁজা বউও কার্তিকের মা হয়। কিন্তু ওনারাও এখেনে ফেল মেরে গেলেন। গণ্ডারনীরা লজ্জায় তাদের সামনে বেরুলই না যে। সরকারের এক কাঁড়ি টাকা গজব হয়ে গেল।

তাই নিয়ে এজিটেশন হল। মিটিং প্রশেসন হল। কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা রেট-পেয়ারদের স্বার্থে চারদিন ধরে স্পেশাল মিটিং ডেকে গলাবাজি করে, অবশেষে বিধান সভায় "অবিলম্বে গণ্ডারের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাব" পাঠিয়ে দিলেন। বিধান সভায় লেফটিস্ট গ্রুপ সরকারকে তুলো ধুনে দিলে। লোকসভায় প্রশ্ন উঠল। কম্যুনিস্ট দল বললে, কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতিবাদে গণ্ডারদের এই ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ, ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামী আত্মত্যাগ, গণ্ডার সমাজকে আজ শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে এনে ফেলেছে। বিশ্বের প্রগতিশীল সমাজ আজ দাবী করছে, সরকার হয় এই বিপ্লবী গণ্ডারদের বংশবৃদ্ধি ঘটান, নইলে গদী ছেড়ে দিন। পি-এস-পি বললে, ভারত আক্রমণে উদ্যত চীনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার আজ পর্যন্ত

কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় গণ্ডারদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। তারা ভাবছে, যে-দেশে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কেই অনাস্থা রয়েছে, সে-দেশে আর বাচ্চা পেড়ে কি হবে? গণ্ডারদের এই মনোভাবে সামগ্রিকভাবে নেহরু সরকারের চীন-নীতি এবং বিশেষভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর প্রতি গভীর অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। জনসংঘ এবং হিন্দুমহাসভার মতে এটা অশাস্ত্রীয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে সরকারী প্রচারকার্যের ব্যাড্ এফেক্ট।

লোকসভার মেঝেয় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বিতর্কের প্রথম দিন সবাইকে প্রচণ্ড গালাগাল দিলেন। পি-এস-পি'কে বললেন, মোট্লি ক্রাউড্। কমিউনিস্টদের বললেন, এদেশে ওদের শিকড় নেই, অন্যান্যদের বললেন, কমিউন্যাল। দ্বিতীয় দিন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ এবং মডার্ণ জেনেটিক্সের উপর দেড় ঘণ্টা লেকচার দিলেন। গান্ধিজীর কথা স্মরণ রাখতে বলে সবাইকার কাছে দেশের ইউনিটি বজায় রাখতে আবেদন জানালেন। তৃতীয় দিনে গণ্ডার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, এ বিষয়ে আমাদের নীতি পরিষ্কার। পাকিস্তান, পর্তুগাল, এমন কি চীন সম্পর্কে আমাদের যা পলিসি, গণ্ডারদের সম্পর্কেও তাই। কোয়ার্সন নয়, পারসিকিউশন থ্রুড়ি পারসুয়েশন। বুদ্ধ, অশোক, গান্ধিজীর পন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। গণ্ডারদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আর সে দায়িত্ব কেন্দ্রের নয়, রাজ্য সরকারের। অতঃপর সরকারপক্ষ প্রস্তাব আনলেন, এটা রাজ্য সরকারের জুরিসডিক্শন। স্পীকারের হস্তক্ষেপে বিরোধী দলের প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি নাকচ হয়ে গেল। রাজ্যের বনমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, আমি হলপ করে বলতে পারি, গণ্ডারদের ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য কোন নির্দেশ আমার দপ্তর থেকে দেওয়া হয়নি। গণ্ডারদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এখন গণ্ডাররা যদি তা সত্ত্বেও বংশবৃদ্ধি না করে, তার আমি কি করব? সরকারের যেটুকু করার তা করেছেন। এই খাতে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। আর গণ্ডারের বাচ্চা না হওয়ার জন্য কে দায়ী, গণ্ডার না গণ্ডারনী, সেটা তদন্তের জন্য একটা একস্পার্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এক-সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। বিখ্যাত শিকারী শ্রীব্রজরাজ কারফর্মা হচ্ছেন সেই কমিটির চেয়ারম্যান।

ব্রজদা থামলেন। একটু দম নিলেন।

বললেন, অ্যাইসা রিপোর্ট দিয়েছিলাম না একখানা, কি বলব, একটু ব্যাকিং পেলে ঐতেই নোবেল প্রাইজটা পেয়ে যেতুম। ইতিহাস, ভূগোল, সায়েন্স, হাইজিন, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইস্তক দেহতত্ত্ব, কি না ছিল সেই রিপোর্টে! বিশ্বের জন্ম থেকে লিখতে আরম্ভ করেছিলাম আর মানব জাতির ধ্বংসে দি এণ্ড্। সেই রিপোর্টটার সামারি করেই তো এইচ জি ওয়েলস "আউটলাইন অব্ দি হিস্ট্রী অব্ দি ওয়ার্লড" বইখানা বের করে দিলে।

সুনীত ফস্ করে বলে ফেলল, সে কী, ওটা তো অনেক আগের বই! তখন তো আমাদের স্বাধীন গভর্ণমেণ্টই হয়নি।

ব্রজদা বললেন, ঐটেই তো বৃটিশদের বাহাদুরি। ব্যাটারা যেটা করে, আগে আগে করে। তা সে ট্রকলিফাইং-ই হোক, কি সাম্রাজ্যবিস্তারই হোক। জাতটা বড় হয়েছে কি অমনি অমনি।

সুনীল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তারপর গণ্ডারদের কি হল?

ঝড়াঝ্ঝড় বাচ্চা হল। হবে না! ব্রজদা বললেন, কেমন মোক্ষম জিনিস সুপারিশ করেছিলাম।

সুনীতের ইদানীং এসব বিষয়ে একটু বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। মুখটি একটু নীচু করে জিজ্ঞেস করলে, জিনিসটা কি দাদা?

ব্রজদা বললেন, একটা স্বপ্নাদ্য তাবিজ। প্রসূতির গলায় কালো কার দিয়ে শনি-মঙ্গলবারে ঝুলিয়ে দিলে একেবারে অব্যর্থ ফল। এক পয়সা খরচা নেই, শুধু ঐ তাবিজটার যা কস্ট্। ওনলি পাঁচ সিকে।

তা সেই তাবিজ গণ্ডারনীর গলায় কে ঝোলালে?

ব্রজদা সুনীতের দিকে চেয়ে "ঈশ্বর ওকে ক্ষমা কর" হাসি হাসলেন। বললেন, আমি ছাড়া এ ভারতে রিয়েল জুজুৎসু আর কে জানে?

হলে হবে কি, ব্রজদা হতাশ গলায় বললেন, দেশে তো দিশি গুণীর কদর নেই। এই কাজটা যদি কোন সাহেব এসে করত তো দেখতিস। দেশে তার স্ট্যাচু তোয়ের হয়ে যেত। এই যে, জিম করবেটের নামে তোরা ন্যাশন্যাল পার্ক করে দিলি, আর তার যে গুরু, যে তাকে হাতে ধরে শিকার শিখালে, সে গেল ভেসে! কেন? না সে যে বাঙ্গালী। আজ বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে যদি হোল ওয়ার্ল্ডে এই কর্নস্পিরেসি না হত তো দেখতিস, পজিশন কাকে বলে তা তোদের ব্রজদা জগৎবাসীকে দেখিয়ে ছাড়ত। পজিশন পাচ্ছে না বলেই তো বাঙ্গালী আজ স্থায়ীভাবে অপজিশনে চলে যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, জিম করবেটকে পাকড়ালেন কি করে?

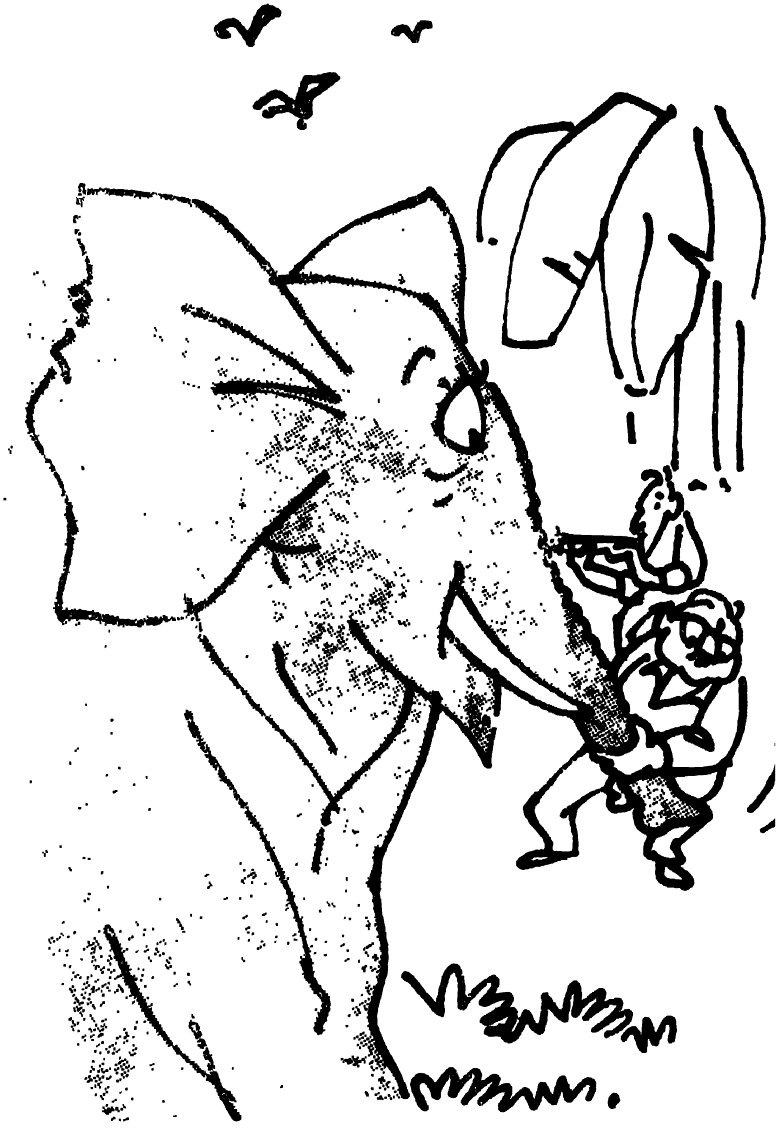
ব্রজদা আমার মুখের পানে অগ্নি দৃষ্টি হানলেন।

বললেন, সেটা করবেটকেই জিজ্ঞেস করো।

সুনীল বললে, তিনি তো গত হয়েছেন। তাঁকে এখন পাই কোথায়?

ব্রজদা বললেন, তবে কিছুকাল অপেক্ষা কর। এত অধৈর্যই বা হচ্ছ কেন? এটুকু জেনে রাখতে পার, যে-ছোকরা এয়ার গান ছাড়া কিছু চালাতে পারত না, তাকে আমি হাতে ধরে ·৩৪৫ বোরের ম্যাঞ্চেস্টার রিপিটার ছোঁড়া শিখিয়েছি।

সেবার জিমু বললে, ওস্তাদ, বাঘ মারা তো শেখালে, মারলামও অনেক, এখন ওতে অরুচি ধরে গেছে। এবারে হাতি মারার কৌশলটা শিখিয়ে দাও।



হাতির মুখটা ঘুরিয়ে দিলাম

হেসে বললাম, জিমু, এখনও তেমন বাঘের পাল্লায় পড়নি। মেরেছ তো পাহাড়ি বাঘ। পড়তে বাংলার বাঘের পাল্লায়, বুঝতে। একবার এক বাংলার বাঘকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার করে দেওয়া হয়েছিল, তার ঠ্যালায় অস্থির। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে বৃটিশরা বাঘেদের আর কখনও ভাইস চ্যান্সেলার হবার চান্স দিয়েছে বলে শুনিনি। তাই বলছি বাঘকে অত তুচ্ছ ভেব না। অবিশ্যি হাতি মারা শিখতে চাও শিখিয়ে দেব।

ক'দিন পরেই খবর পাওয়া গেল আসামের জঙ্গলে একটা বুনো হাতি খুব অত্যাচার শুরু করেছে। খেত খামার নষ্ট করে দিচ্ছে। বাড়িঘর তচনচ করছে। মানুষ মারছে। জিমিকে নিয়ে চললাম। ওকে বললাম, হাতি মারতে হয় এক গুলিতে। মিস্ করেছ কি গেছ। তোমাকে কিসমিস বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আর হাতির ভালনারেব্‌ল্ জায়গাটা আছে মাথায়। শুঁড়টা যেখানে শেষ হয়ে কপালটা শুরু হয়েছে, জাস্ট্ অন দ্যাট্ স্পট্। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, হাতি যেন কক্ষনো তোমার গায়ের গন্ধ টের না পায়। খুব সাবধান। বাতাসের বিপরীতে কক্ষনো থাকবে না। অর্ডারটা যেমন বলে দিচ্ছি তেমনি বজায় রেখে চলবে। আগে বাতাস, মধ্যিখানে হাতি, তারপর তুমি। আমি হাতির কপালে চট করে একটা মার্কা করে দেব আর তুমি ঠিক সেইখানে চাঁদমারি করবে।

দিন তিনেক হেঁটে মিকির পাহাড়ের এক জায়গায় গিয়ে বুঝলাম, এসে গেছি। কিন্তু বিপদ হল এই যে, হাওয়ার গতির মাথামুণ্ডু টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কখনও এদিক দিয়ে বইছে, একটু পরেই সেদিক দিয়ে। আচ্ছা ঝামেলা। বুদ্ধিটা উস্কে নেবার জন্য পকেট থেকে নস্যির কৌটা বের করে একটিপ নস্যি নিয়েছি কি, সামনের সবরি কলার ঝাড়ের আড়াল থেকে প্রচণ্ড শব্দে এক হ্যাঁচ্ছোঃ শোনা গেল। যেন বড় বড় গোটা চারেক হাউট্‌জার কামান একসঙ্গে কেউ দ্যাওড় করে দিলে। এক ফুৎকারে গোটা আষ্টেক কলার ঝাড় সবেগে উপড়ে গিয়ে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। আর অমনি দেখলুম, দুহাত দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূত সদৃশ বিরাট এক টাস্কার। চুপিসাড়ে কলাগাছ খেয়ে যাচ্ছিল। আমার এক্সট্রা র নস্যির কিছুটা হয়ত বাতাসে উড়ে ওর শুঁড়ের ফুটোয় ঢুকে গেছে। আর তাইতেই এই বিপর্যয়। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে সেই অপ্রস্তুত দাঁতালের শুঁড়টা বাঁ হাতে চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে মাথাটা নুইয়ে আনলাম, তারপর ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে লাল টুকটুকে একটা টিপ বের করে থুথু দিয়ে ঝটিতি তার কপালে সেঁটে দিলাম। বললাম, জিমু, ফায়ার। কিন্তু কোথায় জিমু? দেখলাম, বেচারা তখনও পজিশন নিতে পারেনি। ইতস্তত করছে। আমি তৎক্ষণাৎ শুঁড় ধরে টেনে হাতির মুখটা জিমুর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। সত্যি, ছোকরার টিপটা প্রশংসা করার মতই।

ঐ এক গুলিতেই মিকির পাহাড়ের সাক্ষাৎ শমনটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠল না।

ব্রজদা চুপ করে গেলেন।

আপনাকে কোন জানোয়ার কখনও বিপদে ফেলেনি ব্রজদা?

ফেলেনি আবার! ব্রজদা নড়েচড়ে বসলেন। একবার একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারই আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। এ তোদের ব্রজদার উপর দিয়ে যায়। ব্রজদারও ব্রজদা বলতে পারিস তাকে।

সুনীত সাহস করে বলে ফেলল, এ তো তাহলে জবর টাইগার।

ব্রজদা বললেন, হ্যাঁ, বড় অদ্ভুত বাঘ। শুধু ধোপানী ধরে খেত। তাও সবটুকু খেত না। শুধু হাত দুখানা খেয়ে ফেলত।

সে কী, কেন?

ব্রজদা বললেন, অম্বলের ব্যামো ছিল বোধ হয়। ধোপানীরা তো সোডা দিয়ে কাপড় কাচে। হাতে নিরন্তর সোডা বা ক্ষার লেগে থাকে। তাই খেয়ে হয়ত টেম্পরারি একটা রিলিফ পেত। ওরা অকারণে তো কারোর ক্ষতি করে না। ভাল ভাল শিকারীর বই পড়ে দেখিস, জানতে পারবি।

এই বাঘটা আমাকে খুব ধোঁকা দিয়েছে। খুব ভুগিয়েছে। ওটাকে মারবার জন্য আমি গোটা ইন্ডিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি। পায়ের দাগ ধরে ফলো করতে করতে বার্মা সিলোন পর্যন্তও চলে গেছি। ধোপাদের এমন একটা আড়ত ভারতে নেই, যেখানে আমি যাইনি। কিন্তু বৃথা। যেখানেই যাই সেইখানেই দেখি হাহাকার। শয়তানটা স্বাভাবিক বুদ্ধিবশে এটা বুঝেছিল, ধোপাদের চাইতে ধোপানীদের কাবু করা সহজ। জানিনে চণ্ডীদাস পড়েছিল কিনা। সাত বচ্ছরে সে দু হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্নটা ধোপানীকে ঘায়েল করেছিল।

ওর ধোপানী মারার রহস্যটা আমার কাছে যখন পরিষ্কার হয়ে গেল তখন আমি একদিন ঢাকুরের এক ডোবায় ধোপানীর ছদ্মবেশে কাপড় কাচতে শুরু করলাম। লোডেড্ রাইফেলটা বাঁ হাতের কাছে একটা কাপড়ের পুটুলির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। আমি জানি, বাঘ আজ এখানে আসবে। পায়ের তাজা ছাপ ডোবার পাড়ে দেখে বুঝলাম, রাত্তিরে এসে ও জায়গাটা সার্ভে করে গেছে।

ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাপড় কেচে চলেছি। কান দুটো খাড়া। দুপুর বেলা রোদ্দুর চড়চড় করছে। অনেকক্ষণ সেই পচা জলে দাঁড়িয়ে থাকায় পা চুলকুচ্ছে। সব সহ্য করছি। আজ এস্পার কি ওস্পার। হঠাৎ পিছনে জলে সামান্য একটা শব্দ হল। চট করে চেয়ে দেখলাম, কিছুই নেই। যেই আবার সামনে ফিরেছি, অমনি দেখি বাঘ। একেবারে আমার পাটের উপর থাবা গেড়ে বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। চট করে রাইফেলটার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু

কোথায় রাইফেল? ঠাহর করে চেয়ে দেখি বাঘ সেটাকে কোন ফাঁকে সরিয়ে নিয়েছিল, এখন সেটা ল্যাজে খেলাচ্ছে। কোন উপায় না দেখে উটপাখীর মত আমিও তৎক্ষণাৎ চোখ বুজে ফেললাম।

ব্রজদা গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম, তারপর?

ব্রজদা ম্লান হেসে বললেন, এর পরেও কি আর তারপর থাকে রে বোকা? তারপর বাঘটা আমাকে খেয়ে ফেলল।

যাঃ! সুনীত প্রতিবাদ করল। কি যে বলেন? এই তো দিব্যি বেঁচে রয়েছেন।

লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রজদা ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, দ্যাখ, তোদের ব্রজদা যে-চোখে একদিন বাঙ্গালীর ছেলে বিজয় সিংহকে লঙ্কা জয় করতে দেখেছে, আজ সেই চোখেই তাকে দেখতে হচ্ছে, বাঙ্গালীর ছেলে চারদিক থেকে মার খেয়ে পালিয়ে বাড়ির দরজায় এসে নেড়িকুত্তার মত কেঁউ কেঁউ করছে। একে কি তোরা বাঁচা বলিস?
